শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য

কলিযুগের যুগ ধর্ম হচ্ছে কীর্তন করে প্রেম লাভ করার সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা হচ্ছে ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করা। সকলেই অনায়াসে ভগবানের দিব্য নাম সমন্বিত 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তন করতে পারেন ঃ

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

আজ থেকে পাঁচশ' বছর আগে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অত্যন্ত দুর্লভ এই কলিযুগের মানুষদের উদ্ধার করার জন্য এই নাম সংকীর্তন প্রবর্তন করে গেছেন।

ইস্কন বুক ট্রাস্ট প্রকাশিত

পঞ্চতত্ত্বরূপে

ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি জগদ্গুরু
শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ
আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

পঞ্চতত্ত্বরূপে

ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী
কর্তৃক বিরচিত শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের সপ্তম পরিচ্ছেদ

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য
কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ
কৃত Lord Chaitanya in five features গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ।
অনুবাদক : শ্রীমদ্ ভক্তিচারু স্বামী

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট
শ্রীমায়াপুর, কলকাতা, বোম্বাই, নিউ ইয়র্ক, লস্ এঞ্জেলেস, লন্ডন, সিডনি, প্যারিস, রোম, হংকং

প্রকাশক :
ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্টের পক্ষে
শ্রীশ্যামরূপ দাস ব্রহ্মচারী

প্রথম সংস্করণ : ৩০০০ কপি, ১৯৮৬
দ্বিতীয় সংস্করণ : ৩০০০ কপি, ১৯৮৯
তৃতীয় সংস্করণ : ৫০০০ কপি, ১৯৯৮

গ্রন্থ-স্বত্ব :
১৯৯৮ ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট
কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

মুদ্রণ :
ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট প্রেস
শ্রীমায়াপুর চন্দ্রোদয় মন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা : নদীয়া
পশ্চিমবঙ্গ

ভূমিকা

প্রায় পাঁচশ' বছর পূর্বে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, সেই ভবিষ্যদ্বাণীকে সার্থক করে আজ পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি শহরে, নগরে, গ্রামে-গঞ্জে 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তিত হচ্ছে। লস্ এঞ্জেলেস্ থেকে লন্ডন, বোম্বাই থেকে বুয়েনস্ এয়ারস্, পিট্স্ বার্গ এবং মেল্বোর্ণ থেকে প্যারিস এবং এমনকি মস্কো পর্যন্ত সর্বত্রই আজ সকল বয়সের, সকল বর্ণের, সকল জাতির এবং সকল ধর্ম-বিশ্বাসের মানুষেরা 'কৃষ্ণভাবনামৃত' নামক অভূতপূর্ব এই যোগ-পদ্ধতির আনন্দময় স্বাদ আস্বাদন করছেন।

এই 'কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন' শুরু হয়েছিল আজ থেকে প্রায় পাঁচশ' বছর পূর্বে, যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে আবির্ভূত হয়ে ভারত উপমহাদেশকে 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র'—*হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥* —কীর্তনের দ্বারা প্লাবিত করেছিলেন। প্রকৃত ভগবৎ-প্রেম যে কি, সেই গূঢ় তত্ত্ব উন্মোচিত করার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আজ থেকে প্রায় পাঁচশ' বছর আগে তাঁর পরম ভক্তের ভাব অবলম্বন করে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুরূপে এই ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাঁর মুখ্য পার্ষদবৃন্দ—শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীগদাধর এবং শ্রীবাস—এঁদের মাধ্যমে তিনি শিক্ষা দিয়েছিলেন যে, কিভাবে কেবলমাত্র 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তন করার মাধ্যমে এবং ভাবাবেশে তন্ময় হয়ে নৃত্য করার মাধ্যমে, ভগবৎ-প্রেম লাভ করা যায়।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মহান পার্ষদ এবং পরম বৈষ্ণব প্রবর শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীকৃত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পূত লীলাচরিত-গ্রন্থ *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত* রচিত হয়েছিল শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটের অব্যবহিত পরেই। এই গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরম রসময় লীলাবিলাসের কাহিনী বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং তাঁর নিগূঢ় পারমার্থিক তত্ত্ব-দর্শনের গভীরে প্রবেশ করে এক গবেষণামূলক অনুসন্ধানের প্রয়াস করা হয়েছে।

পাশ্চাত্য দেশসমূহে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণীর প্রসারকল্পে 'আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ-ভাবনামৃত সংঘের' প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ

ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ *ভগবদ্গীতা যথাযথ*, *শ্রীমদ্ভাগবত*, *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* এবং অন্যান্য বহু ভক্তিতত্ত্বপূর্ণ গ্রন্থাবলীর মতো এই মহান গ্রন্থটিও ইংরাজীতে অনুবাদ করেছিলেন এবং প্রতিটি শ্লোকের বিস্তৃত ব্যাখ্যাসহ ভাষ্য প্রদান করেছিলেন। এখন, তাঁর অবশ্যন শিষ্যরূপে আমরা বাংলার পাঠক-পাঠিকাদের জন্য তাঁর ভাষ্যসহ এই মহাকাব্যের বাংলা অনুবাদের কাজে প্রবৃত্ত হয়েছি। যদি আমরা এই গ্রন্থটি বাংলার প্রতিটি ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে পারি এবং সেটি পাঠ করে যদি প্রতিটি পাঠক-পাঠিকার হৃদয়ে অপ্রাকৃত ভাবের সঞ্চার হয় ও তার ফলে যদি তাঁরা ভগবৎ-প্রেম লাভে সমর্থ হন, তাহলে আমরা আমাদের এই গ্রন্থ অনুবাদ, সম্পাদনা ও প্রকাশনার প্রয়াসকে সার্থক বলে মনে করব।

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

শ্রীল প্রভুপাদের সংক্ষিপ্ত জীবনী

শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ ১৮৯৬ সালে কলিকাতায় আবির্ভূত হয়েছিলেন। ১৯২২ সালে কলিকাতায় তিনি তাঁর গুরুদেব শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সাক্ষাৎ লাভ করেন। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ছিলেন ভক্তিমার্গের বিদগ্ধ পণ্ডিত এবং ৬৪টি গৌড়ীয় মঠের (বৈদিক সংঘের) প্রতিষ্ঠাতা। তিনি এই বুদ্ধিদীপ্ত, তেজস্বী ও শিক্ষিত যুবকটিকে বৈদিক জ্ঞান প্রচারের কাজে জীবন উৎসর্গ করতে উদ্বুদ্ধ করেন। শ্রীল প্রভুপাদ এগার বছর ধরে তাঁর আনুগত্যে বৈদিক শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং পরে ১৯৩৩ সালে এলাহাবাদে তাঁর কাছে দীক্ষাপ্রাপ্ত হন।

১৯২২ সালে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর শ্রীল প্রভুপাদকে ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে বৈদিক জ্ঞান প্রচার করতে নির্দেশ দেন। পরবর্তীকালে শ্রীল প্রভুপাদ ভগবদ্গীতার ভাষ্য লিখে গৌড়ীয় মঠের প্রচারের কাজে সহায়তা করেছিলেন। ১৯৪৪ সালে তিনি এককভাবে একটি ইংরাজী পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করতে শুরু করেন। এমন কি তিনি নিজ হাতে পত্রিকাটি বিতরণও করতেন। পত্রিকাটি এখনও সারা পৃথিবীতে তাঁর শিষ্যবৃন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হচ্ছে।

১৯৪৭ সালে শ্রীল প্রভুপাদের দার্শনিক জ্ঞান ও ভক্তির উৎকর্ষতার স্বীকৃতিরূপে 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ' তাঁকে "ভক্তিবেদান্ত" উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯৫০ সালে তাঁর ৫৪ বছর বয়সে শ্রীল প্রভুপাদ সংসার জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করে চার বছর পর বানপ্রস্থ আশ্রম গ্রহণ করেন এবং শাস্ত্র অধ্যয়ন, প্রচার ও গ্রন্থ রচনার কাজে মনোনিবেশ করেন। তিনি বৃন্দাবনে শ্রীশ্রীরাধা-দামোদর মন্দিরে বসবাস করতে থাকেন এবং অতি সাধারণভাবে জীবনযাপন করতে শুরু করেন। ১৯৫৯ সালে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। শ্রীশ্রীরাধা-দামোদর মন্দিরেই শ্রীল প্রভুপাদের শ্রেষ্ঠ অবদানের সূত্রপাত হয়। এখানে বসেই তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের ভাষ্য ও তাৎপর্যসহ আঠার হাজার শ্লোকের অনুবাদ করেন এবং 'অন্য লোকে সুগম যাত্রা' নামক গ্রন্থটি রচনা করেন।

১৯৬৫ সালে ৭০ বছর বয়সে তিনি সম্পূর্ণ কপর্দকহীন অবস্থায় আমেরিকার নিউ ইয়র্ক শহরে পৌঁছান। প্রায় এক বছর ধরে কঠোর পরিশ্রম করার পর তিনি

১৯[illegible] সালের [illegible] প্রতিষ্ঠা করেন [illegible] কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ বা ইস্কন। [illegible] এক দশকের মধ্যে গড়ে ওঠে বিশ্বব্যাপী [illegible] শাখা, [illegible] মন্দির ও পল্লী-আশ্রম।

১৯৭৪ সালে তাঁর প্রভুপাদ পশ্চিম আফ্রিকায় পূর্বতা ভূমিতে গড়ে তোলেন [illegible] কৃষ্ণকলা যা হল বৈদিক সমাজের প্রতীক। এই সফলতার স্বীকৃতি হয়ে তাঁর নিবাসকে পরবর্তীকালে ইংলণ্ড ও আমেরিকায় আরও অনেক পল্লী-আশ্রম গড়ে তোলেন।

শ্রীল প্রভুপাদের অবদান, অবদান হল তাঁর গ্রন্থাবলী। তাঁর [illegible] মাধুর্যপূর্ণ ও প্রাঞ্জল এবং [illegible] সেই কারণে বিদগ্ধ সমাজে তাঁর রচনাবলী অতীব সমাদৃত এবং [illegible] শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে আজ সেগুলি পাঠ্যরূপে ব্যবহৃত হচ্ছে। বৈদিক [illegible] এই গ্রন্থাবলী প্রকাশ করছে। তাঁরই প্রতিষ্ঠিত বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ গ্রন্থ-প্রকাশনী সংস্থা 'ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট'। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সপ্তদশ খণ্ডের তাৎপর্যসহ ইংরাজী অনুবাদ আঠার মাসে সম্পূর্ণ করেছিলেন।

১৯৭৪ সালে আমেরিকার ডালাসে গুরুকুল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শ্রীল প্রভুপাদ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে বৈদিক শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রচলন করেন। ১৯৭২ সালে মাত্র দুজন ছাত্র নিয়ে এই গুরুকুলের সূত্রপাত হয় এবং আজ সারা পৃথিবীর ১৫টি গুরুকুল বিদ্যালয়ে ছাত্রের সংখ্যা প্রায় পনের শত।

পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীল প্রভুপাদ সঙ্ঘের মূল কেন্দ্রটি স্থাপন করেন ১৯৭২ সালে। এখানে বৈদিক শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চার জন্য একটি বর্ণাশ্রম মহাবিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনাও তিনি দিয়ে গেছেন। শ্রীল প্রভুপাদের নির্দেশ বৈদিক ভাবধারার উপর প্রতিষ্ঠিত এই রকম আর একটি আশ্রম গড়ে উঠেছে বৃন্দাবনে শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-বলরাম মন্দিরে, যেখানে আজ দেশ দেশান্তর থেকে আসছে বহু দর্শনার্থী বৈদিক সংস্কৃতির অনুশীলন করতে।

১৯৭৭ সালে এই ধরাধাম থেকে অপ্রকট হওয়ার পূর্বে শ্রীল প্রভুপাদ সমগ্র জগতের প্রাণে আনন্দের বাণী পৌঁছে দেবার জন্য তাঁর বৃন্দাবনস্থানেও সমগ্র পৃথিবী প্রদক্ষিণ পরিক্রমা করেন। মানুষের মঙ্গলার্থে এই প্রচার মূর্তির পূর্ণতা সাধন করেও তিনি বৈদিক দর্শন, সাহিত্য, ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধিত বহু গ্রন্থাবলী রচনা করে গেছেন যার মাধ্যমে এই জগতের মানুষ পূর্ণ আনন্দময় এক নিত্য জগতের সন্ধান লাভ করবে।

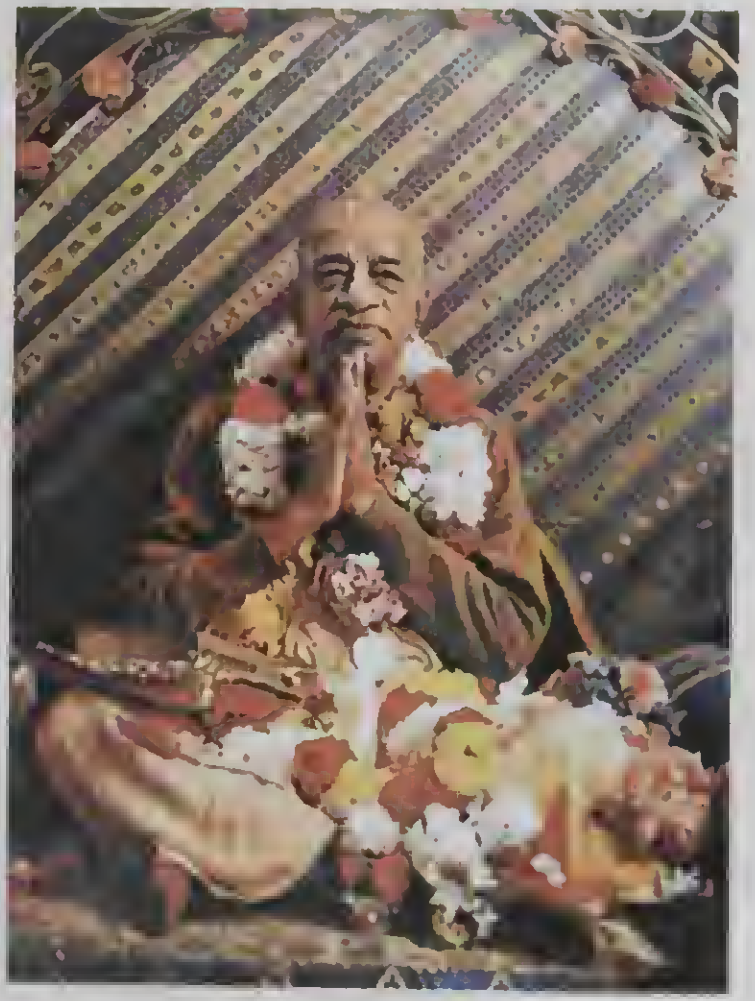

[illegible] শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রভুপাদের পরমপ্রিয় শিষ্যরূপে।

শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভুরূপে এবং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুরূপে শ্রীধাম মায়াপুরে অবতীর্ণ হয়েছিলেন কলিযুগের যুগধর্ম—নাম-সংকীর্তন প্রবর্তন করে পতিত জীবকে উদ্ধার করার জন্য

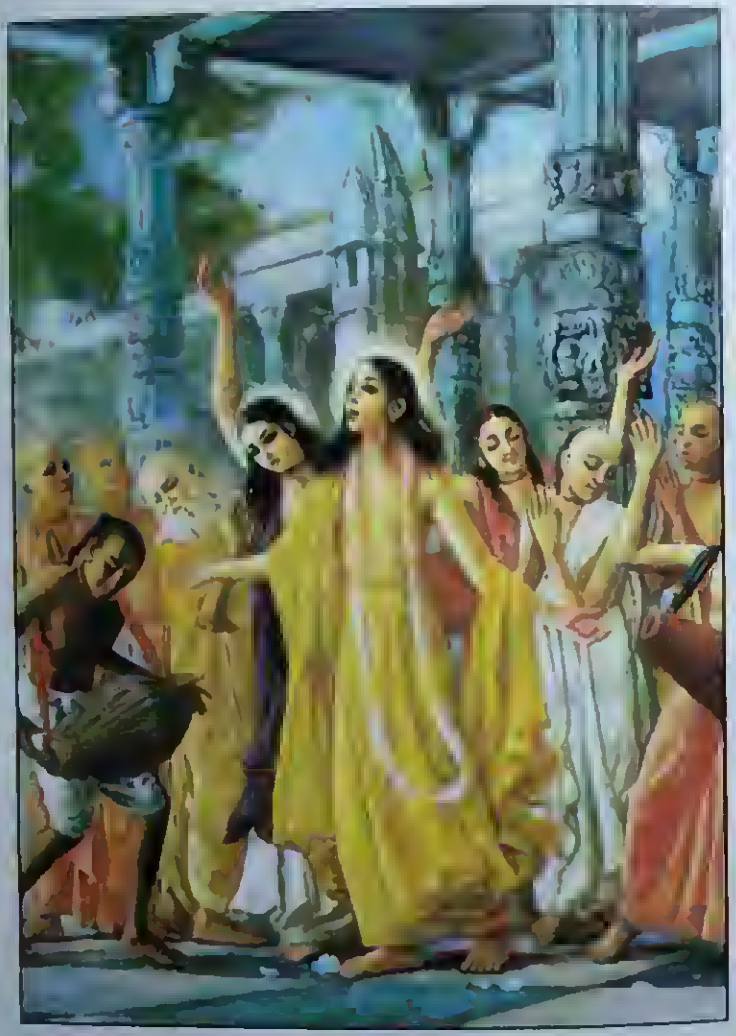

পঞ্চতত্ত্ব অবতীর্ণ চৈতন্যের সঙ্গে।
পঞ্চতত্ত্ব লঞা করেন সংকীর্তন রঙ্গে ॥

(পৃষ্ঠা-৩)

মাটিতে বসে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কোটি সূর্যের মতো উজ্জ্বল জ্যোতি প্রকাশ করে যখন নিত্য ঐশ্বর্য প্রকাশ করছিলেন, তখন মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের প্রধান প্রকাশানন্দ

বাহু তুলি' প্রভু বলে,—বল হরি হরি।
হরিধ্বনি করে লোক স্বর্গমর্ত্য ভরি' ॥

(পৃষ্ঠা-২৫৬)

প্রেমময় মূর্তি তুমি,—সাক্ষাৎ নারায়ণ।
ক্ষম অপরাধ,—পূর্বে যে কৈলু নিন্দন ॥

(পৃষ্ঠা-২৫৬)

লীলা পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর হ্লাদিনী-শক্তি শ্রীমতী রাধারাণী উভয়ে অভিন্ন তত্ত্ব। কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে ব্রজভূমি বৃন্দাবনে নিত্য লীলাবিলাসে নিমগ্ন থাকেন।

পঞ্চতত্ত্বের মাহাত্ম্য

শ্লোক ১

অগত্যৈকগতিং নত্বা হীনার্থাধিকসাধকম্ ।
শ্রীচৈতন্যং লিখ্যতেঽস্য প্রেমভক্তিবদান্যতা ॥ ১ ॥

শব্দার্থ

অগতি—সব চাইতে পতিতের; এক—কেবল এক; গতিম্—গতি; নত্বা—প্রণতি নিবেদন করে; হীন—হীন; অর্থ—পরমার্থ; অধিক—তার থেকে বেশি; সাধকম্—প্রদাতা; শ্রীচৈতন্যম্—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে; লিখ্যতে—লিখতে হচ্ছে; অস্য—ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর; প্রেম—প্রেম; ভক্তি—ভক্তি; বদান্যতা—বদান্যতা।

অনুবাদ

অগতি বা অকিঞ্চনের গতি, পরমার্থহীন ব্যক্তির মহদর্থ সাধক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে প্রণতি নিবেদন করে, তাঁর প্রেমভক্তির বদান্যতা বর্ণনা করছি।

তাৎপর্য

জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ জীব অত্যন্ত অসহায়, কিন্তু মায়ার প্রভাবে বদ্ধ জীব মনে করে, সে তার দেশ, সমাজ, বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয় স্বজনের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ। সে জানে না যে, মৃত্যুর সময় কেউই তাকে রক্ষা করতে পারবে না। জড়া প্রকৃতির নিয়ম এতই কঠোর যে, মৃত্যুর করাল হস্ত থেকে জড় জগতের কোন নিরাপত্তাই আমাদের রক্ষা করতে পারে না। *ভগবদ্গীতায়* (১৩/৯) বলা হয়েছে, *জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্*—পারমার্থিক পথে কেউ যদি উন্নতি সাধন করতে চান, তা হলে তাঁকে জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধি, প্রকৃতির এই চারটি নিয়মের কথা সর্বদাই স্মরণ রাখতে হবে। ভগবানের চরণাশ্রয় না করলে কেউই এই সমস্ত দুঃখ-দুর্দশা থেকে রক্ষা পেতে পারে না। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুই হচ্ছেন সমস্ত বদ্ধ জীবের একমাত্র আশ্রয়। এই কারণেই, বুদ্ধিমান মানুষেরা কোন জড় আশ্রয় অবলম্বন করেন না। পক্ষান্তরে তাঁরা সর্বতোভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর

শ্রীপদপদ্মের শরণাগত হন। এই ধরনের মানুষকে বলা হয় 'অকিঞ্চন' অর্থাৎ এই জড় জগতে যার কিছু নেই। পরমেশ্বর ভগবানের আর এক নাম 'অকিঞ্চন-গোচর' কারণ এই জড় জগতের কোন কিছুর প্রতি যাঁর আসক্তি নেই তিনিই কেবল তাঁকে উপলব্ধি করতে পারেন। তাই যে সমস্ত মানুষ সর্বতোভাবে ভগবানের শরণাগত হয়েছেন এবং এই জড় জগতের কোন কিছুর প্রতিই যাঁদের আসক্তি নেই তাঁদের একমাত্র আশ্রয় হচ্ছেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। সকলেই ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের প্রত্যাশী, কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর অপার করুণার প্রভাবে মোক্ষের থেকেও বড় বস্তু দান করতে পারেন। তাই এই শ্লোকে *'ইত্যর্থাদিকসাধকম্'* বলতে বোঝান হয়েছে যে, জাগতিক বিচারে মুক্তি হচ্ছে ধর্ম, যা অর্থনৈতিক উন্নতি এবং ইন্দ্রিয় তৃপ্তি সাধনের থেকে শ্রেয়, কিন্তু মুক্তির থেকে শ্রেয় হচ্ছে ভগবৎ প্রেম। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুই হচ্ছেন সেই প্রেমভক্তির প্রদাতা। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, *প্রেম পুমর্থো মহান*—"ভগবৎ প্রেম হচ্ছে জীবের পরম পুরুষার্থ।" *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের* গ্রন্থকার শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেমভক্তি প্রদানকারী মহাবদান্যতা বর্ণনা করার পূর্বে তাঁর উদ্দেশ্যে তাঁর সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেছেন।

শ্লোক ২

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ।
তাঁহার চরণাশ্রিত, সেই বড় ধন্য ॥ ২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর জয় হোক! যিনি তাঁর চরণাশ্রয় করেছেন, তিনি সব চাইতে ধন্য।

তাৎপর্য

প্রভু মানে হচ্ছে ঈশ্বর। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন সকল প্রভুদের প্রভু। কেউ যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর চরণাশ্রয় করেন, তখন তিনি সব চাইতে ধন্য হন কারণ তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপার প্রভাবে ভগবানের প্রেমময় সেবার স্তরে উন্নীত হন যে স্তর মুক্তিরও অতীত।

শ্লোক ৩

পূর্বে গুর্বাদি ছয় তত্ত্বে কৈল নমস্কার ।
গুরুতত্ত্ব কহিয়াছি, এবে পাঁচের বিচার ॥ ৩ ॥

শ্লোকার্থ

পূর্বে আমি গুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। এখন আমি পঞ্চতত্ত্বের বিচার-বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করব।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের আদিলীলার প্রথম পরিচ্ছেদে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন *গুরূনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্*, এই শ্লোকে দীক্ষাগুরু এবং শিক্ষাগুরুর তত্ত্ব বিশ্লেষণ করেছেন। সেই শ্লোকে ছয়টি তত্ত্ব রয়েছে, যার মধ্যে গুরুতত্ত্ব ইতিমধ্যেই বর্ণিত হয়েছে। এখন গ্রন্থকার অন্য পাঁচটি তত্ত্ব যথা—ঈশতত্ত্ব (ভগবান), প্রকাশতত্ত্ব, অবতার তত্ত্ব, শক্তিতত্ত্ব, এবং ভক্ততত্ত্ব সম্বন্ধে বর্ণনা করবেন।

শ্লোক ৪

পঞ্চতত্ত্ব অবতীর্ণ চৈতন্যের সঙ্গে ।
পঞ্চতত্ত্ব লঞা করেন সংকীর্তন রঙ্গে ॥ ৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে পঞ্চতত্ত্ব অবতীর্ণ হয়েছেন, এবং এই পঞ্চতত্ত্ব নিয়েই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মহানন্দে সংকীর্তন করেন।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করে বলা হয়েছে—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্ ।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥

"যাঁর মুখে সর্বদা কৃষ্ণ নাম, যাঁর অঙ্গকান্তি অকৃষ্ণ অর্থাৎ গৌর, তিনি অঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র ও পার্ষদ পরিবেষ্টিত। সেই মহাপুরুষকে কলিযুগের সুবুদ্ধিমান মানুষেরা সংকীর্তন যজ্ঞের দ্বারা আরাধনা করবেন" (শ্রীমদ্ভাগবত ১১/৫/৩২)। শ্রীচৈতন্য

মহাপ্রভু সর্বদাই তাঁর স্বরূপ-প্রকাশ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, তাঁর অবতার অদ্বৈত প্রভু, তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তি শ্রীগদাধর প্রভু এবং তাঁর তটস্থা শক্তি শ্রীবাস প্রভুর দ্বারা পরিবেষ্টিত। পরমেশ্বর ভগবানরূপে তিনি তাঁদের মধ্যে বিরাজমান। সকলেরই জানা উচিত যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সর্বদাই এই সমস্ত তত্ত্বের সঙ্গে বিরাজ করেন। তাই যখন আমরা *শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ। শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ ॥* এই পঞ্চতত্ত্ব মহামন্ত্র উচ্চারণপূর্বক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে প্রণতি নিবেদন করি, তখন সেই প্রণতি পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। কৃষ্ণভাবনার অমৃতের প্রচারকরূপে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে আমরা এই পঞ্চতত্ত্ব মহামন্ত্রের দ্বারা প্রথমে প্রণতি নিবেদন করি। তারপর আমরা কীর্তন করি—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তনে দশটি নাম-অপরাধ রয়েছে, কিন্তু *শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ। শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ ॥* এই পঞ্চতত্ত্ব মহামন্ত্র কীর্তনে কোন অপরাধের বালাই নেই। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে বলা হয় 'মহাবদান্য অবতার', অর্থাৎ তিনি হচ্ছেন সব চাইতে উদার অবতার, কারণ তিনি বদ্ধ জীবের অপরাধ গ্রহণ করেন না। তাই 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' উচ্চারণের পূর্ণ প্রভাব লাভ করতে হলে, আমাদের প্রথমে অবশ্যই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে, এবং 'পঞ্চতত্ত্ব মহামন্ত্র' উচ্চারণ করার পর 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তন করতে হবে। তা হলে তা অত্যন্ত কার্যকরী হবে।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নাম করে অনেক ভক্তবেশী প্রবঞ্চক তাদের নিজেদের মনগড়া মহামন্ত্র তৈরি করে। তাদের কেউ গায়, ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম হরে কৃষ্ণ হরে রাম। অথবা, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রীরাধাগোবিন্দ। প্রকৃতপক্ষে পূর্ণ পঞ্চতত্ত্ব মহামন্ত্র (*শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ। শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ ॥*) উচ্চারণ করা উচিত, এবং ষোল নাম সমন্বিত হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র (*হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥*) কীর্তন করা উচিত। কিন্তু এই সমস্ত নীতিজ্ঞানশূন্য, অবিবেচক লোকেরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রদত্ত পন্থাকে বিকৃত করে। যেহেতু তারাও ভক্ত, তাই তারা তাদের অনুভূতি এইভাবে ব্যক্ত করতে পারে, কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শুদ্ধ ভক্তদের দ্বারা প্রদর্শিত পন্থা হচ্ছে প্রথমে 'শ্রীপঞ্চতত্ত্ব মহামন্ত্র' উচ্চারণ করা এবং তারপর 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' (*হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে । হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥*) কীর্তন করা।

শ্লোক ৫

পঞ্চতত্ত্ব—একবস্তু, নাহি কিছু ভেদ।
রস আস্বাদিতে তবু বিবিধ বিভেদ ॥ ৫ ॥

শ্লোকার্থ

পঞ্চতত্ত্ব এক বস্তু, কারণ চিন্ময় স্তরে সব কিছুই পরম। কিন্তু তা হলেও চিন্ময় স্তরে বৈচিত্র্য রয়েছে, এবং এই চিৎ-বৈচিত্র্য আস্বাদন করার জন্য তার বৈশিষ্ট্য বা পার্থক্য নিরূপণ করতে হয়।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাঁর *অনুভাষ্যে* পঞ্চতত্ত্ব বর্ণনা করে বলেছেন, "পরম শক্তিমান পরমেশ্বর ভগবান পাঁচটি বিভিন্ন প্রকার লীলা প্রকাশের জন্য পঞ্চতত্ত্বরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কারণ তাঁরা হচ্ছেন অদ্বয়তত্ত্ব, কিন্তু নীরস ভাবের ব্যতিক্রমে বিভিন্ন প্রকার অপ্রাকৃত রস আস্বাদন জন্য তাঁরা বিবিধ চিৎ-বৈচিত্র্য প্রকাশ করেন।" বেদে বলা হয়েছে, *পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে*—"পরমেশ্বর ভগবানের পরা শক্তি বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হয়।" বেদের এই উক্তি থেকে বোঝা যায় যে, চিৎ-জগতে অন্তহীন রস বা বৈচিত্র্য রয়েছে। শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীগদাধর ও শ্রীবাসাদি পঞ্চতত্ত্বে বস্তুত কোন ভেদ নেই। কিন্তু রস আস্বাদনের উদ্দেশ্যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু 'ভক্তরূপে', শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু 'ভক্তস্বরূপে', শ্রীঅদ্বৈত প্রভু 'ভক্ত-অবতার রূপে' গদাধর প্রভু 'ভক্তশক্তি রূপে', এবং শ্রীবাস প্রভু 'শুদ্ধ ভক্তরূপে'—এই পঞ্চ প্রকারে বিবিধ বৈশিষ্ট্যযুক্ত। এই পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে 'ভক্তরূপ', 'ভক্তস্বরূপ' এবং 'ভক্ত-অবতার'-ই 'স্বয়ং', 'প্রকাশ' ও 'অংশ' রূপে প্রভু-বিষ্ণুতত্ত্ব। 'ভক্তশক্তি' ও 'শুদ্ধভক্ত'—বিষ্ণুতত্ত্বের অন্তর্গত তদাশ্রিত অভিন্ন শক্তিতত্ত্ব। যদিও ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি এবং তটস্থা শক্তি পরমেশ্বর ভগবান বিষ্ণু থেকে অভিন্ন কিন্তু তা হচ্ছে আশ্রিত তত্ত্ব, এবং শ্রীবিষ্ণু হচ্ছেন আশ্রয়তত্ত্ব। তাঁরা অপ্রাকৃত রস আস্বাদনের জন্য বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁদের বৈষম্য কখনই সম্ভব নয়, কারণ উপাস্য এবং উপাসককে কোন অবস্থাতেই বিচ্ছিন্ন করা যায় না। চিন্ময় স্তরে একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটিকে জানা যায় না।

শ্লোক ৬

পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপ-স্বরূপকম্ ।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্ ॥ ৬ ॥

শব্দার্থ

পঞ্চ-তত্ত্ব-আত্মকম্—পঞ্চতত্ত্বের আত্মাস্বরূপ যিনি তাঁকে; **কৃষ্ণম্**—শ্রীকৃষ্ণকে; **ভক্ত-রূপ**—ভক্তরূপ; **স্বরূপকম্**—ভক্তস্বরূপ; **ভক্ত-অবতারম্**—ভক্ত-অবতার; **ভক্ত-আখ্যম্**—ভক্তরূপে পরিচিত; **নমামি**—আমি প্রণতি নিবেদন করি; **ভক্ত-শক্তিকম্**—ভগবানের শক্তি।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণের ভক্তরূপ, ভক্তস্বরূপ, ভক্ত-অবতার, ভক্ত, ভক্তশক্তি—এই পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীকৃষ্ণকে আমি দণ্ডবৎ প্রণাম করি।

তাৎপর্য

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু হচ্ছেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভ্রাতারূপে তাঁর স্বরূপ। তিনি হচ্ছেন সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। তাঁর দেহ অপ্রাকৃত এবং ভগবদ্ভক্তিতে আনন্দময়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে তাই বলা হয় ভক্তরূপ, এবং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে বলা হয় ভক্তস্বরূপ। শ্রীঅদ্বৈত প্রভু হচ্ছেন ভক্ত-অবতারে বিষ্ণুতত্ত্ব। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর রসের বিভিন্ন ধরনের ভক্ত রয়েছেন। শ্রীস্বরূপ দামোদর, শ্রীগদাধর এবং শ্রীরামানন্দ প্রমুখ ভক্তরা বিভিন্ন শক্তি। এর দ্বারা *বেদান্ত-সূত্রের* বাক্য *পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে*—এই তত্ত্ব প্রতিপন্ন হয়। এই সমস্ত ভক্তদের নিয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, যিনি হচ্ছেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ।

শ্লোক ৭

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ একলে ঈশ্বর ।
অদ্বিতীয়, নন্দাত্মজ, রসিক-শেখর ॥ ৭ ॥

শ্লোকার্থ

সমস্ত রসের উৎস শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান। তিনি অদ্বিতীয়, অর্থাৎ কেউই তাঁর থেকে মহৎ নয় অথবা সমকক্ষও নয়, কিন্তু তবুও তিনি নন্দ মহারাজের পুত্ররূপে আবির্ভূত হন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যথার্থ স্বরূপ বর্ণনা করে বলেছেন যে, যদিও তিনি হচ্ছেন অদ্বিতীয় এবং সমস্ত চিন্ময় রসের উৎস, তবুও তিনি নন্দ মহারাজ এবং যশোদা মায়ের পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছেন।

শ্লোক ৮

রাসাদি-বিলাসী, ব্রজললনা-নাগর ।
আর যত সব দেখ,—তাঁর পরিকর ॥ ৮ ॥

শ্লোকার্থ

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন রাসনৃত্যের পরম ভোক্তা। তিনি হচ্ছেন ব্রজললনাদের নাগর, এবং আর সকলেই হচ্ছেন তাঁর পরিকর।

তাৎপর্য

'রাসাদি-বিলাসী' শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। রাসনৃত্য কেবল শ্রীকৃষ্ণই উপভোগ করতে পারেন, কারণ তিনি হচ্ছেন বৃন্দাবনের সমস্ত ললনাদের পরম নায়ক। অন্য সমস্ত ভক্তরা হচ্ছেন তাঁর পার্ষদ। যদিও কেউই পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের সমকক্ষ হতে পারে না, তবুও বহু প্রতারক পাষণ্ড রয়েছে, যারা শ্রীকৃষ্ণের রাসনৃত্যের অনুকরণ করে। তারা মায়াবাদী, এবং সকলেরই উচিত তাদের থেকে সাবধান থাকা। রাসনৃত্য কেবল শ্রীকৃষ্ণই বিলাস করতে পারেন, অন্য কেউ তা পারে না।

শ্লোক ৯

সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ।
সেই পরিকরগণ সঙ্গে সব ধন্য ॥ ৯ ॥

শ্লোকার্থ

সেই শ্রীকৃষ্ণই তাঁর নিত্য পার্ষদদের সঙ্গে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। তাঁর পার্ষদগণও তাঁরই মতো মহিমান্বিত।

শ্লোক ১০

একলে ঈশ্বর-তত্ত্ব চৈতন্য-ঈশ্বর ।
ভক্তভাবময় তাঁর শুদ্ধ কলেবর ॥ ১০ ॥

শ্লোকার্থ

ঈশ্বরতত্ত্ব এক ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভক্তভাব অবলম্বন করেছেন, কিন্তু তবুও তাঁর দেহ সব রকম জড় কলুষ থেকে মুক্ত, বিশুদ্ধ এবং চিন্ময়।

তাৎপর্য

ঈশতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব এবং শক্তিতত্ত্ব আদি বিভিন্ন তত্ত্ব রয়েছে। ঈশতত্ত্ব বলতে পরম চেতন সত্তা ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে বোঝায়। *কঠোপনিষদে* বলা হয়েছে, *নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্*—"পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সমস্ত নিত্য বস্তুর মধ্যে পরম নিত্য এবং সমস্ত চেতন বস্তুর মধ্যে পরম চেতন।" জীবও নিত্য এবং চেতন শক্তি, কিন্তু আয়তনগতভাবে তারা অত্যন্ত ক্ষুদ্র, আর পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন পরম চেতন এবং পরম নিত্য। পরম নিত্য পরমেশ্বর ভগবান কখনই জড়া প্রকৃতিজাত অনিত্য দেহ ধারণ করেন না, কিন্তু সেই পরম চেতনের অংশ জীবের সেই প্রবণতা রয়েছে। বৈদিক মন্ত্র অনুসারে পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন অসংখ্য জীবের একমাত্র প্রভু। মায়াবাদীরা অণুচৈতন্য জীবকে বিভুচৈতন্য পরমেশ্বরের সমপর্যায়ভুক্ত করার চেষ্টা করে। যেহেতু তারা তাদের মধ্যে পার্থক্য স্বীকার করে না, তাই তাদের দর্শনকে বলা হয় 'অদ্বৈতবাদ'। এই শ্লোকটিতে মায়াবাদীদের বিশেষভাবে বোঝান হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন পরম নিয়ন্তা। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন হয়েও তাঁকে (শ্রীকৃষ্ণকে) ভজনীয় বস্তু বিচারে তাঁরই সেবাভাবময় বিগ্রহ ধারণ করেন।

ভগবদ্গীতায় বর্ণনা করা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন মনুষ্যরূপ ধারণ করে এই জগতে অবতীর্ণ হন, তখন মূর্খ লোকেরা তাঁকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে। যারা এই রকম ভ্রান্ত বিচার করে, তাদের বলা হয় মূঢ়। তাই মূর্খের মতো শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করা উচিত নয়। তিনি ভক্তভাব অবলম্বন করেছেন, কিন্তু তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পর, বহু নকল অবতার বেরিয়েছে, যারা বুঝতে পারে না যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এবং তিনি কোন সাধারণ মনুষ্য নন। অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা কোন সাধারণ মানুষকে ভগবান বলে

প্রচার করে তাদের নিজেদের ভগবান তৈরি করে। সেটা মস্ত বড় ভুল। তাই এখানে সাবধান করে দিয়ে বলা হয়েছে, 'তাঁর শুদ্ধ কলেবর',—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দেহ জড় নয়, তা বিশুদ্ধ চিন্ময়। তাই যদিও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভক্তরূপে আবির্ভূত হয়েছেন, তবুও তাঁকে একজন সাধারণ ভক্ত বলে মনে করা উচিত নয়। সেই সঙ্গে আমাদের এটিও বুঝতে হবে যে, যদিও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, কিন্তু যেহেতু তিনি ভক্তভাব অবলম্বন করে অবতীর্ণ হয়েছেন, তাঁর এই লীলাভেদের জন্য তাঁকে শ্রীকৃষ্ণের সমপর্যায়ভুক্ত করাও উচিত নয়। শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং পরমেশ্বর হলেও, সেবকোচিত লীলা প্রদর্শনকারী, অর্থাৎ ভক্তের লীলা প্রদর্শনকারী। তাই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকে যদি কেউ কৃষ্ণ বা বিষ্ণু বলে সম্বোধন করতেন, তখন ওই ভগবান সম্বোধন না শোনার জন্য তিনি কানে আঙ্গুল দিতেন। 'গৌর-নাগরী' নামক এক শ্রেণীর তথাকথিত ভক্ত রয়েছে, যারা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিগ্রহ নিয়ে কৃষ্ণলীলার অভিনয় করে। এটি একটি মস্ত বড় ভুল এবং একে বলা হয় 'রসাভাস'। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন ভক্তভাব অবলম্বন করেছেন, তখন তাঁকে পরমেশ্বর ভগবান বলে সম্বোধন করে বিরক্ত করা উচিত নয়।

শ্লোক ১১

কৃষ্ণমাধুর্যের এক অদ্ভুত স্বভাব ।
আপনা আস্বাদিতে কৃষ্ণ করে ভক্তভাব ॥ ১১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য রসের এমনই এক স্বভাব রয়েছে যে, সেই রস পূর্ণরূপে আস্বাদন করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভক্তভাব অবলম্ব করেন।

তাৎপর্য

যদিও শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত আনন্দের উৎস, তবুও নিজেকে আস্বাদন করার জন্য তিনি ভক্তভাব অবলম্বন করেন। এর থেকে বুঝতে হবে, ভক্তরূপে আবির্ভূত হলেও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। তাই বৈষ্ণব কবি গেয়েছেন, 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রাধাকৃষ্ণ নহে অন্য'—রাধা-কৃষ্ণের মিলিত তনুই হলেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু। *চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তম্*। শ্রীস্বরূপ দামোদর গোস্বামী বলেছেন যে, রাধা এবং কৃষ্ণ এক হয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে প্রকাশিত হয়েছেন।

শ্লোক ১২

ইথে ভক্তভাব ধরে চৈতন্য গোসাঞি ।
'ভক্তস্বরূপ' তাঁর নিত্যানন্দ-ভাই ॥ ১২ ॥

শ্লোকার্থ

এই জন্য পরম শিক্ষক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু 'ভক্তভাব' অবলম্বন করেন এবং 'ভক্তস্বরূপ' শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হন।

শ্লোক ১৩

'ভক্ত-অবতার' তাঁর আচার্য-গোসাঞি ।
এই তিন তত্ত্ব সবে প্রভু করি' গাই ॥ ১৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভু হচ্ছেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্ত-অবতার। ভাই এই তিন তত্ত্ব (শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু এবং শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভু) হচ্ছেন ঈশ্বরতত্ত্ব বা প্রভু।

তাৎপর্য

'গোসাঞি' মানে হচ্ছে গোস্বামী। যিনি তাঁর মন ও ইন্দ্রিয়সমূহকে সম্পূর্ণরূপে দমন করেছেন, তাঁকে বলা হয় গোস্বামী বা গোসাঞি। যিনি তা পারেন না, তাঁকে বলা হয় গোদাস বা ইন্দ্রিয়ের দাস, এবং সে কখনও গুরু হতে পারে না। যিনি মন এবং ইন্দ্রিয়ের বেগ দমন করতে পেরেছেন, তিনি গোস্বামী এবং তিনিই হচ্ছেন গুরু। যদিও এক শ্রেণীর তত্ত্বজ্ঞান রহিত মানুষ বংশানুক্রমিকভাবে এই গোস্বামী উপাধি ব্যবহার করে আসছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই গোসাঞি বা গোস্বামী উপাধির শুরু হয় শ্রীল রূপ গোস্বামী থেকে, যিনি গৃহস্থ-আশ্রমে বাংলার নবাব হুসেন শাহের মন্ত্রী ছিলেন, কিন্তু যখন তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা অবলম্বন করার ফলে চিন্ময় স্তরে উন্নীত হন, তখনই তিনি গোস্বামীতে পরিণত হলেন। সুতরাং গোস্বামী কোন বংশানুক্রমিক উপাধি নয়, তা হচ্ছে বিশেষ যোগ্যতাবাচক উপাধি। কেউ যখন পারমার্থিক স্তরে প্রভূত উন্নতি সাধন করেন, তিনি যে কুলেই জন্মগ্রহণ করুন না কেন, তিনি গোস্বামী উপাধিতে ভূষিত হওয়ার উপযুক্ত। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীঅদ্বৈত গোস্বামী প্রভু হচ্ছেন স্বাভাবিকভাবেই গোস্বামী, কারণ

তাঁরা হচ্ছেন বিষ্ণুতত্ত্ব। তাঁরা সকলেই হচ্ছেন প্রভু এবং কখনও কখনও তাঁদের চৈতন্য গোসাঞি, নিত্যানন্দ গোসাঞি এবং অদ্বৈত গোসাঞি বলা হয়। দুর্ভাগ্যবশত যাদের গোস্বামীসুলভ কোন যোগ্যতাই নেই, তাদের তথাকথিত বংশধরেরা বংশানুক্রমিকভাবে অথবা পেশাগতভাবে এই উপাধি অবলম্বন করেছেন। এই আচরণ শাস্ত্রসম্মত নয়।

শ্লোক ১৪

এক মহাপ্রভু, আর প্রভু দুইজন ।
দুই প্রভু সেবে মহাপ্রভুর চরণ ॥ ১৪ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁদের একজন হচ্ছেন মহাপ্রভু, এবং অন্য দুজন হচ্ছেন প্রভু। এই দুই প্রভু মহাপ্রভুর চরণ-কমলের সেবা করেন।

তাৎপর্য

যদিও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু এবং শ্রীঅদ্বৈত প্রভু সকলেই হচ্ছেন বিষ্ণুতত্ত্ব, তবুও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন পরমতত্ত্ব এবং অন্য দুই প্রভু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগত হওয়ার জন্য তাঁর সেবা করার মাধ্যমে সাধারণ জীবকে শিক্ষা দিচ্ছেন। *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের* আর এক জায়গায় (*আদি* ৫/১৪২) বলা হয়েছে, *একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য*—"একমাত্র ঈশ্বর হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ, এবং বিষ্ণুতত্ত্ব ও জীবতত্ত্ব সকলেই শ্রীকৃষ্ণের সেবক।" বিষ্ণুতত্ত্ব (নিত্যানন্দ প্রভু ও অদ্বৈত প্রভু) এবং জীবতত্ত্ব (শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ) উভয়েই মহাপ্রভুর সেবায় যুক্ত, তবে বিষ্ণুতত্ত্ব সেবকের এবং জীবতত্ত্ব সেবকের পার্থক্যের কথা সব সময় মনে রাখতে হবে। জীবতত্ত্ব সেবক গুরুদেব হচ্ছেন সেবক ঈশ্বর। পূর্ববর্তী শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, চিৎ-জগতে কোন বিভেদ নেই, কিন্তু তবুও ঈশ্বরতত্ত্ব এবং সেবক-তত্ত্বের পার্থক্য নিরূপণ করার জন্য এই ভেদ রয়েছে।

শ্লোক ১৫

এই তিন তত্ত্ব,—'সর্বারাধ্য' করি মানি ।
চতুর্থ যে ভক্ততত্ত্ব,—'আরাধক' জানি ॥ ১৫ ॥

শ্লোকার্থ

এই তিন তত্ত্ব (শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু এবং শ্রীঅদ্বৈত প্রভু) হচ্ছেন সমস্ত জীবের উপাস্য, আর চতুর্থ যে ভক্ততত্ত্ব (শ্রীগদাধর প্রভু) তিনি হচ্ছেন তাঁদের 'উপাসক'।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাঁর *অনুভাষ্যে* পঞ্চতত্ত্ব সম্বন্ধে বর্ণনা করার সময় ব্যাখ্যা করেছেন যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে আমরা পরম আরাধ্য বলে বুঝতে পারি, এবং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীঅদ্বৈত প্রভু যদিও তাঁর অধীন তত্ত্ব, তবুও তাঁরাও হচ্ছেন আরাধ্য। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন পরম ঈশ্বর ভগবান, এবং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীঅদ্বৈত প্রভু হচ্ছেন ভগবানের প্রকাশ। তাঁরা সকলেই বিষ্ণুতত্ত্ব এবং তাই তাঁরা জীবের উপাস্য। যদিও পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে দুটি তত্ত্ব—শক্তিতত্ত্ব এবং জীবতত্ত্ব অর্থাৎ গদাধর ও শ্রীবাস হচ্ছেন ভগবানের আরাধক, তবুও তাঁরা একই স্তরে অধিষ্ঠিত, কারণ তাঁরা নিত্যকাল ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত।

শ্লোক ১৬

শ্রীবাসাদি যত কোটি কোটি ভক্তগণ।
'শুদ্ধভক্ত'-তত্ত্বমধ্যে তাঁ-সবার গণন ॥ ১৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীবাসাদি ভগবানের আর যে অনন্ত কোটি ভক্ত রয়েছেন, তাঁরা সকলেই হচ্ছেন 'শুদ্ধ ভক্ত'-তত্ত্ব।

শ্লোক ১৭

গদাধর-পণ্ডিতাদি প্রভুর 'শক্তি'-অবতার।
'অন্তরঙ্গ-ভক্ত' করি' গণন যাঁহার ॥ ১৭ ॥

শ্লোকার্থ

গদাধর পণ্ডিতাদি ভক্তরা হচ্ছেন ভগবানের 'শক্তি' অবতার। তাঁরা ভগবানের সেবায় যুক্ত ভগবানের 'অন্তরঙ্গ ভক্ত'।

তাৎপর্য

ষোড়শ এবং সপ্তদশ শ্লোক সম্বন্ধে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাঁর *অনুভাষ্যে* বিশ্লেষণ করেছেন—"কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ দ্বারা ভগবানের অন্তরঙ্গ এবং শুদ্ধ ভক্ত চেনা যায়। ভগবানের সমস্ত শুদ্ধ ভক্তরা হচ্ছেন 'শক্তিতত্ত্ব'। তাঁদের কেউ মধুর রসে, কেউ বাৎসল্য রসে, কেউ সখ্যরসে এবং দাস্যরসে ভগবানের সঙ্গে যুক্ত। তাঁরা সকলেই ভক্ত, কিন্তু তুলনামূলকভাবে বিচার করলে দেখা যায় যে, মাধুর্য রসে ভগবানের সেবায় যুক্ত ভক্ত অন্য সকলের থেকে শ্রেয়। অতএব মধুর রসে নিত্য আশ্রিত ভক্তরাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ সেবক। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর সেবকেরা সাধারণত বাৎসল্য, সখ্য, দাস্য এবং শান্ত রসে অবস্থিত। শুদ্ধ ভক্তরাও যখন শ্রীগৌর-সুন্দরের প্রতি অত্যন্ত প্রীতিপরায়ণ হন, তখনই তাঁরা অন্তরঙ্গ ভক্তের আশ্রয়ে মধুর রসাশ্রিত হন।" ভগবদ্ভক্তির মার্গে এই ক্রমোন্নতির বর্ণনা করে শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুর গেয়েছেন—

'গৌরাঙ্গ' বলিতে হ'বে পুলক শরীর।
'হরি হরি' বলিতে নয়নে ব'হে নীর ॥
আর ক'বে নিতাইচাঁদের করুণা হইবে।
সংসার-বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে ॥
বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন।
কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন ॥
রূপ-রঘুনাথ-পদে হইবে আকুতি।
কবে হাম বুঝব সে যুগলপীরিতি ॥

"শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নাম গ্রহণ করার ফলে কবে আমার দেহ রোমাঞ্চিত হবে, ভগবানের পবিত্র নাম গ্রহণের ফলে কবে আমার চোখ দিয়ে অনর্গল ধারায় অশ্রু বর্ষিত হবে? শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু কবে আমাকে করুণা করবেন এবং কবে তিনি সংসার বাসনা থেকে আমাকে মুক্ত করবেন? যখন আমার মন সর্বপ্রকার জড় কলুষ মুক্ত হবে, তখনই কেবল আমার পক্ষে শ্রীবৃন্দাবন ধাম যথাযথভাবে দর্শন করা হবে, এবং আমি যদি কেবল রূপ গোস্বামী ও রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রমুখ ষড় গোস্বামীর নির্দেশের প্রতি আসক্ত হই, তা হলেই কেবল আমার পক্ষে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের যুগল প্রেম হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হবে।" শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রতি আসক্তির ফলে ভক্ত তৎক্ষণাৎ ভাবের স্তরে উন্নীত হন। কেউ যখন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রতি অনুরক্ত হন, তখন তিনি সব রকম জড় আসক্তি থেকে মুক্ত হন, এবং

ভগবানের বৃন্দাবনলীলা হৃদয়ঙ্গম করার যোগ্য হন। আর সেই স্তরে তিনি যখন ষড় গোস্বামীর আনুগত্য বরণ করেন, তখন তিনি শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের যুগল প্রেম হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। এগুলি হচ্ছে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে সম্পর্কিত হয়ে, শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের প্রেমভক্তির স্তরে শুদ্ধ ভক্তের উন্নীত হওয়ার বিভিন্ন স্তর।

শ্লোক ১৮-১৯

যাঁ-সবা লঞা প্রভুর নিত্য বিহার।
যাঁ-সবা লঞা প্রভুর কীর্তন-প্রচার ॥ ১৮ ॥
যাঁ-সবা লঞা করেন প্রেম আস্বাদন।
যাঁ-সবা লঞা দান করে প্রেমধন ॥ ১৯ ॥

শ্লোকার্থ

ভগবানের অন্তরঙ্গ ভক্ত বা শক্তিসমূহ ভগবানের লীলার অন্তরঙ্গ পার্ষদ। তাঁদের নিয়েই কেবল ভগবান তাঁর সংকীর্তন আন্দোলন প্রচার করেন, তাঁদের নিয়েই কেবল ভগবান প্রেমরস আস্বাদন করেন, এবং তাঁদের নিয়েই কেবল তিনি জনসাধারণকে প্রেমধন দান করেন।

তাৎপর্য

শুদ্ধ ভক্ত এবং অন্তরঙ্গ ভক্তদের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করে শ্রীল রূপ গোস্বামী *উপদেশামৃত* গ্রন্থে নিম্নলিখিত ক্রমোন্নতির কথা বর্ণনা করেছেন। হাজার হাজার কর্মীর থেকে একজন বেদজ্ঞ তত্ত্বজ্ঞানী শ্রেয়। এই রকম হাজার হাজার তত্ত্বজ্ঞানীর থেকে একজন জড় বিষয় মুক্ত ব্যক্তি হচ্ছেন শ্রেয় এবং কোটি কোটি মুক্ত পুরুষদের থেকে একজন কৃষ্ণভক্ত শ্রেয়। এই রকম বহু ভগবৎ-প্রেমীদের মধ্যে ব্রজগোপিকারা হচ্ছেন শ্রেষ্ঠা, এবং সমস্ত ব্রজগোপিকাদের মধ্যে শ্রীমতী রাধারাণী হচ্ছেন শ্রেষ্ঠা। শ্রীমতী রাধারাণী যেমন শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়, তেমনই তাঁর কুণ্ড রাধাকুণ্ডও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাঁর *অনুভাষ্যে* বলেছেন যে, পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে দুজন হচ্ছেন শক্তিতত্ত্ব, অপর তিনজন হচ্ছেন শক্তিমানতত্ত্ব। অন্যাভিলাষ শূন্য অন্তরঙ্গ ভক্তরা জ্ঞান এবং সকাম কর্মের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে আকুলভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যুক্ত। তাঁরা হচ্ছেন শুদ্ধ ভক্ত এবং তাঁদের মধ্যে যাঁরা প্রেমভক্তি-

পরায়ণ তাঁদের বলা হয় মাধুর্য রসের ভক্ত বা অন্তরঙ্গ ভক্ত। বাৎসল্য, সখ্য এবং দাস্য রস মাধুর্য প্রেমের অন্তর্ভুক্ত। তাই, এই সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, প্রতিটি অন্তরঙ্গ ভক্ত ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর স্বরূপ-প্রকাশ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুসহ তাঁর লীলা আস্বাদন করেন। তাঁর শুদ্ধ ভক্ত এবং তাঁর তিন পুরুষাবতার—কারণাব্ধিশায়ী বিষ্ণু, গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু এবং ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু সংকীর্তন প্রচার করার জন্য সর্বদাই ভগবানের সঙ্গে থাকেন।

শ্লোক ২০-২১

সেই পঞ্চতত্ত্ব মিলি' পৃথিবী আসিয়া।
পূর্ব-প্রেমভাণ্ডারের মুদ্রা উঘাড়িয়া ॥ ২০ ॥
পাঁচে মিলি' লুটে প্রেম, করে আস্বাদন।
যত যত পিয়ে, তৃষ্ণা বাঢ়ে অনুক্ষণ ॥ ২১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন অপ্রাকৃত প্রেমের ভাণ্ডার। যদিও পূর্বে যখন কৃষ্ণ এসেছেন তখন সেই প্রেমভাণ্ডারও তাঁর সঙ্গে এসেছে, তবে তা ছিল শীলমোহর দিয়ে রুদ্ধ। কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন পঞ্চতত্ত্ব সহ অবতীর্ণ হলেন, তখন তাঁরা শীলমোহর ভেঙ্গে সেই কৃষ্ণপ্রেম ভাণ্ডারের দ্বার উদ্ঘাটনপূর্বক লুণ্ঠন করে, সেই প্রেম আস্বাদন করলেন। আর যতই তাঁরা সেই প্রেমরস আস্বাদন করলেন, ততই তাঁদের তৃষ্ণা বৃদ্ধি পেতে লাগল।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে বলা হয় 'মহাবদান্য অবতার' কারণ যদিও তিনি হচ্ছেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, তবুও তিনি দুর্দশাগ্রস্ত বদ্ধ জীবদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের থেকেও বেশি করুণা প্রদর্শন করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন এই জগতে এসেছিলেন, তখন তিনি কেবল শরণাগত ভক্তদেরই রক্ষা করেছিলেন, কিন্তু সপার্ষদ এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কোন যোগ্যতার অপেক্ষা না করে, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে কৃষ্ণপ্রেম দান করেছিলেন। তাই শ্রীল রূপ গোস্বামী বুঝতে পেরেছিলেন যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া আর কেউ নন, কারণ পরমেশ্বর ভগবান ছাড়া অত্যন্ত দুর্লভ এই ভগবৎ-প্রেম অন্য কেউ এইভাবে দান করতে পারেন না।

শ্লোক ২২

পুনঃ পুনঃ পিয়াইয়া হয় মহামত্ত ।
নাচে, কান্দে, হাসে, গায়, যৈছে মদমত্ত ॥ ২২ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে পঞ্চতত্ত্ব স্বয়ংই পুনঃ পুনঃ সেই ভগবৎ প্রেমামৃত অত্যন্ত সহজ-সরলভাবে সকলকে পান করিয়ে প্রেমোন্মত্ত হলেন। তাঁরা সেই আনন্দে এমনভাবে নাচতেন, কাঁদতেন, হাসতেন, গান করতেন, তা দেখে মনে হত যেন তাঁরা উন্মাদ হয়ে গিয়েছেন।

তাৎপর্য

মানুষ সাধারণত কীর্তন এবং নৃত্যের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। গোস্বামীদের মহিমা বর্ণনা করে শ্রীনিবাস আচার্য বলেছেন, *কৃষ্ণোৎকীর্তন-গান-নর্তন-পরৌ*—কেবল শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং তাঁর পার্ষদেরাই নৃত্য, কীর্তন করেননি, পরবর্তীকালে ষড়্ গোস্বামীরাও সেই পন্থার অনুসরণ করেছেন। বর্তমানে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনও এই পন্থার অনুগামী, তাই কেবল কীর্তন করে এবং নৃত্য করে আমরা সারা পৃথিবী জুড়ে প্রবলভাবে সাড়া পেয়েছি। আমাদের বুঝতে হবে যে, এই নৃত্য, কীর্তন জড় জগতের বস্তু নয়। তা হচ্ছে চিন্ময় ক্রিয়া। কারণ মানুষ যতই এই নৃত্য, কীর্তনে যোগদান করেন, ততই তিনি ভগবৎ প্রেমামৃত আস্বাদন করেন।

শ্লোক ২৩

পাত্রাপাত্র-বিচার নাহি, নাহি স্থানাস্থান ।
যেই যাঁহা পায়, তাঁহা করে প্রেমদান ॥ ২৩ ॥

শ্লোকার্থ

ভগবৎ-প্রেম বিতরণ করার সময় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং তাঁর পার্ষদেরা কে যোগ্য কে অযোগ্য সেই কথা বিচার না করে, স্থান-অস্থানের বিচার না করে, সেখানে যাকে পেয়েছেন তাকেই ভগবৎ-প্রেম দান করেছেন।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রবর্তিত এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন আজ ইউরোপীয়ান; আমেরিকানদের ব্রাহ্মণত্ব দান করছে এবং সন্ন্যাস-আশ্রমে অধিষ্ঠিত করছে বলে,

কিছু মূর্খ মানুষ এই আন্দোলনের সমালোচনা করে। কিন্তু এখানে আমরা প্রমাণ পাচ্ছি, মহাপ্রভু প্রদত্ত এই ভগবৎ-প্রেম বিতরণে ইউরোপীয়ান, আমেরিকান, হিন্দু, মুসলমান, ইত্যাদি বিচার নেই। যেখানে সম্ভব সেখানেই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রচার করতে হবে। এইভাবে যাঁরা বৈষ্ণব হন, তাঁদের তথাকথিত ব্রাহ্মণ, হিন্দু অথবা ভারতীয়দের থেকে অনেক উচ্চস্তরে অধিষ্ঠিত বলে বুঝতে হবে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু চেয়েছিলেন যে, পৃথিবীর প্রতিটি নগরে ও গ্রামে ভগবানের নামের প্রচার হোক। অতএব সারা পৃথিবী জুড়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রবর্তিত পন্থার যখন প্রচার হল, তখন যাঁরা তা সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করলেন, তাঁদের কি বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণ এবং সন্ন্যাসী বলে স্বীকার করা হবে না? মূর্খের মতো যারা তার প্রতিবাদ করে, তারা ঈর্ষাপরায়ণ একদল পাষণ্ড ছাড়া আর কিছুই নয়। কৃষ্ণভক্তরা তাদের সেই কথায় কর্ণপাত করেন না। আমরা যে পন্থার অনুসরণ করছি, তা পঞ্চতত্ত্ব প্রবর্তিত পন্থা।

শ্লোক ২৪

লুটিয়া, খাইয়া, দিয়া, ভাণ্ডার উজাড়ে ।
আশ্চর্য ভাণ্ডার, প্রেম শতগুণ বাড়ে ॥ ২৪ ॥

শ্লোকার্থ

এই পঞ্চতত্ত্ব যদিও সেই প্রেমভাণ্ডার লুটপাট করে খেয়ে এবং বিতরণ করে তা উজাড় করলেন, কিন্তু তাতে তা ফুরিয়ে গেল না। পক্ষান্তরে, সেই আশ্চর্য ভাণ্ডার যতই বিতরণ করা হল, ততই তা শত শত গুণে বর্ধিত হল।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলে পরিচয় দানকারী এক ভণ্ড একবার তার শিষ্যকে বলেছিল যে, সমস্ত জ্ঞান তাকে দান করার ফলে সব কিছু নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। এই ধরনের ভণ্ডরা মানুষকে প্রতারণা করার জন্য এইভাবে কথা বলে, কিন্তু প্রকৃত পরমার্থ-চেতনা এমনই পূর্ণ যে, তা যতই বিতরণ করা যায়, ততই বাড়তে থাকে। জড় জগতে যখন কোন বস্তু বিতরণ করা হয়, তখন তার পরিমাণ কমে যায়, কিন্তু চিন্ময় জগতের ভগবৎ-প্রেম বিতরণের ফলে কখনই তা পরিমাণে কমে না। শ্রীকৃষ্ণ অনন্ত কোটি জীবের সমস্ত প্রয়োজনগুলি সরবরাহ করছেন, আর সেই অনন্ত কোটি জীব যদি কৃষ্ণভাবনাময় হতে চায়, তা হলে ভগবৎ-প্রেমের কোন অভাব

হবে না, এবং তাদের জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় বস্তুগুলিরও অভাব হবে না। আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন আমি এককভাবে শুরু করেছিলাম এবং আমাদের জীবনধারণের অন্য কেউ কোন রকম সাহায্য করেনি, কিন্তু আজ আমরা সারা পৃথিবী জুড়ে কোটি কোটি ডলার ব্যয় করছি, এবং এই আন্দোলন ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে। সুতরাং অভাবের কোন প্রশ্নই ওঠে না। ঈর্ষাপরায়ণ মানুষেরা আমাদের হিংসা করতে পারে, কিন্তু আমরা যদি আমাদের আদর্শে অবিচলিত থেকে পঞ্চতত্ত্বের পদাঙ্ক অনুসরণ করি, তা হলে ভণ্ড সাধু-সন্ন্যাসী, ধর্মযাজক, দার্শনিক অথবা বৈজ্ঞানিকদের সমস্ত বাধাবিপত্তি উপেক্ষা করে এই আন্দোলন প্রসারিত হতে থাকবে, কারণ এই আন্দোলন সব রকম জড় প্রভাবের অতীত। তাই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রচারকদের কখনই এই ধরনের মূর্খ ও পাষণ্ডদের ভয়ে ভীত হওয়া উচিত নয়।

শ্লোক ২৫

উছলিল প্রেমবন্যা চৌদিকে বেড়ায় ।
স্ত্রী, বৃদ্ধ, বালক, যুবা, সবারে ডুবায় ॥ ২৫ ॥

শ্লোকার্থ

প্রেমের বন্যা উথলে উঠে চারিদিকে বিস্তৃত হতে লাগল, এবং তার ফলে স্ত্রী, বৃদ্ধ, বালক, যুবক সকলেই এই প্রেমবন্যায় নিমজ্জিত হল।

তাৎপর্য

এইভাবে যখন প্রেমভাণ্ডারের ভগবৎ-প্রেম বিতরণ হয়, তখন তা বন্যার মতো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। শ্রীধাম মায়াপুরে কখনও কখনও বর্ষার প্লাবন হয়। এটি একটি ঈঙ্গিত অর্থাৎ তেমনই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মস্থান থেকে ভগবৎ-প্রেমের বন্যা সারা পৃথিবীকে প্লাবিত করবে, কারণ তা স্ত্রী, বৃদ্ধ, বালক, যুবক, সকলকেই সাহায্য করবে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন এতই শক্তিশালী যে, তা সমস্ত জগৎকে প্লাবিত করতে পারে এবং সর্বস্তরের মানুষকে প্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে পারে।

শ্লোক ২৬

সজ্জন, দুর্জন, পঙ্গু, জড়, অন্ধগণ ।
প্রেমবন্যায় ডুবাইল জগতের জন ॥ ২৬ ॥

শ্লোকার্থ

কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন সমস্ত জগৎকে প্লাবিত করল, এবং সজ্জন, দুর্জন, পঙ্গু, জড়, অন্ধ আদি সকলেই তাতে ডুবে গেল।

তাৎপর্য

এখানে আবার উল্লেখ করা যায়, যদিও ঈর্ষাপরায়ণ পাষণ্ডরা প্রতিবাদ করে যে, ইউরোপীয় এবং আমেরিকানরা যজ্ঞোপবীত ধারণ করার অথবা সন্ন্যাস-আশ্রম অবলম্বন করার যোগ্য নন, কিন্তু তাদের একবার বিবেচনা করে দেখা উচিত যে, সজ্জন-দুর্জন নির্বিশেষে সকলেই এই আন্দোলনে যোগদান করতে পারেন, কারণ এই আন্দোলন রক্ত-মাংসের তৈরি জড় দেহের অপেক্ষা করে না। যেহেতু এই আন্দোলন পঞ্চতত্ত্বের অধ্যক্ষতায় শুদ্ধ-ভক্তির সহায়ক বিধি-নিষেধগুলি কঠোরভাবে পালন করে যথাযথভাবে পরিচালিত হচ্ছে, তাই কোন বাহ্যিক প্রতিবন্ধক এই আন্দোলনকে বাধা দিতে পারে না।

শ্লোক ২৭

জগৎ ডুবিল, জীবের হৈল বীজ নাশ ।
তাহা দেখি' পাঁচ জনের পরম উল্লাস ॥ ২৭ ॥

শ্লোকার্থ

পঞ্চতত্ত্বের এই পাঁচজন যখন দেখলেন যে, ভগবৎ-প্রেমে সমস্ত জগৎ নিমজ্জিত হয়েছে এবং জীবের জড় ভোগবাসনার বীজ সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়েছে, তখন তাঁদের পরম উল্লাস হল।

তাৎপর্য

এই বিষয়ে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাঁর *অনুভাষ্যে* লিখেছেন যে, যেহেতু জীব ভগবানের তটস্থা শক্তিসম্ভূত এবং প্রতিটি জীবেরই কৃষ্ণভাবনাময় হওয়ার স্বাভাবিক প্রবণতা রয়েছে, তবুও সেই সঙ্গে জড় জগৎকে ভোগ করার বীজও তাদের মধ্যে নিঃসন্দেহে বর্তমান আছে। এই ভোগবাসনার বীজগুলিতে যখন জড়া প্রকৃতির প্রলোভনগুলির দ্বারা জলসিঞ্চিত হয়, তখন তা অঙ্কুরিত হয়ে ক্রমে ক্রমে জড় বন্ধনরূপ মহীরুহে পরিণত হয়, এবং জীব তখন সব রকম জড় ভোগের প্রতি আসক্ত হয়। এইভাবে জড় ভোগের আসক্তি ত্রিতাপ দুঃখ সমন্বিত। কিন্তু

প্রকৃতির নিয়মে যখন বন্যা হয়, তখন বীজ যেমন আর অঙ্কুরিত হতে পারে না, তেমনই সারা পৃথিবী যখন ভগবৎপ্রেমের বন্যায় প্লাবিত হয়, তখন জড় ভোগবাসনার বীজ নষ্ট হয়ে যায়। এইভাবে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের যতই প্রসার হবে, ততই মানুষের জড় ভোগাসক্তি কমে যাবে। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রসারের ফলে, এই ভোগবাসনার বীজ আপনা থেকেই নষ্ট হয়ে যাবে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপার প্রভাবে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন যে সারা পৃথিবী জুড়ে প্রসার লাভ করছে, সেই জন্য ঈর্ষাপরায়ণ না হয়ে আনন্দিত হওয়া উচিত। সেই সম্পর্কে এখানে বলা হয়েছে, 'পরম উল্লাস'। কিন্তু যেহেতু তারা হচ্ছে কনিষ্ঠ অধিকারী বা প্রাকৃত ভক্ত (পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞান রহিত জড় বিষয়াসক্ত ভক্ত), তাই তারা আনন্দিত হওয়ার পরিবর্তে ঈর্ষান্বিত হচ্ছে, এবং তারা কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের ভুলত্রুটি দেখার চেষ্টা করছে। শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী তাঁর *চৈতন্যচন্দ্রামৃত* গ্রন্থে লিখেছেন যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বিষয়ীরা তাদের স্ত্রী-পুত্রদের সম্বন্ধে কথা বলতে বিরক্তি অনুভব করেন, তথাকথিত জ্ঞানীরা বেদপাঠ বর্জন করেন, যোগীরা ক্লেশকর যোগসাধনা ত্যাগ করেন, তপস্বীরা কঠোর তপশ্চর্যা ত্যাগ করেন এবং সন্ন্যাসীরা *সাংখ্য-দর্শন* অধ্যয়ন বর্জন করেন। এইভাবে তাঁরা সকলেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্তিযোগ অনুশীলনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে, কৃষ্ণভাবনামৃতের উন্নত রসমাধুর্য আস্বাদন করতে পারেন।

শ্লোক ২৮

যত যত প্রেমবৃষ্টি করে পঞ্চজনে ।
তত তত বাঢ়ে জল, ব্যাপে ত্রিভুবনে ॥ ২৮ ॥

শ্লোকার্থ

পঞ্চতত্ত্বের পাঁচজন যতই এই ভগবৎ প্রেমবৃষ্টি বর্ষণ করেন, ততই সেই প্রেম বন্যার জল বাড়তে থাকে এবং সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন সীমিত ও গতিহীন নয়। ইউরোপীয় এবং আমেরিকান বা ম্লেচ্ছদের সন্ন্যাসী ও ব্রাহ্মণ হওয়ার পক্ষে মূর্খ ও পাষণ্ডীদের বাধা প্রদান সত্ত্বেও এই আন্দোলন সারা পৃথিবীতে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে। এখানে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, সারা পৃথিবী কৃষ্ণপ্রেমের বন্যায় প্লাবিত হবে।

শ্লোক ২৯-৩০

মায়াবাদী, কর্মনিষ্ঠ কুতার্কিকগণ ।
নিন্দক, পাষণ্ডী, যত পড়ুয়া অধম ॥ ২৯ ॥
সেই সব মহাদক্ষ ধাঞা পলাইল ।
সেই বন্যা তা-সবারে ছুঁইতে নারিল ॥ ৩০ ॥

শ্লোকার্থ

মায়াবাদী, সকাম কর্মী, কুতার্কিক, নিন্দুক, পাষণ্ডী এবং অধম পড়ুয়া, এরা সকলেই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনকে এড়িয়ে যাওয়ার ব্যাপারে মহাদক্ষ, এবং তাই কৃষ্ণভাবনামৃতের বন্যা তাদের স্পর্শ করতে পারে না।

তাৎপর্য

কাশীর প্রকাশানন্দ সরস্বতী প্রমুখ মায়াবাদী দার্শনিকদের মতো আধুনিক যুগের মায়াবাদীরাও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে উৎসাহী নয়। এই জড় জগতের মূল্য তারা বোঝে না; তারা মনে করে যে, এটি হচ্ছে মিথ্যা এবং কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন যে কিভাবে তার সদ্ব্যবহার করতে পারে, তা তারা বুঝতে পারে না। তারা তাদের নির্বিশেষবাদী চিন্তায় এতই মগ্ন যে, তারা মনে করে সব রকম চিন্ময় বৈচিত্র্য হচ্ছে জড়। যেহেতু তারা ব্রহ্মজ্যোতি সম্বন্ধে তাদের ভ্রান্ত ধারণার অতীত আর কিছুই জানে না, তাই তারা বুঝতে পারে না যে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন চিন্ময় এবং তাই তিনি মায়ার অতীত। শ্রীকৃষ্ণ যখন স্বয়ং অবতরণ করেন অথবা ভক্তরূপে অবতরণ করেন, তখন মায়াবাদী দার্শনিকেরা তাঁকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে। *ভগবদ্গীতায়* তার নিন্দা করা হয়েছে—

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্ ।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥

"আমি যখন মনুষ্যরূপে অবতরণ করি, তখন মূর্খেরা আমাকে অবজ্ঞা করে। তারা আমার অপ্রাকৃত পরম ভাব সম্বন্ধে অবগত নয় এবং তারা জানে না যে, আমিই হচ্ছি সব কিছুর অধীশ্বর" (*ভগবদ্গীতা* ৯/১১) ।

অনেক দুষ্ট প্রবঞ্চক রয়েছে, যারা ভগবানের অবতরণের সুযোগ নিয়ে নিজেদের ভগবানের অবতার বলে প্রচার করে, সরলচিত্ত মানুষদের প্রতারণা করে। ভগবানের অবতার শাস্ত্রপ্রমাণের দ্বারা প্রমাণিত হন এবং তিনি এমন সব অলৌকিক কার্যকলাপ সম্পাদন করেন, যা কোন মানুষের পক্ষেই করা সম্ভব নয়। কোন মূর্খ পাষণ্ডীকে

কখনই ভগবানের অবতার বলে গ্রহণ করা উচিত নয়, পক্ষান্তরে তার পরম ঈশ্বরত্ব পরীক্ষা করে দেখা উচিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে *ভগবদ্গীতা* শিক্ষাদান করেছিলেন, এবং অর্জুন তাঁকে পরমেশ্বর ভগবান বলে স্বীকার করেছিলেন; কিন্তু আমাদের বোঝাবার জন্য অর্জুন ভগবানকে তাঁর বিশ্বরূপ প্রদর্শন করতে অনুরোধ করেছিলেন। এইভাবে পরীক্ষা হয়েছিল তিনি যথার্থই ভগবান কি না। তেমনই, তথাকথিত অবতারদেরও পরীক্ষা করে দেখা উচিত। কতকগুলি ভেলকিবাজি দেখে, অথবা একটু-আধটু যোগসিদ্ধি দেখে কাউকে ভগবান বলে গ্রহণ করার পরিবর্তে, শাস্ত্রপ্রমাণের ভিত্তিতে তথাকথিত সমস্ত ভগবানের অবতারদের পরীক্ষা করে দেখানোই সবচেয়ে ভাল। শাস্ত্রসমূহে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তাই কেউ যদি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুকরণ করার চেষ্টা করে দম্ভ করে যে, সে হচ্ছে ভগবানের অবতার, তা হলে তাকে সেই দাবী প্রতিপন্ন করার জন্য তাঁর আবির্ভাব সম্বন্ধে শাস্ত্রপ্রমাণ দেখাতে হবে।

শ্লোক ৩১-৩২

তাহা দেখি' মহাপ্রভু করেন চিন্তন ।
জগৎ ডুবাইতে আমি করিলুঁ যতন ॥ ৩১ ॥
কেহ কেহ এড়াইল, প্রতিজ্ঞা হইল ভঙ্গ ।
তা-সবা ডুবাইতে পাতিব কিছু রঙ্গ ॥ ৩২ ॥

শ্লোকার্থ

মায়াবাদী এবং অন্যান্য ভগবৎ-বিদ্বেষীদের পালাতে দেখে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু চিন্তা করলেন—আমি সমস্ত জগৎকে ভগবৎ-প্রেমের বন্যায় নিমজ্জিত করতে মনস্থ করেছিলাম, কিন্তু তাদের কেউ কেউ এড়িয়ে গেল। তাই তাদের সকলকে ডুবাবার জন্য আমি কিছু পন্থা অবলম্বন করব।

তাৎপর্য

এটি একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মায়াবাদী এবং অন্য যারা কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করতে চাইছিল না, তাদের পাকড়াও করার জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু একটি উপায় উদ্ভাবন করতে চেয়েছিলেন। এটিই হচ্ছে আচার্যের লক্ষণ। ভগবানের সেবা করতে আসেন যে আচার্য, তিনি গতানুগতিকভাবে তাঁর কাজ করেন না, কারণ কৃষ্ণভাবনার অমৃত যাতে প্রচার হয়, সেই জন্য তাঁকে বিভিন্ন উপায়

উদ্ভাবন করতে হয়। ছেলেরা এবং মেয়েরা সমানভাবে ভগবৎ-প্রেম বিতরণ করছেন বলে, ঈর্ষাপরায়ণ মানুষেরা কখনও কখনও কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের সমালোচনা করে। তারা জানে না যে, ইউরোপ এবং আমেরিকার দেশগুলিতে ছেলে-মেয়েরা পরস্পরের সঙ্গে খুব খোলাখুলিভাবে মেলামেশা করে। তাই এই সমস্ত মূর্খ সমালোচকদের বিবেচনা করা উচিত যে, কোন সমাজের সামাজিক রীতিনীতি হঠাৎ পরিবর্তন করা যায় না। কিন্তু, যেহেতু এই সমস্ত ছেলে-মেয়েরা ভগবানের বাণী প্রচার করার শিক্ষা লাভ করছে, তাই এই সমস্ত মেয়েরা কোন সাধারণ মেয়ে নয়, তারা হচ্ছে তাদেরই ভাইদের মতো কৃষ্ণভাবনামৃতের প্রচারক। এইভাবে ছেলেদের এবং মেয়েদের সম্পূর্ণ চিন্ময় স্তরে উন্নীত করা কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রচারের একটি পদ্ধতি। যে সমস্ত ঈর্ষাপরায়ণ মূর্খরা ছেলে-মেয়েদের মেলামেশার সমালোচনা করে, তাদের নিজেদের মূর্খতায় আচ্ছন্ন থেকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে, কারণ বিভিন্ন উপায় অবলম্বন-পূর্বক কিভাবে যে কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচার করা যায়, সেই সম্বন্ধে চিন্তা করার ক্ষমতা তাদের নেই। তাদের গতানুগতিক পদ্ধতিতে তারা কখনই কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারে সক্ষম হবে না। তাই, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় আমরা যা করছি, সেটিই হচ্ছে যথার্থ পন্থা, কারণ কৃষ্ণবিমুখ মানুষদের কৃষ্ণপ্রেম দান করার জন্য তিনি নিজেও উপায় উদ্ভাবন করেছিলেন।

শ্লোক ৩৩

এত বলি' মনে কিছু করিয়া বিচার ।
সন্ন্যাস-আশ্রম প্রভু কৈলা অঙ্গীকার ॥ ৩৩ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে বিবেচনা করে মহাপ্রভু সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণ করার কোন প্রয়োজন ছিল না, কারণ তিনি হচ্ছেন স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান এবং তাই জড় দেহাত্মবুদ্ধির সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নিজেকে চতুর্বর্ণ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র) এবং চতুরাশ্রম (ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস)-এর অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করেননি। তাঁর প্রকৃত পরিচয় হচ্ছে পরম আত্মারূপে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অথবা যে কোন শুদ্ধ ভক্ত

কখনই সামাজিক এবং পারমার্থিক উপাধির দ্বারা পরিচিত হন না, কারণ ভক্ত সর্বদাই এই সমস্ত উপাধি থেকে মুক্ত। কিন্তু তা সত্ত্বেও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ করতে মনস্থ করেছিলেন, কারণ তা হলে সকলেই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে এবং তার ফলে তাদের মঙ্গল হবে। যদিও তাঁর সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ করার কোন প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু তবুও যারা তাঁকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করছিল, তাদের মঙ্গলের জন্য তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর সন্ন্যাস-আশ্রম অবলম্বন করার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের উদ্ধার করা। তা এই অধ্যায়ের শেষ দিকে দেখা যাবে।

'মায়াবাদী' কথাটির ব্যাখ্যা করে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন যে, পরমেশ্বর ভগবান জড়ের অতীত। অতএব 'মায়াবাদী' হচ্ছে সে, যে মনে করে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গ মায়ার দ্বারা রচিত, এবং যে মনে করে ভগবদ্ধাম ও ভগবানের অনুগত হওয়ার পন্থা ভগবদ্ভক্তি হচ্ছে মায়া। মায়াবাদীরা মনে করে যে, ভগবদ্ভক্তির সমস্ত উপকরণ হচ্ছে মায়া। মায়া মানে হচ্ছে জড় অস্তিত্ব, যার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সকাম কর্ম এবং তার ফল। মায়াবাদীরা মনে করে যে, ভগবদ্ভক্তিও হচ্ছে এই রকম সকাম কর্ম। তাদের মতে ভাগবত বা ভক্ত যখন জ্ঞানের দ্বারা পবিত্র হয়, তখন তারা মুক্তির স্তরে আসবে। ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে যারা এইভাবে অনুমান করে, তাদের বলা হয় 'কুতার্কিক', এবং যারা ভগবদ্ভক্তিকে সকাম কর্ম বলে মনে করে, তাদের বলা হয় 'কর্মনিষ্ঠ'। যারা ভগবদ্ভক্তির সমালোচনা করে, তাদের বলা হয় 'নিন্দক'। তেমনই, যে সমস্ত অভক্ত ভগবানকে অন্যান্য দেবতাদের সমপর্যায়ভুক্ত বলে মনে করে, তাদের বলা হয় 'পাষণ্ডী'। যে সমস্ত পড়ুয়া বিদ্যাকে তর্কের কারণ বলে নির্ণয় করে এবং বিদ্যা যে ঈশ্বর প্রাপ্তির উপায়, তা জানে না, তাদের বলা হয় 'অধম-পড়ুয়া'। 'কুতার্কিক', 'নিন্দক', 'পাষণ্ডী', 'অধম-পড়ুয়া' এরা সকলেই প্রেমময় গৌরসুন্দরের প্রদত্ত প্রেমবন্যার জল তাদের যেন কোনমতে স্পর্শ করতে না পারে, সেই রকম উদ্দেশ্যের বশবর্তী হয়ে পালিয়ে গেল। তা দেখে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাদের প্রতি করুণা অনুভব করেন এবং সেই জন্যই তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করতে মনস্থ করেন। সন্ন্যাসীরূপে তাঁকে দেখে তারা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ হবে। ভারতবর্ষে আজও সন্ন্যাসীরা যথেষ্ট শ্রদ্ধা পেয়ে থাকেন। সন্ন্যাসীর পোশাক পরিহিত যে কোন মানুষের প্রতিই ভারতবাসীরা শ্রদ্ধাশীল। তাই সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ করার কোন প্রয়োজন না থাকলেও, ভগবদ্ভক্তির পন্থা প্রচার করার জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন।

শ্লোক ৩৪

চব্বিশ বৎসর ছিলা গৃহস্থ-আশ্রমে ।
পঞ্চবিংশতি বর্ষে কৈল যতিধর্মে ॥ ৩৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু চব্বিশ বৎসর গৃহস্থ-আশ্রমে ছিলেন, এবং পঞ্চবিংশতি বর্ষের শুরুতে তিনি সন্ন্যাস-ধর্ম অবলম্বন করলেন।

তাৎপর্য

জীবনের চারটি আশ্রম হচ্ছে—ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস। এই আশ্রমের প্রতিটির আবার চারটি করে ভাগ রয়েছে। ব্রহ্মচর্য-আশ্রমের ভাগগুলি হচ্ছে—*সাবিত্র্য, প্রাজাপত্য, ব্রাহ্ম* এবং *বৃহৎ*। গৃহস্থ-আশ্রমের ভাগগুলি হচ্ছে—*বার্তা* (অনিষিদ্ধ কৃষি আদি বৃত্তি), *সঞ্চয়* (যাজন আদি বৃত্তি), *শালীন* (অযাচিত বৃত্তি) এবং *শিলোঞ্ছন* (ক্ষেতে পড়ে থাকা শস্যকণিকা কুড়িয়ে জীবনধারণ বৃত্তি)। তেমনই বানপ্রস্থ-আশ্রমের চারটি ভাগ হচ্ছে—*বৈখানস, বালিখিল্য, ঔড়ুম্বর* এবং *ফেণপ*। আর সন্ন্যাস-আশ্রমের চারটি ভাগ হচ্ছে—*কুটীচক, বহূদক, হংস* এবং *নিষ্ক্রিয়*। সন্ন্যাস দুই রকমের রয়েছে—*ধীর* এবং *নরোত্তম*। এই সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/১৩/২৬-২৭) বর্ণনা করা হয়েছে। ১৪৩২ শকাব্দে মাঘ মাসের শুক্লপক্ষে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শঙ্কর-সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী শ্রীকেশব ভারতীর কাছ থেকে কাটোয়ায় সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

শ্লোক ৩৫

সন্ন্যাস করিয়া প্রভু কৈলা আকর্ষণ ।
যতেক পালাঞাছিল তার্কিকাদিগণ ॥ ৩৫ ॥

শ্লোকার্থ

সন্ন্যাস গ্রহণ করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তার্কিক আদি যারা সকলে তাঁর কাছ থেকে পালিয়ে গিয়েছিল তাদের আকর্ষণ করলেন।

শ্লোক ৩৬

পড়ুয়া, পাষণ্ডী, কর্মী, নিন্দকাদি যত ।
তারা আসি' প্রভু-পায় হয় অবনত ॥ ৩৬ ॥

শ্লোকার্থ

যত পড়ুয়া, পাষণ্ডী, কর্মী ও নিন্দক ছিল, তারা সকলেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর চরণকমলে শরণাগত হল।

শ্লোক ৩৭

অপরাধ ক্ষমাইল, ডুবিল প্রেমজলে ।
কেবা এড়াইবে প্রভুর প্রেম-মহাজালে ॥ ৩৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাদের সকলের অপরাধ ক্ষমা করলেন এবং তারা সকলে ভগবৎ প্রেমামৃতের সমুদ্রে নিমজ্জিত হল। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই অভিনব প্রেমরূপী জাল কে এড়াতে পারে?

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ছিলেন একজন আদর্শ আচার্য। আচার্য হচ্ছেন সেই আদর্শ শিক্ষক, যিনি শাস্ত্রতত্ত্ব সম্যকরূপে অবগত, যিনি শাস্ত্রনির্দেশ অনুসারে আচরণ করেন, যিনি তাঁর শিষ্যদের সেই তত্ত্ব অনুশীলন করতে অনুপ্রাণিত করেন। একজন আদর্শ আচার্যরূপে সব রকমের নাস্তিক এবং জড়বাদীদের আকর্ষণ করার জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বিভিন্ন উপায় উদ্ভাবন করেছিলেন। প্রত্যেক আচার্য মানুষকে কৃষ্ণভাবনায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য তাঁর চিন্ময় আন্দোলন প্রচার করার বিশেষ পন্থা অবলম্বন করেন। তাই, একজন আচার্যের পন্থা অন্য আচার্যের পন্থা থেকে ভিন্ন হলেও উদ্দেশ্য কিন্তু চরমে একই থাকে। শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন—

যেন তেন প্রকারেণ মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ ।
সর্বে বিধিনিষেধা স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ ॥

আচার্যের কর্তব্য হচ্ছে এমন সমস্ত উপায় উদ্ভাবন করা, যার দ্বারা কোন না কোনভাবে মানুষকে কৃষ্ণভাবনায় অনুপ্রাণিত করা যায়। প্রথমে তাদের কৃষ্ণভাবনায় অনুপ্রাণিত করতে হবে, এবং তারপর ধীরে ধীরে বিধি-নিষেধগুলি অনুশীলন করাতে

হবে। আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে আমরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই পন্থা অনুসরণ করছি। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে ছেলে-মেয়েরা অবাধে মেলামেশা করে, তাই কৃষ্ণভক্তির পথে তাদের নিয়ে আসার জন্য তাদের অভ্যাস এবং সামাজিক রীতি-নীতিগুলির যথাযথভাবে প্রয়োগের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আচার্যের কর্তব্য হচ্ছে, মানুষকে ভগবদ্ভক্তির পথে নিয়ে আসার উপায় উদ্ভাবন করা। তাই যদিও আমি সন্ন্যাসী, তবুও আমি কখনও কখনও ছেলে-মেয়েদের বিবাহে অংশ গ্রহণ করি। অথচ সন্ন্যাসীর ইতিহাসে কখনও কোন সন্ন্যাসী তার শিষ্যের বিবাহ অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেননি।

শ্লোক ৩৮

সবা নিস্তারিতে প্রভু কৃপা-অবতার ।
সবা নিস্তারিতে ·রে চাতুরী অপার ॥ ৩৮ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অবতীর্ণ হয়েছিলেন সমস্ত অধঃপতিত জীবদের উদ্ধার করার জন্য। তাই মায়ার কবল থেকে তাদের সকলকে উদ্ধার করার জন্য তিনি নানা রকমের চাতুরী অবলম্বন করেছিলেন।

তাৎপর্য

আচার্যের কর্তব্য হচ্ছে অধঃপতিত জীবদের প্রতি করুণা প্রদর্শন করা। এই সম্পর্কে 'দেশ-কাল-পাত্র' সম্বন্ধে বিবেচনা করতে হয়। যেহেতু আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে ইউরোপীয় এবং আমেরিকান ছেলে-মেয়েরা মিলিতভাবে প্রচার করে, তাই অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা সমালোচনা করে যে, তারা অবাধে মেলামেশা করছে। ইউরোপ এবং আমেরিকায় ছেলে-মেয়েরা অবাধে মেলামেশা করে এবং তাদের সমান অধিকার রয়েছে, তাই ছেলে-মেয়েদের সম্পূর্ণ আলাদা করে দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু, আমরা ছেলেদের এবং মেয়েদের উভয়কেই শিক্ষা দিয়েছি, কিভাবে ভগবানের বাণী প্রচার করতে হয়, এবং তারা অপূর্ব সুন্দরভাবে ভগবানের বাণী প্রচার করছে। অবৈধ সঙ্গ অবশ্যই সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। বিবাহিত না হলে ছেলে-মেয়েরা একত্রে বসবাস করতে পারে না, এবং প্রতিটি মন্দিরে ছেলেদের এবং মেয়েদের আলাদা থাকবার ব্যবস্থা রয়েছে। গৃহস্থরা মন্দিরের বাইরে থাকে, কারণ মন্দিরে বিবাহিত পতি-পত্নীর একসঙ্গে থাকাও আমরা অনুমোদন করি না, তার ফলও

হয়েছে অপূর্ব। স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই পূর্ণ উদ্যমে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এবং শ্রীকৃষ্ণের বাণী প্রচার করছে। এই শ্লোকে 'সবা নিস্তারিতে করে চাতুরী অপার'—উক্তিটির মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সকলকেই উদ্ধার করতে চেয়েছিলেন। তাই ভগবৎ-বাণীর প্রচারককে অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে শাস্ত্রের নির্দেশগুলি মেনে চলতে হবে, আবার সেই সঙ্গে পূর্ণ উদ্যমে অধঃপতিত জীবদের উদ্ধার করার জন্য উপায় উদ্ভাবন করতে হবে।

শ্লোক ৩৯

তবে নিজ ভক্ত কৈল যত ম্লেচ্ছ আদি ।
সবে এড়াইল মাত্র কাশীর মায়াবাদী ॥ ৩৯ ॥

শ্লোকার্থ

সকলেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্তে পরিণত হলেন, এমন কি ম্লেচ্ছ এবং যবনেরাও। কেবল শঙ্করাচার্যের অনুগামী মায়াবাদীরা তাঁকে এড়িয়ে গেল।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যদিও মুসলমান এবং অন্যান্য ম্লেচ্ছদের কৃষ্ণভক্তে পরিণত করলেন, তবুও শঙ্করাচার্যের অনুগামী মায়াবাদীদের মতি ফেরান গেল না। সন্ন্যাস গ্রহণ করার পর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, সকাম কর্মে আসক্ত কর্মনিষ্ঠদের, সার্বভৌম ভট্টাচার্য প্রমুখ বহু তার্কিকদের, প্রকাশানন্দ সরস্বতী প্রমুখ নিন্দুকদের, জগাই-মাধাই প্রমুখ পাষণ্ডীদের এবং মুকুন্দ আদি অধম পড়ুয়াদের চিত্তবৃত্তির পরিবর্তন সাধন করেছিলেন। তাঁরা সকলেই ধীরে ধীরে কৃষ্ণভক্তে পরিণত হয়েছিলেন, এমন কি পাঠান অথবা মুসলমানেরাও। কিন্তু সব চাইতে বড় অপরাধী মায়াবাদীদের পরিবর্তন করা সব চাইতে দুষ্কর হল, কারণ তারা খুব সতর্কতার সঙ্গে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পন্থা এড়িয়ে গেল।

কাশীর মায়াবাদীদের বর্ণনা করে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন যে, যারা ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের দ্বারা বিমূঢ়, এবং যারা সীমিত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে জগৎ দর্শন করে, তা জড় ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের দ্বারা মাপা যায়, এইরূপ অনুমান করে বলে যে, এই জগৎটি 'মায়ারচিত', তারাই হচ্ছে কাশীর মায়াবাদী। তাদের সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, যা কিছুই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায়, তাই হচ্ছে মায়া। তাদের মতে, পরমতত্ত্ব ইন্দ্রিয়-অনুভূতির অতীত হলেও তার কোন চিৎ-বৈচিত্র্য নেই, অথবা

আনন্দ উপভোগ করার ক্ষমতা নেই। কাশীর মায়াবাদীদের মতে চিৎ-জগৎ নির্বিশেষ, নিরাকার এবং সব রকম বৈচিত্র্যহীন। তারা পরমতত্ত্বের সবিশেষত্বে বিশ্বাস করে না, অথবা চিৎ-জগতে তার চিৎ-বৈচিত্র্য সমন্বিত কার্যকলাপে বিশ্বাস করে না। যদিও তাদের নিজেদের যুক্তি রয়েছে, তবে সেগুলি খুব একটা দৃঢ় নয়, তাই পরমতত্ত্বের বৈচিত্র্যময় লীলা-বিলাসের কোন ধারণাই তাদের নেই। শঙ্করাচার্যের অনুগামী এই সমস্ত নির্বিশেষবাদীদের বলা হয় 'মায়াবাদী'।

আর এক রকমের মায়াবাদী হচ্ছে, কাশীর নিকটবর্তী সারনাথের মায়াবাদীরা। কাশী নগরীর ঠিক বাইরেই 'সারনাথ' বলে একটি স্থান রয়েছে, যেখানে এক বিশাল বৌদ্ধস্তূপ রয়েছে। বুদ্ধদেবের অনুগামী বহু দার্শনিক এখানে থাকে, এবং তারা সারনাথের মায়াবাদী নামে পরিচিত। সারনাথের মায়াবাদীদের সঙ্গে কাশীর মায়াবাদীদের পার্থক্য হচ্ছে, কাশীর মায়াবাদীরা প্রচার করে যে, ব্রহ্মই হচ্ছে সত্য আর জড় বৈচিত্র্য হচ্ছে মিথ্যা। কিন্তু সারনাথের মায়াবাদীরা মায়ার বিপরীত পরমতত্ত্ব বা ব্রহ্মকে স্বীকার করে না। তাদের মতে জড়বাদই হচ্ছে পরম সত্যের একমাত্র প্রকাশ।

প্রকৃতপক্ষে কাশীর মায়াবাদী এবং সারনাথের মায়াবাদী, এবং আত্মজ্ঞান রহিত অন্য সমস্ত দার্শনিকেরা সকলেই জড়বাদের প্রচারক। তাদের কারও পরমতত্ত্ব অথবা চিৎ-জগৎ সম্বন্ধে কোন ধারণাই নেই। সারনাথের মায়াবাদীরা যারা পরমতত্ত্বের চিন্ময় অস্তিত্ব স্বীকার করে না, পক্ষান্তরে মনে করে যে, জড় বৈচিত্র্যই হচ্ছে সব কিছু, তারা *ভগবদ্গীতায়* বর্ণিত অপরা এবং পরা (চিন্ময়), এই দুই রকমের প্রকৃতি রয়েছে বলেও বিশ্বাস করে না। প্রকৃতপক্ষে, কাশীর মায়াবাদী এবং সারনাথের মায়াবাদী, উভয়ই যথার্থ জ্ঞানের অভাবে *ভগবদ্গীতার* তত্ত্ব স্বীকার করে না।

যেহেতু এই সমস্ত মায়াবাদীদের যথার্থ পারমার্থিক জ্ঞান নেই, তাই তারা ভক্তিযোগের তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। অতএব তারা হচ্ছে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের বিরোধী এবং অভক্ত। কখনও কখনও এই সমস্ত নির্বিশেষবাদীদের বিরোধিতায় আমাদের নানা রকম অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়, তবে তা নিয়ে আমরা মাথা ঘামাই না। তাদের তথাকথিত দর্শনে আমাদের কোন রকম উৎসাহ নেই, কারণ আমাদের নিজেদের দর্শন যা *ভগবদ্গীতায়* প্রকাশিত হয়েছে, তাই আমরা প্রচার করছি এবং আমাদের এই প্রচার প্রবলভাবে সফল হয়েছে। ভগবদ্ভক্তিকে তাদের জল্পনা-কল্পনার বিষয় করে, উভয় শ্রেণীর মায়াবাদীরাই সিদ্ধান্ত করছে যে, ভক্তিযোগের চরম লক্ষ্যটি মায়ারই সৃষ্টি এবং শ্রীকৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি এবং

ভক্ত, সবই মায়া। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, 'মায়াবাদী কৃষ্ণে অপরাধী' (*চৈঃ চঃ মধ্য* ১৭/১২৯)। তাদের পক্ষে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নয়। তাই তাদের দার্শনিক সিদ্ধান্তের মূল্য আমরা দিই না। তর্কপরায়ণ নির্বিশেষবাদী সমস্ত ভগবদ্বিমুখ মানুষেরা যত দক্ষতার সঙ্গে তাদের তথাকথিত যুক্তির অবতারণা করুক না কেন, আমরা সর্বতোভাবে তাদের পরাস্ত করে আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রচার করে চলি। তাদের মনোধর্মপ্রসূত জল্পনা-কল্পনা কখনই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রগতি ব্যাহত করতে পারবে না, যা হচ্ছে সম্পূর্ণরূপে চিন্ময় এবং কখনই এই ধরনের মায়াবাদীদের আয়ত্তাধীন নয়।

শ্লোক ৪০

বৃন্দাবন যাইতে প্রভু রহিলা কাশীতে।
মায়াবাদিগণ তাঁরে লাগিল নিন্দিতে ॥ ৪০ ॥

শ্লোকার্থ

বৃন্দাবন যাওয়ার পথে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন কাশীতে ছিলেন, তখন মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা নানাভাবে তাঁর নিন্দা করতে লাগল।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন পূর্ণ উদ্যমে কৃষ্ণভক্তির প্রচার করছিলেন, তখন তাঁকে বহু মায়াবাদী দার্শনিকের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তেমনই আমাদেরও বিরোধী স্বামী, যোগী, নির্বিশেষবাদী, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক এবং অন্যান্য সমস্ত মনোধর্মীদের সম্মুখীন হতে হচ্ছে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় আমরা অনায়াসে সকলকে পরাস্ত করি।

শ্লোক ৪১

সন্ন্যাসী হইয়া করে গায়ন, নাচন।
না করে বেদান্ত-পাঠ, করে সংকীর্তন ॥ ৪১ ॥

শ্লোকার্থ

"সন্ন্যাসী হওয়া সত্ত্বেও তার বেদান্ত-পাঠে কোন উৎসাহ নেই, পক্ষান্তরে সে সংকীর্তনে নিরন্তর নাচে এবং গান করে।

তাৎপর্য

সৌভাগ্যবশত অথবা দুর্ভাগ্যবশত, এই ধরনের মায়াবাদীদের সাথে আমাদেরও সাক্ষাৎ হয় এবং তারা আমাদের কীর্তনের পন্থাকে সমালোচনা করে এবং শাস্ত্রপাঠে আগ্রহ না থাকার দরুন আমাদের দোষারোপ করে। তারা জানে না যে, আমরা বহু গ্রন্থ ইংরেজিতে অনুবাদ করেছি এবং আমাদের মন্দিরের ভক্তরা নিয়মিতভাবে সকালে, দুপুরে এবং সন্ধ্যায় সেইগুলি পাঠ করে। আমরা গ্রন্থ লিখছি এবং সেইগুলি ছাপাচ্ছি, আর আমাদের শিষ্যরা সেইগুলি পড়ছে এবং সারা পৃথিবী জুড়ে সেইগুলি বিতরণ করছে। কোন মায়াবাদী সংস্থারই আমাদের মতো এতগুলি বই নেই; কিন্তু তা সত্ত্বেও, পড়াশুনার প্রতি অনুরক্ত নয় বলে তারা আমাদের সমালোচনা করে। এই ধরনের সমালোচনা সম্পূর্ণ অর্থহীন। কিন্তু আমরা যথার্থই পড়ি, তাই আমরা মায়াবাদীদের অর্থহীন প্রলাপ পড়ি না।

মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা নৃত্য করে না অথবা কীর্তন করে না। তাদের মতে এই নৃত্য-কীর্তন হচ্ছে *তৌর্যত্রিক* এবং সন্ন্যাসীর কর্তব্য হচ্ছে, এই ধরনের কার্যকলাপ সম্পূর্ণভাবে বর্জন করে বেদান্ত-পাঠে তার সময় অতিবাহিত করা। প্রকৃতপক্ষে তারা জানে না বেদান্ত বলতে কি বোঝায়। *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে, *বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্*—"সমস্ত বেদে একমাত্র আমিই হচ্ছি জ্ঞাতব্য; আমিই হচ্ছি বেদান্তের প্রণেতা এবং বেদবেত্তা" (*ভগবদ্গীতা* ১৫/১৫)। শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন বেদান্তের প্রকৃত প্রণেতা, এবং তিনি যা বলেছেন তাই বেদান্ত দর্শন। যদিও পরমেশ্বর ভগবান *শ্রীমদ্ভাগবত* রূপে যে অপ্রাকৃত বেদান্ত দান করে গিয়েছেন, সেই সম্বন্ধে মায়াবাদীদের কোন জ্ঞান নেই, তবুও তারা তাদের অধ্যয়নের গর্বে অত্যন্ত গর্বিত। বেদান্ত দর্শনকে যে এই সমস্ত মায়াবাদীরা কিভাবে বিকৃত করবে তা বুঝতে পেরে, শ্রীল ব্যাসদেব *বেদান্ত-সূত্রের* ভাষ্যরূপে *শ্রীমদ্ভাগবত* রচনা করেছেন। *শ্রীমদ্ভাগবত* হচ্ছে *ভাষ্যং ব্রহ্মসূত্রাণাম্*; অর্থাৎ, *ব্রহ্মসূত্র* রূপে বেদান্ত দর্শন *শ্রীমদ্ভাগবতের* পাতায় বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। তাই বেদান্ত দর্শনের প্রকৃত পাঠক হচ্ছেন সেই কৃষ্ণভক্ত, যিনি সর্বদা *ভগবদ্গীতা* এবং *শ্রীমদ্ভাগবত* পাঠ করে তার তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করেন এবং এই সমস্ত গ্রন্থের তাৎপর্য সমস্ত জগৎ জুড়ে শিক্ষা দেন। বেদান্ত দর্শনের উপর একাধিপত্য বিস্তার করেছে বলে মায়াবাদীরা খুব গর্ব করে, কিন্তু ভগবদ্ভক্তের জন্য বেদান্ত-ভাষ্য হচ্ছে *শ্রীমদ্ভাগবত* এবং অন্যান্য আচার্যদের প্রণীত ভাষ্য। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাষ্য হচ্ছে *গোবিন্দ-ভাষ্য*।

মায়াবাদীরা যে অভিযোগ করে ভক্তরা বেদান্ত অধ্যয়ন করেন না, তা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। তারা জানে না যে, নৃত্য-কীর্তন এবং *শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রচার হচ্ছে ভগবৎ-ধর্ম এবং তা বেদান্ত অধ্যয়ন থেকে অভিন্ন। যেহেতু তারা মনে করে যে, বেদান্ত দর্শন অধ্যয়নই হচ্ছে সন্ন্যাসীদের একমাত্র কাজ, সেই হেতু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তা করছেন না দেখে তারা তাঁর সমালোচনা করে। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য বেদান্ত দর্শন অধ্যয়নের ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, *বেদান্তবাক্যেষু সদা রমন্তঃ কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ*—"ত্যাগের আশ্রম গ্রহণ করেছেন যে সন্ন্যাসী, যিনি কেবল কৌপীন ছাড়া আর কিছুই পরিধান করেন না, তাঁর কর্তব্য হচ্ছে নিরন্তর *বেদান্ত-সূত্র* অধ্যয়ন করা। সন্ন্যাস ধর্মাবলম্বী এই ধরনের মানুষ অত্যন্ত ভাগ্যবান।" বারাণসীর মায়াবাদীরা এই পন্থা অবলম্বন না করার জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নিন্দা করেছিল। কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের উপর তাঁর করুণা বর্ষণ করেছিলেন এবং প্রকাশানন্দ সরস্বতী ও সার্বভৌম ভট্টাচার্যের সঙ্গে বেদান্ত দর্শনের আলোচনার মাধ্যমে তিনি তাদের উদ্ধার করেছিলেন।

শ্লোক ৪২

মূর্খ সন্ন্যাসী নিজ-ধর্ম নাহি জানে।
ভাবুক হইয়া ফেরে ভাবুকের সনে ॥ ৪২ ॥

শ্লোকার্থ

"এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হচ্ছে একটি মূর্খ সন্ন্যাসী এবং সে জানে না তার প্রকৃত ধর্ম কি? ভাবের আবেগের দ্বারা পরিচালিত হয়ে সে ভাবুকদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়।"

তাৎপর্য

মূর্খ মায়াবাদীরা জানে না যে, কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন অপ্রাকৃত বিজ্ঞানের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাই তারা মনে করে যে, যারা নাচে এবং কীর্তন করে তাদের কোন দার্শনিক জ্ঞান নেই। প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণভক্তদের বেদান্ত দর্শন সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান রয়েছে, কারণ তারা বেদান্ত দর্শনের প্রকৃত ভাষ্য *শ্রীমদ্ভাগবত* অধ্যয়ন করেন এবং *ভগবদ্গীতায়* প্রদত্ত ভগবানের শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী অনুসরণ করেন। ভগবৎ-দর্শন বা ভগবৎ-ধর্ম হৃদয়ঙ্গম করার ফলে তাঁরা পূর্ণরূপে ভগবৎ-চেতনা বা কৃষ্ণভাবনা লাভ করেন, এবং তার ফলে তাঁদের নৃত্য-কীর্তন জড় স্তরে সম্পাদিত হয় না, তা অনুষ্ঠিত হয় চিন্ময় স্তরে। যদিও সকলেই ভক্তদের আনন্দোচ্ছল নৃত্য-

কীর্তনের স্বতঃস্ফূর্ত প্রশংসা করে এবং তার ফলে কৃষ্ণভক্তরা সর্বত্রই 'হরেকৃষ্ণ-ভক্ত' নামে পরিচিত হয়েছে, তবুও মায়াবাদীরা যথার্থ জ্ঞানের অভাবে, ভক্তদের এই সমস্ত কার্যকলাপ সহ্য করতে পারে না।

শ্লোক ৪৩

এ সব শুনিয়া প্রভু হাসে মনে মনে।
উপেক্ষা করিয়া কারো না কৈল সম্ভাষণে ॥ ৪৩ ॥

শ্লোকার্থ

এই সমস্ত নিন্দাবাদ শুনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মনে মনে হাসলেন, আর এই সমস্ত অপবাদ তিনি অগ্রাহ্য করলেন এবং মায়াবাদীদের সঙ্গে কোন কথা বললেন না।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভক্তরূপে আমরা মায়াবাদীদের সঙ্গে কথা বলে সময় নষ্ট করি না, তবে সুযোগ পেলেই আমরা বেশ প্রবলভাবে এবং সাফল্যের সঙ্গেই আমাদের দর্শনের আলোকে তাদের ভ্রান্তি দেখিয়ে দিই।

শ্লোক ৪৪

উপেক্ষা করিয়া কৈল মথুরা গমন।
মথুরা দেখিয়া পুনঃ কৈল আগমন ॥ ৪৪ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে কাশীর নিন্দুক মায়াবাদীদের উপেক্ষা করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মথুরায় গমন করলেন, এবং মথুরা দর্শন করে পুনরায় তিনি কাশীতে ফিরে এলেন।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন প্রথম কাশীতে গিয়েছিলেন, তখন তিনি মায়াবাদীদের সঙ্গে কথা বলেননি, কিন্তু বেদান্তের যথার্থ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাদের বোঝাবার জন্য তিনি মথুরা থেকে পুনরায় সেখানে ফিরে এলেন।

শ্লোক ৪৫

কাশীতে লেখক শূদ্র-শ্রীচন্দ্রশেখর ।
তাঁর ঘরে রহিলা প্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর ॥ ৪৫ ॥

শ্লোকার্থ

এই সময় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীচন্দ্রশেখরের বাড়িতে অবস্থান করেছিলেন। চন্দ্রশেখর যদিও ছিলেন শূদ্র বা কায়স্থ, কিন্তু সেই বিচার না করেই পরমেশ্বর ভগবান তাঁর গৃহে রইলেন, কারণ তিনি হচ্ছেন সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন ঈশ্বর।

তাৎপর্য

সন্ন্যাসীর যদিও শূদ্রের গৃহে বাস করা উচিত নয়, তবুও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু চন্দ্রশেখর নামক একজন কেরানির বাড়িতে ছিলেন। পাঁচশ বছর আগে, বিশেষ করে বঙ্গদেশে প্রচলিত প্রথা ছিল যে, ব্রাহ্মণকুলে জন্ম হলেই কেবল ব্রাহ্মণ হওয়া যায়, এবং অন্যান্য কুলে জন্ম হলে—এমন কি ক্ষত্রিয়, বৈশ্য আদি উচ্চতর কুলে জন্ম হলেও তাদের শূদ্র বলে মনে করা হত। শ্রীচন্দ্রশেখর যদিও ছিলেন উত্তর ভারতের কায়স্থ বংশোদ্ভূত কেরানি, তবুও তাঁকে শূদ্র বলে বিবেচনা করা হয়েছিল। তেমনই, বৈশ্যরা, বিশেষ করে সুবর্ণ-বণিক সম্প্রদায়কে বঙ্গদেশে শূদ্র বলে গণনা করা হয়, এমন কি বৈদ্যদেরও, যারা হচ্ছে সাধারণত চিকিৎসক, তাদেরও শূদ্র বলে গণনা করা হয়। কতকগুলি স্বার্থান্বেষী তথাকথিত ব্রাহ্মণদের প্রবর্তিত এই কৃত্রিম জাতিভেদ প্রথা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বীকার করেননি। পরবর্তীকালে সেই তথাকথিত ব্রাহ্মণদের বিরোধিতা সত্ত্বেও কায়স্থ, বৈশ্য এবং বণিকেরা যজ্ঞোপবীত ধারণ করতে শুরু করে।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বে, বাংলার রাজা বল্লাল সেন তাঁর ব্যক্তিগত রোষের বশে সুবর্ণ-বণিক সম্প্রদায়কে জাতিচ্যুত করেন। সুবর্ণ-বণিক সম্প্রদায় অত্যন্ত ধনী, কারণ সাধারণত তারা সুদে টাকা খাটায় এবং সোনা-রূপার ব্যবসা করে। তাই বল্লাল সেন সুবর্ণ-বণিকদের কাছ থেকে টাকা ধার করতেন কিন্তু পরবর্তীকালে বল্লাল সেন দেউলিয়া হয়ে যাওয়ায়, সুবর্ণ-বণিক মহাজনেরা তাঁকে টাকা ধার দেওয়া বন্ধ করে দেয়, এবং তার ফলে ক্রুদ্ধ হয়ে বল্লাল সেন সুবর্ণ-বণিক সম্প্রদায়কে শূদ্র বলে ঘোষণা করেন। বল্লাল সেন ব্রাহ্মণদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছিলেন, যাতে তাঁরা সুবর্ণ-বণিকদের বৈদিক আচার অনুষ্ঠানের অনুগামী বলে স্বীকার না করেন। যদিও কিছু ব্রাহ্মণ বল্লাল সেনের এই আচরণ

মেনে নিয়েছিলেন, কিন্তু অনেক ব্রাহ্মণ তা বরদাস্ত করেননি। তার ফলে ব্রাহ্মণদের মধ্যেও বিরোধের সৃষ্টি হয়েছিল, এবং যাঁরা সুবর্ণ-বণিকদের সমর্থন করেছিলেন, তাঁদের ব্রাহ্মণ-সমাজ থেকে জাতিচ্যুত করা হয়। এখনও এই প্রথার অনুসরণ করা হচ্ছে।

বঙ্গদেশে বহু বৈষ্ণব পরিবার রয়েছেন, যাঁরা ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ না করলেও, বৈষ্ণবতন্ত্র অনুসারে যজ্ঞোপবীত প্রদানপূর্বক দীক্ষাদান করে আচার্যের কার্য করেন। শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যের বংশসমূহের বৈষ্ণব বিশ্বাস অনুসারে ঠাকুর রঘুনন্দন, আচার্য ঠাকুর কৃষ্ণদাস, নবনী হোড় এবং শ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য শ্রীরসিকানন্দ দেবের বংশ ব্রাহ্মণের আদর্শ উপনয়ন সংস্কার আজ তিনি-চারশ বছর ধরে চলে আসছে। তাঁরা আজও ব্রাহ্মণ আদি সকল বর্ণের দীক্ষাগুরুর কার্য করে আসছেন এবং শালগ্রাম আদির অর্চনা করে আসছেন। এখনও আমরা আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের মন্দিরগুলিতে শালগ্রাম শিলা অর্চন প্রবর্তন করিনি, কিন্তু অচিরেই আমাদের সমগ্র মন্দিরে অর্চন মার্গ অনুসারে শালগ্রাম শিলার অর্চন শুরু হবে।

শ্লোক ৪৬

তপন-মিশ্রের ঘরে ভিক্ষা-নির্বাহণ ।
সন্ন্যাসীর সঙ্গে নাহি মানে নিমন্ত্রণ ॥ ৪৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তপন মিশ্রের ঘরে প্রসাদ পেতেন। তিনি অন্য সন্ন্যাসীদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন না এবং তাদের নিমন্ত্রণও গ্রহণ করতেন না।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই আদর্শ আচরণ যথাযথভাবে প্রমাণ করে যে, বৈষ্ণব সন্ন্যাসীরা মায়াবাদী সন্ন্যাসীর নিমন্ত্রণ স্বীকার করতে পারেন না, এবং তাঁদের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মেলামেশাও করতে পারেন না।

শ্লোক ৪৭

সনাতন গোসাঞি আসি' তাঁহাই মিলিলা ।
তাঁর শিক্ষা লাগি' প্রভু দু-মাস রহিলা ॥ ৪৭ ॥

শ্লোকার্থ

সনাতন গোস্বামী যখন বঙ্গদেশ থেকে এলেন, তখন তপন মিশ্রের গৃহে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎকার হয়। ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে সনাতন গোস্বামীকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেখানে দুই মাস অবস্থান করেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীগুরু-শিষ্যের পরম্পরার ধারায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে শিক্ষাদান করেছিলেন। সনাতন গোস্বামী ছিলেন সংস্কৃত এবং অন্যান্য ভাষায় বিদগ্ধ পণ্ডিত, কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে শিক্ষা না পাওয়া পর্যন্ত বৈষ্ণব আচার সম্বন্ধে তিনি কিছুই লেখেননি। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উপদেশ অনুসারে তিনি বৈষ্ণব মার্গের পথপ্রদর্শক তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *হরিভক্তিবিলাস* রচনা করেছিলেন। এই *হরিভক্তিবিলাস* গ্রন্থে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, যথার্থ সদ্‌গুরুর কাছে দীক্ষাপ্রাপ্ত হওয়ার ফলে তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণত্ব লাভ হয়। এই সম্পর্কে তিনি বলেছেন—

যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ ।
তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্ ॥

"যথাযথ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পারদের মিশ্রণে কাঁসা যেমন সোনায় পরিণত হয়, তেমনই যথার্থ সদ্‌গুরুর কাছে দীক্ষিত হয়ে উপযুক্ত শিক্ষার প্রভাবে মানুষ দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হয়।" জাতি ব্রাহ্মণেরা কখনও কখনও এর প্রতিবাদ করে, কিন্তু এর বিরুদ্ধে তাদের কোন উপযুক্ত যুক্তি নেই। শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর ভক্তের কৃপায় মানুষের জীবন সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত হতে পারে। *শ্রীমদ্ভাগবতে জহাতি বন্ধম্* এবং *শুদ্ধন্তি* এই দুটি শব্দের দ্বারা এই তত্ত্ব প্রতিপন্ন করা হয়েছে। *জহাতি বন্ধম্* এর অর্থ হচ্ছে জীব কোন বিশেষ শরীরে আবদ্ধ। এই দেহ অবশ্যই একটি প্রতিবন্ধক, কিন্তু শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ প্রভাবে এবং তাঁর নির্দেশ অনুসরণ করার ফলে এই প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করা যায় এবং কঠোর নিয়মানুবর্তিতার মাধ্যমে দীক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করা যায়। শ্রীল জীব গোস্বামী উল্লেখ করেছেন, কিভাবে শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ প্রভাবে অব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণে পরিণত হতে পারেন। *প্রভবিষ্ণবে নমঃ* —শ্রীবিষ্ণু এতই শক্তিশালী যে, তিনি তাঁর ইচ্ছা অনুসারে যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। তাই বিষ্ণুর পক্ষে সদ্‌গুরুর সুদক্ষ পরিচালনায় পরিচালিত ভক্তের দেহকে অনায়াসেই পরিবর্তন করা সম্ভব।

শ্লোক ৪৮

তাঁরে শিখাইলা সব বৈষ্ণবের ধর্ম ।
ভাগবত-আদি শাস্ত্রের যত গূঢ় মর্ম ॥ ৪৮ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীমদ্ভাগবত আদি শাস্ত্রের গূঢ় মর্ম প্রকাশ করে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে বৈষ্ণবের ধর্ম সম্বন্ধে শিক্ষাদান করলেন।

তাৎপর্য

পরম্পরার ধারায় সদ্‌গুরুর শিক্ষা অবশ্যই বৈদিক শাস্ত্রের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। গুরু-পরম্পরার ধারায় নিজের মনগড়া আচার অনুষ্ঠান তৈরি করা যায় না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগামী বহু তথাকথিত বৈষ্ণব সম্প্রদায় রয়েছে, যেগুলি যথাযথভাবে শাস্ত্রসিদ্ধান্ত অনুসরণ করে না, তাই তাদের বলা হয় 'অপসম্প্রদায়', যার অর্থ হচ্ছে 'সম্প্রদায় বহির্ভূত'। তাদের কয়েকটি গোষ্ঠী হচ্ছে—আউল, বাউল, কর্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সাঁই, সহজিয়া, সখীভেকী, স্মার্ত, জাত-গোসাঞি, অতিবাড়ী, চূড়াধারী এবং গৌরাঙ্গ-নাগরী। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পরম্পরায় নিষ্ঠাভরে অনুগমন করতে হলে, এই সমস্ত অপসম্প্রদায়ের সঙ্গ করা উচিত নয়।

সদ্‌গুরুর তত্ত্বাবধানে শিক্ষালাভ না করলে, বৈদিক শাস্ত্রতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। সেই কথা বোঝাবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে শিক্ষাদান করার সময় এই বিষয়ে খুব জোর দিয়েছেন, এবং তিনি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, অর্জুন যেহেতু তাঁর ভক্ত এবং সখা ছিলেন, তাই তিনি *ভগবদ্গীতার* রহস্য হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন। তাই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, কেউ যদি শাস্ত্রের গূঢ় রহস্য সম্বন্ধে অবগত হতে চান, তা হলে অবশ্যই তাঁকে সদ্‌গুরুর শরণাগত হতে হবে, শ্রদ্ধাবনত চিত্তে তাঁর শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী শ্রবণ করতে হবে, এবং সেবার দ্বারা তাঁকে সন্তুষ্ট করতে হবে। তা হলেই কেবল শাস্ত্রজ্ঞান তাঁর হৃদয়ে প্রকাশিত হবে। বেদে উল্লেখ করা হয়েছে—

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥

"পরমেশ্বর ভগবান এবং গুরুদেবের প্রতি যার অবিচলিত নিষ্ঠা রয়েছে, তার কাছে শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব প্রকাশিত হয়।" শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর উপদেশ দিয়েছেন,

'সাধু-শাস্ত্র-গুরুবাক্য, হৃদয়ে করিয়া ঐক্য' অর্থাৎ পারমার্থিক জীবনের যথার্থ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত হতে হলে সাধু, শাস্ত্র এবং গুরু, এই তিনের বাক্য যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। 'সাধু' (মহাত্মা বা বৈষ্ণব) অথবা 'গুরু' কখনই শাস্ত্র-বহির্ভূত কোন কিছু বলেন না। এইভাবে 'সাধু' এবং 'গুরু' যা বলেন, তা কখনও শাস্ত্রের বাণী থেকে ভিন্ন নয়। তাই এই তিনের নির্দেশ অনুসারে আচরণ করা অবশ্য কর্তব্য।

শ্লোক ৪৯

ইতিমধ্যে চন্দ্রশেখর, মিশ্র-তপন ।
দুঃখী হঞা প্রভু-পায় কৈল নিবেদন ॥ ৪৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন সনাতন গোস্বামীকে শিক্ষাদান করছিলেন, তখন অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে চন্দ্রশেখর এবং তপন মিশ্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে একটি নিবেদন করলেন।

শ্লোক ৫০

কতেক শুনিব প্রভু তোমার নিন্দন ।
না পারি সহিতে, এবে ছাড়িব জীবন ॥ ৫০ ॥

শ্লোকার্থ

"প্রভু, তোমার বিরুদ্ধে আর কত নিন্দাবাদ এবং সমালোচনা সহ্য করব? এই সমস্ত নিন্দাবাদ যাতে আর আমাদের শুনতে না হয়, সেই জন্য আমরা জীবন ত্যাগ করব বলে ঠিক করেছি।"

তাৎপর্য

বৈষ্ণব আচরণ সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ একটি নির্দেশ হচ্ছে তরুর মতো সহিষ্ণু হওয়া এবং তৃণের থেকেও সুনীচ হওয়া।

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা ।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥

"পথে পড়ে থাকা তৃণের থেকেও সুনীচ হয়ে বা তরুর থেকেও সহিষ্ণু হয়ে, নিজের জন্য কোন রকম মানসম্মানের প্রত্যাশা না করে এবং অন্য সকলকে সমস্ত মান দান করে, নিরন্তর ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করা উচিত।" কিন্তু তবুও এই উপদেশ প্রদানকারী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দুষ্কৃতকারী জগাই এবং মাধাইয়ের অপকর্ম বরদাস্ত করেননি। তারা যখন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে আঘাত করে, তখন তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে তাদের সংহার করতে উদ্যত হন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপার ফলেই কেবল তারা রক্ষা পায়। বৈষ্ণব অত্যন্ত সহনশীল এবং তিনি ক্রুদ্ধ হন না, কিন্তু কেউ যদি গুরুদেবকে অপমান করে বা অন্য কোন বৈষ্ণবকে অপমান করে, তা হলে তার ক্রোধ আগুনের মতো উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং তা প্রদর্শন করে গিয়েছেন। বৈষ্ণবনিন্দা কখনও সহ্য করা উচিত নয়। কেউ যদি বৈষ্ণবনিন্দা করে, তা হলে যুক্তিতর্কের দ্বারা তাকে স্তব্ধ করা উচিত। তা করতে না পারলে সেখানেই প্রাণত্যাগ করা উচিত, এবং তাও করতে না পারলে সেখান থেকে চলে যাওয়া উচিত। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন কাশীতে ছিলেন, তখন নানাভাবে মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা তাঁর নিন্দা করছিল, কারণ তিনি সন্ন্যাসী হওয়া সত্ত্বেও নৃত্য-কীর্তন করছিলেন। তপন মিশ্র এবং চন্দ্রশেখর সেই সমালোচনা শুনেছিলেন। তাঁরা ছিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মহান ভক্ত, তাই তাঁদের পক্ষে তা সহ্য করা অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। তাঁরা মায়াবাদীদের স্তব্ধ করতে পারছিলেন না, তাই তাঁরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে আবেদন করেছিলেন যে, যেহেতু তাঁরা সেই অসহ্য নিন্দা আর সহ্য করতে পারছিলেন না, সেই হেতু তাঁরা জীবন ত্যাগ করবেন বলে মনস্থ করেছেন।

শ্লোক ৫১

তোমারে নিন্দয়ে যত সন্ন্যাসীর গণ ।
শুনিতে না পারি, ফাটে হৃদয়-শ্রবণ ॥ ৫১ ॥

শ্লোকার্থ

"মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা তোমার নিন্দা করছে। সেই নিন্দা আমরা সহ্য করতে পারছি না। তার ফলে আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে।"

তাৎপর্য

এটিই হল শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রতি প্রকৃত প্রেমের প্রকাশ। তিন শ্রেণীর বৈষ্ণব রয়েছেন—কনিষ্ঠ অধিকারী, মধ্যম অধিকারী এবং উত্তম অধিকারী।

কনিষ্ঠ অধিকারী বা সর্বনিম্ন স্তরের বৈষ্ণব হচ্ছেন তিনি, যাঁর ভগবানের প্রতি দৃঢ় শ্রদ্ধা রয়েছে কিন্তু শাস্ত্রসিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তিনি ততটা পারদর্শী নন। মধ্যম অধিকারী শাস্ত্রসিদ্ধান্ত সম্বন্ধে পূর্ণরূপে অবগত এবং গুরু ও কৃষ্ণের প্রতি তাঁর রতি ভক্তি অবিচলিত। তিনি তাই, ভগবৎ-বিদ্বেষীদের উপেক্ষা করে অল্পবুদ্ধিদের মধ্যে প্রচার করেন। আর সর্বোচ্চ স্তরের ভক্ত কাউকে অবৈষ্ণব দর্শন করেন না। তাঁর দৃষ্টিতে কেবল তিনি নিজে ছাড়া আর সকলেই বৈষ্ণব। এটিই হচ্ছে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর *তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা* শ্লোকের সারমর্ম। তবে উত্তম অধিকারী ভক্তকে প্রচার করার জন্য মধ্যম অধিকারীর স্তরে নেমে আসতে হয়, তবে প্রচারকের কখনও বৈষ্ণবনিন্দা সহ্য করা উচিত নয়। কনিষ্ঠ অধিকারী ও বৈষ্ণবনিন্দা সহ্য করতে পারেন না, তবে শাস্ত্র-প্রমাণের মাধ্যমে নিন্দুকদের মুখ বন্ধ করার ক্ষমতা তাঁর নেই। তাই এখানে তপন মিশ্র ও চন্দ্রশেখর আচার্যকে কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্ত বলে মনে করা হয়েছে, কারণ তাঁরা কাশীর মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের যুক্তিতর্কের দ্বারা পরাস্ত করতে পারেননি। তাঁরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে আবেদন করেছিলেন উপযুক্ত ব্যবস্থা করার জন্য, কারণ তাঁরা সেই সমালোচনা সহ্য করতে পারছিলেন না অথচ তা বন্ধ করার ক্ষমতাও তাঁদের ছিল না।

শ্লোক ৫২

ইহা শুনি রহে প্রভু ঈষৎ হাসিয়া ।
সেই কালে এক বিপ্র মিলিল আসিয়া ॥ ৫২ ॥

শ্লোকার্থ

তপন মিশ্র ও চন্দ্রশেখর যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে সেই কথা বললেন, তখন মহাপ্রভু ঈষৎ হেসে চুপ করে রইলেন। সেই সময় এক ব্রাহ্মণ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য সেখানে এলেন।

তাৎপর্য

যেহেতু নিন্দুকেরা মহাপ্রভুর নিন্দা করছিল, তাই মহাপ্রভু তাতে দুঃখ অনুভব করেননি, বরং তিনি ঈষৎ হাস্য করেছিলেন। এটিই হচ্ছে আদর্শ বৈষ্ণব-আচরণ। নিজের সমালোচনা বা নিন্দা শুনে ক্রুদ্ধ হওয়া উচিত নয়, তবে যদি অন্য কোন বৈষ্ণবের নিন্দা করা হয়, তা হলে তা পূর্বোক্ত উপায়ে বন্ধ করার জন্য তৎক্ষণাৎ সচেষ্ট হতে হয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর শুদ্ধ ভক্ত তপন মিশ্র ও চন্দ্রশেখরের

প্রতি অত্যন্ত কৃপাময় ছিলেন; তাই, তাঁরই ইচ্ছার প্রভাবে সেই ব্রাহ্মণ তখন সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁর ভক্তদের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য সর্বশক্তিমান ভগবান সেই অবস্থার সৃষ্টি করেছিলেন।

শ্লোক ৫৩

আসি' নিবেদন করে চরণে ধরিয়া ।
এক বস্তু মাগোঁ, দেহ প্রসন্ন হইয়া ॥ ৫৩ ॥

শ্লোকার্থ

সেখানে এসে ব্রাহ্মণ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে পতিত হয়ে তাঁর কাছে প্রার্থনা করলেন, "আমি একটি বস্তু চাইতে এসেছি, আপনি প্রসন্ন হয়ে আমাকে তা দান করুন।"

তাৎপর্য

বৈদিক শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, *তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া*— "অত্যন্ত বিনীতভাবে মহাত্মার শরণাগত হতে হয়" (*ভগবদ্গীতা* ৪/৩৪)। তত্ত্বজ্ঞানী মহাপুরুষদের সঙ্গে উদ্ধতভাবে তর্ক করা উচিত নয়। পক্ষান্তরে অত্যন্ত বিনীতভাবে এবং ঐকান্তিক শ্রদ্ধা সহকারে প্রশ্ন করার মাধ্যমে তাঁদের শরণাগত হতে হয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন একজন আদর্শ শিক্ষক, এবং তিনি আচরণ করে সকল কিছু শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন। তাঁর অনুগামীরাও তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে, সেইভাবে আচরণ করে শিক্ষাদান করেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গ প্রভাবে পবিত্র হয়ে, এই ব্রাহ্মণও অত্যন্ত বিনীতভাবে তাঁর চরণে তাঁর প্রার্থনা নিবেদন করেছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে পতিত হয়ে তিনি বলেছিলেন—

শ্লোক ৫৪

সকল সন্ন্যাসী মুঞি কৈনু নিমন্ত্রণ ।
তুমি যদি আইস, পূর্ণ হয় মোর মন ॥ ৫৪ ॥

শ্লোকার্থ

"হে প্রভু, আমি বারাণসীর সমস্ত সন্ন্যাসীদের আমার গৃহে নিমন্ত্রণ করেছি। তুমি যদি আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে সেখানে আস, তা হলে আমার মনোবাসনা পূর্ণ হয়।

তাৎপর্য

এই ব্রাহ্মণটি জানতেন যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন তখন কাশীতে একমাত্র বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী, আর অন্য সকলেই ছিলেন মায়াবাদী। গৃহস্থদের কর্তব্য হচ্ছে কখনও কখনও সন্ন্যাসীদের গৃহে নিমন্ত্রণ করে ভোজন করানো। এই গৃহস্থ-ব্রাহ্মণ সকল সন্ন্যাসীদের তাঁর বাড়িতে নিমন্ত্রণ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি জানতেন যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে এই ধরনের নিমন্ত্রণ গ্রহণে স্বীকার করানো অত্যন্ত কঠিন হবে। কারণ, মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা সেখানে উপস্থিত থাকবেন। তাই তিনি তাঁর শ্রীচরণে পতিত হয়ে অত্যন্ত বিনীতভাবে আবেদন করেছিলেন যে, তিনি যেন করুণা করে তাঁর নিমন্ত্রণ রক্ষা করেন। এইভাবে অত্যন্ত বিনয় সহকারে তিনি তাঁর মনোবাসনা ব্যক্ত করেছিলেন।

শ্লোক ৫৫

না যাহ সন্ন্যাসি-গোষ্ঠী, ইহা আমি জানি ।
মোরে অনুগ্রহ কর নিমন্ত্রণ মানি' ॥ ৫৫ ॥

শ্লোকার্থ

"হে প্রভু ! আমি জানি যে, তুমি অন্যান্য সন্ন্যাসীদের সঙ্গ কর না, কিন্তু আমাকে অনুগ্রহ করে আমার এই নিমন্ত্রণ স্বীকার কর।"

তাৎপর্য

আচার্য অথবা বৈষ্ণব মহাজন অত্যন্ত কঠোরতার সঙ্গে তাঁর নীতি অনুসরণ করেন। কিন্তু যদিও তিনি বজ্রের মতো কঠোর, তবুও কখনও কখনও তিনি কুসুমের মতো কোমল। প্রকৃতপক্ষে তিনি স্বতন্ত্র। তিনি সমস্ত বিধি-নিষেধ অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন, কিন্তু কখনও কখনও তিনি তাঁর নীতি শিথিল করেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কখনও মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন না। কিন্তু তবুও তিনি সেই ব্রাহ্মণের অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন, যে কথা পরবর্তী শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ৫৬

প্রভু হাসি' নিমন্ত্রণ কৈল অঙ্গীকার ।
সন্ন্যাসীরে কৃপা লাগি' এ ভঙ্গী তাঁহার ॥ ৫৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হেসে সেই ব্রাহ্মণের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের কৃপা করবার জন্য তিনি এইভাবে আচরণ করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে কাশীর মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা নিন্দা করেছিল বলে, তপন মিশ্র এবং চন্দ্রশেখর শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণে তাঁদের মনঃকষ্ট ব্যক্ত করে আবেদন করেছিলেন। তা শুনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কেবল হেসেছিলেন, কিন্তু তবুও তিনি তাঁর ভক্তদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে চেয়েছিলেন। সেই ব্রাহ্মণ যখন অন্যান্য সন্ন্যাসীদের সঙ্গে তাঁর গৃহে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে তাঁকে অনুরোধ করতে এলেন, তখন সেই সুযোগ এল। এইভাবে অসমোর্ধ্ব ঐশ্বরিক ক্ষমতাবলেই এই সকল ঘটনা যুগপৎ সংঘটিত হয়েছিল।

শ্লোক ৫৭

সে বিপ্র জানেন প্রভু না যা'ন কা'র ঘরে ।
তাঁহার প্রেরণায় তাঁরে অত্যাগ্রহ করে ॥ ৫৭ ॥

শ্লোকার্থ

সেই ব্রাহ্মণ জানতেন যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কখনও অন্য কারও গৃহে যান না, তবুও মহাপ্রভুরই প্রেরণায় তিনি তাঁকে সেই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করার জন্য ঐকান্তিকভাবে অনুরোধ করতে থাকেন।

শ্লোক ৫৮

আর দিনে গেলা প্রভু সে বিপ্র-ভবনে ।
দেখিলেন, বসিয়াছেন সন্ন্যাসীর গণে ॥ ৫৮ ॥

শ্লোকার্থ

তার পরের দিন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন সেই ব্রাহ্মণের গৃহে গেলেন, তখন তিনি দেখলেন যে, কাশীর সমস্ত সন্ন্যাসীরা সেখানে বসে রয়েছেন।

শ্লোক ৫৯

সবা নমস্করি' গেলা পাদ-প্রক্ষালনে ।
পাদ প্রক্ষালন করি বসিলা সেই স্থানে ॥ ৫৯ ॥

শ্লোকার্থ

সন্ন্যাসীদের প্রণতি নিবেদন করে তিনি পাদ প্রক্ষালন করতে গেলেন, এবং পাদ প্রক্ষালন করার পর তিনি সেই স্থানেই উপবেশন করলেন।

তাৎপর্য

মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের প্রণতি নিবেদন করার মাধ্যমে সকলের প্রতি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিনয় অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে। বৈষ্ণব কখনও কারও প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন না। সুতরাং সন্ন্যাসীদের প্রতি যে তাঁরা অত্যন্ত শ্রদ্ধাপরায়ণ হবেন, সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন, *অমানিনা মানদেন*—"অন্য সকলকে তিনি সমস্ত সম্মান দান করেন, কিন্তু নিজে কখনও সম্মানের প্রত্যাশা করেন না।" সন্ন্যাসীর কর্তব্য হচ্ছে সর্বদা খালি পায়ে চলাফেরা করা, এবং তাই তিনি যখন মন্দিরে অথবা ভক্তগোষ্ঠীতে প্রবেশ করেন, তখন সবার আগে তাঁকে পাদ প্রক্ষালন করে উপযুক্ত আসন গ্রহণ করতে হয়। ভারতবর্ষে এখনও প্রচলিত রীতি রয়েছে যে, জুতো খুলে একটি কোন নির্দিষ্ট স্থানে তা রেখে, তারপর পা ধুয়ে খালি পায়ে মন্দিরে প্রবেশ করতে হয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন একজন আদর্শ আচার্য। যাঁরা তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেন, তাঁদের কর্তব্য হচ্ছে তিনি আমাদের যে শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন, তা অনুসরণ করে ভগবদ্ভক্তির পন্থা অনুশীলন করা।

শ্লোক ৬০

বসিয়া করিলা কিছু ঐশ্বর্য প্রকাশ ।
মহাতেজোময় বপু কোটিসূর্যাভাস ॥ ৬০ ॥

শ্লোকার্থ

মাটিতে বসে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর কিছু ঐশ্বর্য প্রকাশ করলেন, তখন মনে হল তাঁর মহাতেজোময় শরীর থেকে যেন কোটি সূর্যের মতো উজ্জ্বল জ্যোতি প্রকাশিত হল।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তাই তিনি সর্বশক্তিমান। তাঁর পক্ষে কোটি সূর্যের মতো উজ্জ্বল জ্যোতি প্রকাশ করা মোটেই অসম্ভব নয়। শ্রীকৃষ্ণের আর একটি নাম হচ্ছে 'যোগেশ্বর' অর্থাৎ যিনি সমস্ত যোগৈশ্বর্যের অধীশ্বর। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং; তাই তিনি যে কোন অলৌকিক শক্তি প্রদর্শন করতে পারেন।

শ্লোক ৬১

প্রভাবে আকর্ষিল সব সন্ন্যাসীর মন ।
উঠিল সন্ন্যাসী সব ছাড়িয়া আসন ॥ ৬১ ॥

শ্লোকার্থ

সন্ন্যাসীরা যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দেহের অপূর্ব জ্যোতি দর্শন করলেন, তখন তাঁদের চিত্ত তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হল, এবং তাঁরা তৎক্ষণাৎ সসম্ভ্রমে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

তাৎপর্য

কখনও কখনও সাধারণ মানুষকে আকৃষ্ট করার জন্য মহাপুরুষেরা এবং আচার্যরা তাঁদের অলৌকিক বৈভব প্রকাশ করেন। কেবল মূর্খদেরই এইভাবে আকর্ষণ করার প্রয়োজন হয়, কিন্তু যথার্থ সাধু কখনই নিজেদের ভগবান বলে প্রচারকারী ভণ্ড প্রতারকদের মতো নিজেদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য এই ধরনের ক্ষমতার অপব্যবহার করেন না। যাদুকরেরা পর্যন্ত অদ্ভুত সমস্ত খেলা দেখাতে পারে, যা সাধারণ মানুষকে বিস্ময়াভিভূত করে। তার অর্থ এই নয় যে, যাদুকরেরা হচ্ছে ভগবান। কিছু অলৌকিক শক্তি প্রদর্শন করে ভগবান বলে প্রচার করার চেষ্টা হচ্ছে সব চাইতে গর্হিত অপরাধ। প্রকৃতই যিনি মহাত্মা, তিনি কখনই নিজেকে ভগবান বলে জাহির করতে চান না, পক্ষান্তরে তিনি সর্বদাই নিজেকে ভগবানের সেবক বলে মনে করেন। ভগবানের যিনি দাস, তাঁর পক্ষে অলৌকিক শক্তি প্রদর্শন করার কোন প্রয়োজন নেই এবং তিনি তা করতে চানও না। পক্ষান্তরে, পরমেশ্বর ভগবানের নিত্যদাসরূপে তিনি ভগবানের হয়ে এমন সমস্ত অদ্ভুত কার্য সম্পাদন করেন, যা কোনও সাধারণ মানুষ চেষ্টা পর্যন্ত করতে সাহস করে না।

তবুও মহাত্মারা সেই সমস্ত কার্যকলাপের গর্বে স্ফীত হন না, কারণ তাঁরা খুব ভালভাবেই জানেন যে, ভগবানের কৃপায় যখন কোন অদ্ভুত কার্য সম্পাদিত হয়, তখন তার সমস্ত কৃতিত্ব ভগবানের, ভৃত্যের নয়।

শ্লোক ৬২

প্রকাশানন্দ-নামে সর্ব সন্ন্যাসি-প্রধান ।
প্রভুকে কহিল কিছু করিয়া সম্মান ॥ ৬২ ॥

শ্লোকার্থ

মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের নেতা প্রকাশানন্দ সরস্বতী তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে গভীর সম্মান সহকারে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে বললেন—

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যেমন সমস্ত মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন, মায়াবাদীদের নেতা প্রকাশানন্দ সরস্বতীও তেমনই ভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন।

শ্লোক ৬৩

ইহাঁ আইস, ইহাঁ আইস, শুনহ শ্রীপাদ ।
অপবিত্র স্থানে বৈস, কিবা অবসাদ ॥ ৬৩ ॥

শ্লোকার্থ

"দয়া করে এখানে আসুন, দয়া করে এখান আসুন, হে শ্রীপাদ, আপনি কেন এই অপবিত্র স্থানে বসেছেন? আপনার এই বিষাদের কারণ কি?"

তাৎপর্য

এটিই হচ্ছে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং প্রকাশানন্দ সরস্বতীর পার্থক্য। জড় জগতে সকলেই নিজেকে অত্যন্ত মহৎ ও সম্মানীয় বলে জাহির করতে চায়, কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অত্যন্ত দীন এবং বিনীতভাবে নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন। মায়াবাদীরা উচ্চ আসনে বসেছিলেন, আর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এমন একটি জায়গায়

বসলেন যা ছিল অপবিত্র। তাই মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা মনে করেছিলেন যে, তিনি নিশ্চয়ই কোন কারণে মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে থাকবেন, এবং তাই প্রকাশানন্দ সরস্বতী তাঁর অনুশোচনার কারণ অনুসন্ধান করেছিলেন।

শ্লোক ৬৪

প্রভু কহে,—আমি হই হীন-সম্প্রদায় ।
তোমা-সবার সভায় বসিতে না যুয়ায় ॥ ৬৪ ॥

শ্লোকার্থ

মহাপ্রভু তখন উত্তর দিলেন, "আমি হীন সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসী। তাই আপনাদের সঙ্গে একত্রে বসার যোগ্যতা আমার নেই।"

তাৎপর্য

সংস্কৃত ভাষায় পাণ্ডিত্য এবং শঙ্কর-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলে মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা অত্যন্ত গর্বিত। তাঁদের ধারণা, ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম না হলে এবং সংস্কৃত ভাষায়, বিশেষ করে ব্যাকরণ সম্বন্ধে অত্যন্ত পারদর্শী না হলে সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ করা যায় না, এবং প্রচার করা যায় না। মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা সব সময় বাক্‌চাতুরীর দ্বারা এবং ব্যাকরণের বিন্যাসের দ্বারা সমস্ত শাস্ত্র-নির্দেশের কদর্থ করেন। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য স্বয়ং এই বাক্‌চাতুরী ও ব্যাকরণের বিন্যাসের নিন্দা করে বলেছেন, *প্রাপ্তে সন্নিহিতে খলু মরণে নহি নহি রক্ষতি ডুকৃঞ্‌করণে।* ডুকৃঞ্‌ হচ্ছে সংস্কৃত ব্যাকরণের উপসর্গ ও বিভক্তি। শঙ্করাচার্য তাঁর শিষ্যদের সাবধান করে দিয়ে বলেছেন, গোবিন্দের ভজনা না করে তারা যদি কেবল ব্যাকরণ নিয়েই মেতে থাকে, তা হলে সেই সমস্ত মূর্খগুলি কোনদিনও উদ্ধার পাবে না। কিন্তু শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যের এই নির্দেশ সত্ত্বেও মূর্খ মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা সংস্কৃত ব্যাকরণের ভিত্তিতে বাক্যবিন্যাস করতেই ব্যস্ত।

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য প্রবর্তিত 'দশনামী' সন্ন্যাসীদের মধ্যে 'তীর্থ', 'আশ্রম' এবং 'সরস্বতী'—এই তিনটি সম্প্রদায় সদাচার ও সম্মানে অপর সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদের থেকে শ্রেষ্ঠ। তাই এই তিন সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসীরা তাদের পদমর্যাদায় অত্যন্ত গর্বিত। যারা 'বন', 'অরণ্য', 'ভারতী' ইত্যাদি উপাধি-বিশিষ্ট, মায়াবাদীরা তাঁদের নিম্নস্তরের সন্ন্যাসী বলে মনে করেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন

ভারতী সম্প্রদায় থেকে, এবং ফলে তিনি নিজেকে প্রকাশানন্দ সরস্বতী থেকে নিম্নস্তরের সন্ন্যাসী বলে মনে করেছিলেন। বৈষ্ণব সন্ন্যাসীদের থেকে স্বতন্ত্র থাকার জন্য মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা সর্বদাই মনে করেন যে, তাঁরা অতি উচ্চ পারমার্থিক স্তরে অধিষ্ঠিত। কিন্তু তাঁদের বিনীত ও নম্র হওয়ার শিক্ষা দান করার জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নীচ সম্প্রদায়ের সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। এইভাবে তিনি স্পষ্টভাবে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, সন্ন্যাসী হচ্ছেন তিনি যিনি পারমার্থিক জ্ঞানে উন্নত। পারমার্থিক জ্ঞানে যিনি উন্নত তাঁকে উচ্চ আসন দান করে তাঁর আনুগত্য বরণ করা উচিত।

মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের সাধারণত বলা হয় 'বেদান্তী', যেন বেদান্ত শাস্ত্রে তাঁদেরই একচেটিয়া অধিকার রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে 'বেদান্তী' হচ্ছেন তিনি যিনি যথাযথভাবে শ্রীকৃষ্ণকে জানেন। *ভগবদ্গীতায়* শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ* —"সমস্ত বেদে শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন জ্ঞাতব্য বিষয়" (*ভগবদ্গীতা* ১৫/১৫)। তথাকথিত মায়াবাদী বেদান্তীরা জানেন না কৃষ্ণ কি; তাই তাঁদের উপাধি সম্পূর্ণ অর্থহীন। মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা সব সময় মনে করেন যে, তাঁরাই হচ্ছেন প্রকৃত সন্ন্যাসী, তাই তাঁরা বৈষ্ণব সন্ন্যাসীদের ব্রহ্মচারী বলে মনে করেন। ব্রহ্মচারীর কর্তব্য হচ্ছে সন্ন্যাসীর সেবায় যুক্ত থাকা এবং তাঁকে গুরুরূপে বরণ করা। মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা কেবল নিজেদের গুরু বলে ঘোষণা করেই সন্তুষ্ট নন, তাঁরা নিজেদের 'জগদ্গুরু' বলে প্রচার করতে চান, যদিও সারা পৃথিবী তাঁরা চোখেও দেখেননি। কখনও কখনও তাঁরা খুব আড়ম্বরপূর্ণ পোশাক পরে শোভাযাত্রা সহকারে হাতির পিঠে চড়ে ভ্রমণ করেন। এইভাবে গর্বে স্ফীত হয়ে তাঁরা মনে করেন যে, তাঁরা জগদ্গুরু হয়ে গিয়েছেন। শ্রীল রূপ গোস্বামী বিশ্লেষণ করেছেন, যে, জগদ্গুরু হচ্ছেন তিনি যিনি তাঁর জিহ্বার বেগ, মনের বেগ, বাক্যের বেগ, উদরের বেগ, উপস্থের বেগ এবং ক্রোধের বেগ সম্পূর্ণরূপে দমন করেছেন। *পৃথিবীং স শিষ্যাৎ*—"এই ধরনের জগদ্গুরু সমস্ত পৃথিবী জুড়ে শিষ্য গ্রহণ করতে পারেন।" এই সমস্ত গুণাবলী রহিত অহঙ্কারে মত্ত মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা ভগবানের সেবায় বিনীতভাবে যুক্ত বৈষ্ণব সন্ন্যাসীদের নিন্দা করেন।

শ্লোক ৬৫

আপনে প্রকাশানন্দ হাতেতে ধরিয়া ।
বসাইলা সভামধ্যে সম্মান করিয়া ॥ ৬৫ ॥

শ্লোকার্থ

প্রকাশানন্দ সরস্বতী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে তাঁর হাত ধরে অত্যন্ত সম্মান সহকারে সবার মধ্যে এনে বসালেন।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রতি প্রকাশানন্দ সরস্বতীর এই সম্মানজনক ব্যবহার অত্যন্ত প্রশংসার যোগ্য। এই ধরনের ব্যবহারকে বলা হয় 'অজ্ঞাত-সুকৃতি।' এইভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রকাশানন্দ সরস্বতীকে অজ্ঞাত-সুকৃতির দ্বারা পারমার্থিক পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আয়োজন করেছিলেন, যাতে ভবিষ্যতে তিনি বৈষ্ণব সন্ন্যাসীতে পরিণত হতে পারেন।

শ্লোক ৬৬

পুছিল, তোমার নাম 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' ।
কেশব-ভারতীর শিষ্য, তাতে তুমি ধন্য ॥ ৬৬ ॥

শ্লোকার্থ

প্রকাশানন্দ সরস্বতী তখন বললেন, "আমি শুনেছি যে, তোমার নাম হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। তুমি শ্রীকেশব ভারতীর শিষ্য এবং তাই তুমি ধন্য।

শ্লোক ৬৭

সাম্প্রদায়িক সন্ন্যাসী তুমি, রহ এই গ্রামে ।
কি কারণে আমা-সবার না কর দর্শনে ॥ ৬৭ ॥

শ্লোকার্থ

"তুমি আমাদের শঙ্কর-সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী এবং তুমি এই গ্রামেই থাক। তা হলে তুমি কেন আমাদের সঙ্গে মেলামেশা কর না? তুমি কেন আমাদের দর্শন পর্যন্ত কর না?

তাৎপর্য

বৈষ্ণব সন্ন্যাসী অথবা পারমার্থিক প্রগতির মধ্যম অধিকারের স্তরে স্থিত বৈষ্ণব চারটি তত্ত্ব উপলব্ধি করেন, যথা—পরমেশ্বর ভগবান, ভগবদ্ভক্ত, নিরীহ ব্যক্তি ও

ঈর্ষাপরায়ণ বা ভগবৎ-বিদ্বেষী এবং এই চারজনের প্রতি তিনি ভিন্ন ভিন্নভাবে আচরণ করেন। তিনি ভগবানের প্রতি তাঁর প্রেম বর্ধিত করার চেষ্টা করেন, নিরীহ ব্যক্তিদের কাছে ভগবানের বাণী প্রচার করেন এবং ঈর্ষাপরায়ণ ভগবৎ-বিদ্বেষীদের উপেক্ষা করেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং সেই আচরণের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে গিয়েছেন এবং সেই জন্যই প্রকাশানন্দ সরস্বতী তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, কেন তিনি তাঁদের সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলেন না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দৃষ্টান্তের মাধ্যমে দেখিয়ে গিয়েছেন যে, কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রচারক যেন মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের সঙ্গে কথা বলে তাঁর সময়ের অপচয় না করেন, কিন্তু যখন শাস্ত্র-প্রমাণের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করার প্রশ্ন ওঠে, তখন বৈষ্ণব সিংহবিক্রমে এগিয়ে এসে বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তকারীকে পরাস্ত করেন।

মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের মতে শঙ্কর-সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীরাই কেবল বৈদিক সন্ন্যাসী। কখনও কখনও তারা প্রতিবাদ করে যে, কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রচারক সন্ন্যাসীরা যেহেতু ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভূত নন, তাই তাঁরা যথার্থ সন্ন্যাসী নন, কারণ ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম না হলে মায়াবাদীরা তাঁকে সন্ন্যাস দেন না। দুর্ভাগ্যবশত তারা জানে না যে, এই যুগে সকলেই শূদ্র (*কলৌ শূদ্র সম্ভবা*)। এই যুগে কোন ব্রাহ্মণ নেই, কারণ যারা ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম হয়েছে বলে নিজেদের ব্রাহ্মণ বলে দাবি করছে, তাদের মধ্যে ব্রাহ্মণোচিত গুণগুলি নেই। কিন্তু শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত অনুসারে অব্রাহ্মণ কুলোদ্ভূত মানুষের মধ্যেও যদি ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলী দেখা যায়, তা হলে তাঁকে ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করা যায়। নারদ মুনি এবং শ্রীধর স্বামী তা প্রতিপন্ন করে গিয়েছেন। সেই কথা *শ্রীমদ্ভাগবতেও* বর্ণিত হয়েছে। নারদ মুনি এবং শ্রীধর স্বামী উভয়েই সর্বতোভাবে স্বীকার করেছেন যে, ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম হলেই কেবল ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না। পক্ষান্তরে ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলীর দ্বারা ভূষিত হলে, যে কোন কুলোদ্ভূত মানুষই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করতে পারেন। তাই আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে আমরা ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলী না থাকলে কাউকে সন্ন্যাস দিই না। যদিও এই কথা সত্যি যে, ব্রাহ্মণ না হলে সন্ন্যাসী হওয়া যায় না, তা বলে তার অর্থ কখনও এই নয় যে, ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভূত অযোগ্য মানুষকে ব্রাহ্মণ বলে মেনে নিতে হবে এবং অব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভূত মানুষের ব্রাহ্মণোচিত সমস্ত গুণাবলী থাকলেও তাঁকে ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করা যাবে না। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে ভ্রান্ত পথে গমনের পন্থারূপ প্রচলিত বিকৃত ধর্মমত আর মনগড়া সিদ্ধান্ত বর্জন করে *শ্রীমদ্ভাগবতের* নির্দেশ অনুসরণ করছে।

শ্লোক ৬৮

সন্ন্যাসী হইয়া কর নর্তন-গায়ন ।
ভাবুক সব সঙ্গে লঞা কর সংকীর্তন ॥ ৬৮ ॥

শ্লোকার্থ

"তুমি সন্ন্যাসী। অতএব তুমি ভাবুকদের সঙ্গে নৃত্য করে, গান করে সংকীর্তন কর কেন?

তাৎপর্য

এটি হচ্ছে প্রকাশানন্দ সরস্বতী কর্তৃক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাঁর *অনুভাষ্যে* লিখেছেন যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, যিনি হচ্ছেন সমস্ত বেদান্ত দর্শনের আরাধ্য বস্তু, তিনি অত্যন্ত দয়াপরবশ হয়ে বেদান্ত দর্শন পাঠ করার যোগ্যতা কার রয়েছে, সেই ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছেন। সেই যোগ্যতা ব্যক্ত করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর *শিক্ষাষ্টকে* বলেছেন—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা ।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥

এই উক্তিতে নির্দিষ্ট হয়েছে যে, গুরু-পরম্পরার মাধ্যমে বেদান্ত দর্শন শ্রবণ অথবা কীর্তন করার যোগ্যতা লাভ করা যায়। অত্যন্ত বিনীত এবং নম্রভাবে তরুর থেকে সহিষ্ণু এবং তৃণের থেকেও দীনতর হয়ে, নিজের জন্য কোন রকম সম্মানের প্রত্যাশা না করে এবং অন্য সকলকে সমস্ত সম্মান দান করে, বৈদিক তত্ত্বজ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করার যোগ্যতা অর্জন করা যায়।

শ্লোক ৬৯

বেদান্ত-পঠন, ধ্যান,—সন্ন্যাসীর ধর্ম ।
তাহা ছাড়ি' কর কেনে ভাবুকের কর্ম ॥ ৬৯ ॥

শ্লোকার্থ

"বেদান্ত পাঠ এবং ধ্যান করাই হচ্ছে সন্ন্যাসীর ধর্ম। সেই ধর্ম ত্যাগ করে কেন ভাবুকের মতো নৃত্য-কীর্তন করছ?

তাৎপর্য

একচত্বারিংশতি শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা নৃত্য এবং কীর্তন করা অনুমোদন করেন না। সার্বভৌম ভট্টাচার্যের মতে, প্রকাশানন্দ সরস্বতী মনে করেছিলেন যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন একজন পথভ্রষ্ট নবীন সন্ন্যাসী, তাই তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, সন্ন্যাসীর কর্তব্য না করে তিনি কেন ভাবুকদের সঙ্গ করছেন।

শ্লোক ৭০

প্রভাবে দেখিয়ে তোমা সাক্ষাৎ নারায়ণ ।
হীনাচার কর কেনে, ইথে কি কারণ ॥ ৭০ ॥

শ্লোকার্থ

"তোমার প্রভাব দেখে মনে হয় তুমি যেন সাক্ষাৎ নারায়ণ। কিন্তু তুমি নিম্নশ্রেণীর মানুষদের মতো আচরণ করছ কেন? তার কারণ কি?"

তাৎপর্য

বৈরাগ্য, বেদান্ত অধ্যয়ন, ধ্যান এবং কঠোর নিয়ম-নিষ্ঠা পালন করার ফলে মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা অবশ্যই পুণ্যকর্ম করছেন। এই পুণ্যের প্রভাবে প্রকাশানন্দ সরস্বতী বুঝতে পেরেছিলেন যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কোন সাধারণ মানুষ নন, পক্ষান্তরে তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। তিনি তাঁকে সাক্ষাৎ নারায়ণ বলে মনে করেছিলেন। মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা পরস্পরকে নারায়ণ বলে সম্বোধন করেন, কারণ তাঁরা মনে করেন যে, পরবর্তী জীবনে তাঁরা নারায়ণ হয়ে যাবেন বা নারায়ণের সঙ্গে লীন হয়ে যাবেন। প্রকাশানন্দ সরস্বতী মনে করেছিলেন যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ইতিমধ্যেই নারায়ণ হয়ে গিয়েছেন এবং পরবর্তী জীবনের জন্য তাঁর আর প্রতীক্ষা করার কোন প্রয়োজন নেই। বৈষ্ণব এবং মায়াবাদী দর্শনের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে যে, মায়াবাদী দার্শনিকেরা মনে করেন যে, দেহত্যাগের পরে তাঁরা নারায়ণের দেহে লীন হয়ে নারায়ণ হয়ে যাবেন। কিন্তু বৈষ্ণব দার্শনিকেরা জানেন যে, জড় দেহের মৃত্যুর পর তাঁরা এক জড়াতীত, চিন্ময় শরীর প্রাপ্ত হয়ে নারায়ণের সঙ্গ লাভ করবেন।

শ্লোক ৭১

প্রভু কহে—শুন, শ্রীপাদ, ইহার কারণ ।
গুরু মোরে মূর্খ দেখি' করিল শাসন ॥ ৭১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রকাশানন্দ সরস্বতীর প্রশ্নের উত্তরে বললেন, "হে শ্রীপাদ, তার কারণ আমি বলছি, দয়া করে আপনি তা শুনুন। আমার গুরুদেব বুঝতে পেরেছিলেন যে, আমি একটি মূর্খ এবং তাই তিনি আমাকে শাসন করেছিলেন।

তাৎপর্য

প্রকাশানন্দ সরস্বতী যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কেন তিনি বেদান্ত পাঠ করেন না এবং ধ্যান করেন না, তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কলিযুগটি যে সমস্ত মূর্খদের যুগ এবং তাই বেদান্ত দর্শন পাঠ করে এবং ধ্যান করে যে পরমার্থ সাধন হয় না, সেই কথা প্রতিপন্ন করার জন্য নিজেকে একজন মূর্খ বলে উপস্থাপন করেছিলেন। শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্ ।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

"কলহ এবং প্রবঞ্চনাময় এই কলিযুগে উদ্ধার পাওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে ভগবানের দিব্যনাম কীর্তন করা। তা ছাড়া আর অন্য কোন গতি নেই, অন্য কোন গতি নেই, অন্য কোন গতি নেই।" সাধারণত এই কলিযুগের মানুষেরা এত অধঃপতিত যে, তাদের পক্ষে *বেদান্ত-সূত্র* অধ্যয়ন করে পরমার্থ সাধন করা সম্ভব নয়। ঐকান্তিকভাবে নিরন্তর ভগবানের দিব্যনাম কীর্তন করতে হবে, কারণ এই জড় জগতের দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্ত হওয়ার সেটিই হচ্ছে একমাত্র পন্থা।

শ্লোক ৭২

মূর্খ তুমি, তোমার নাহিক বেদান্তাধিকার ।
'কৃষ্ণমন্ত্র' 'জপ' সদা,—এই মন্ত্রসার ॥ ৭২ ॥

শ্লোকার্থ

"তিনি বলেছিলেন, 'তুমি একটি মূর্খ, বেদান্ত দর্শন অধ্যয়ন করার অধিকার তোমার নেই, তুমি কেবল নিরন্তর 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' জপ কর। এটিই হচ্ছে সমস্ত বৈদিক মন্ত্রের সার।

তাৎপর্য

এই সম্পর্কে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মন্তব্য করেছেন, "শ্রীগুরুদেবের নির্দেশ যথাযথভাবে সম্পাদন করলে জীবনের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে সফল হয়।" এইভাবে গুরুদেবের আদেশ পালন করাকে বলা হয় *শ্রৌতবাক্য* এবং এই ধারাতেই শিষ্যকে অবিচলিতভাবে গুরুদেবের আদেশ পালন করতে হয়। এই সম্পর্কে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর মন্তব্য করেছেন যে, শিষ্যের কর্তব্য হচ্ছে গুরুদেবের নির্দেশ সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করা। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও এখানে বলেছেন, যেহেতু তাঁর গুরুদেব তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন কৃষ্ণনাম জপ করার জন্য, তাই তিনি নিরন্তর 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' জপ করছিলেন *('কৃষ্ণমন্ত্র' 'জপ' সদা,—এই মন্ত্র সার)*।

শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সব কিছুর উৎস, তাই কোন মানুষ যখন পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনাময় হয়, তখন বুঝতে হবে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তার সম্পর্ক পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কৃষ্ণভাবনার অভাব হলে, জীব আংশিকভাবে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত থাকে। তাই সে তার স্বরূপে অধিষ্ঠিত থাকে না। যদিও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং সমগ্র জগতের গুরু, তবুও তিনি গুরুদেবের নির্দেশ অনুসারে 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তন শিক্ষাদান করার জন্য স্বয়ং শিষ্যত্ব বরণ করে এই আচরণ করে গিয়েছেন। যে সমস্ত মানুষ বেদান্ত পাঠের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, তাদের শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই শিক্ষা গ্রহণ করা অবশ্য কর্তব্য। এই যুগে কারও বেদান্ত অধ্যয়ন করার যোগ্যতা নেই, তাই ভগবানের দিব্যনাম কীর্তন করাই শ্রেয়, যা হচ্ছে সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের সারমর্ম। সেই সম্পর্কে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং *ভগবদ্গীতায়* বলেছেন—

বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্ ।

"সমস্ত বেদে আমিই কেবল জ্ঞাতব্য; আমি হচ্ছি বেদান্তের প্রণেতা, আমিই হচ্ছি বেদবেত্তা।" (*ভগবদ্গীতা* ১৫/১৫)।

মূর্খরাই কেবল গুরুসেবা ত্যাগ করে নিজেদের তত্ত্বজ্ঞানী পণ্ডিত বলে মনে করে। এই ধরনের মূর্খদের নিরস্ত করার জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যথার্থ শিষ্য হওয়ার আদর্শ সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গিয়েছেন। গুরুদেব জানেন, কিভাবে তাঁর শিষ্যকে কোন বিশেষ সেবায় নিযুক্ত করতে হয়। কিন্তু শেষ অবধি যদি নিজেকে গুরুর থেকেও বড় পণ্ডিত বলে মনে করে গুরুদেবের নির্দেশ অমান্যপূর্বক স্বাধীন মতানুযায়ী আচরণ করতে শুরু করে, তা হলে তার সর্বনাশ হয়। প্রতিটি

শিষ্যেরই কর্তব্য হচ্ছে, নিজেকে কৃষ্ণতত্ত্ব বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ বলে মনে করে, কৃষ্ণভক্তি লাভের উদ্দেশ্যে সর্বদা গুরুদেবের আদেশ পালন করতে প্রস্তুত থাকা। শিষ্যের কর্তব্য গুরুদেবের সামনে নিজেকে মহামূর্খ বলে মনে করা। তাই কখনও কখনও লোকদেখানো পরমার্থবাদীদের এমন কারও কাছ থেকে দীক্ষা নিতে দেখা যায় যে, এমন কি সে শিষ্য হওয়ারও যোগ্য নয়, কারণ সেই সমস্ত তথাকথিত শিষ্যরা সেই সমস্ত তথাকথিত গুরুদেবকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখতে চায়। পরমার্থ তত্ত্ব উপলব্ধির পথে এই ধরনের আচরণ সম্পূর্ণ অর্থহীন।

কৃষ্ণভাবনামৃত সম্বন্ধে যে মানুষের জ্ঞান অসম্পূর্ণ, সে কখনও বেদান্ততত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারবে না। কৃষ্ণভক্তি ছাড়া লোকদেখানো বেদান্ত অধ্যয়ন জীবকে ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি মায়ার কবলিভূত করার একটি আয়োজন। আর যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ নিত্য পরিবর্তনশীল জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ থাকে, ততক্ষণ সে পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় বিমুখ থাকে। বেদান্ত দর্শনের প্রকৃত অনুগামী হচ্ছেন ভগবদ্ভক্ত বৈষ্ণব, যিনি জানেন যে, পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন জগতের পরম নিয়ন্তা এবং পরম পালনকর্তা। যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষ সসীমের সেবাপ্রবৃত্তি অতিক্রম করছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে অসীমের কাছে পৌঁছতে পারবে না। প্রকৃতপক্ষে এই অসীমের জ্ঞানই হচ্ছে ব্রহ্মজ্ঞান বা পরম জ্ঞান। যে সমস্ত মানুষ সকাম কর্মের প্রতি এবং জ্ঞানের প্রতি আসক্ত থাকে, সেই সমস্ত মানুষই পূর্ণশুদ্ধ নিত্যমুক্ত আনন্দময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্যনামের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। যে মানুষ পরমেশ্বর ভগবান থেকে অভিন্ন নামের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, তাঁকে আর বেদান্ত অধ্যয়ন করতে হয় না, কারণ তিনি ইতিমধ্যেই এই সমস্ত অধ্যয়ন সমাপ্ত করেছেন।

যে মানুষ শ্রীকৃষ্ণের দিব্যনাম কীর্তন করতে অক্ষম হয়ে মনে করে, শ্রীকৃষ্ণের নাম শ্রীকৃষ্ণ থেকে ভিন্ন, এবং বেদান্ত অধ্যয়নের মাধ্যমে তাঁকে জানবার চেষ্টা করে, সে হচ্ছে একটি মহামূর্খ। সেই সত্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ব্যক্তিগত আচরণের দ্বারা প্রতিপন্ন হয়েছে যে সমস্ত মনোধর্মী জ্ঞানী বেদান্ত অধ্যয়নকে তাদের পেশাগত বৃত্তি বলে গ্রহণ করেছে, তাদের জ্ঞান মায়ার দ্বারা অপহৃত হয়েছে। কিন্তু যিনি নিরন্তর ভগবানের দিব্যনাম কীর্তন করেন, তিনি ইতিমধ্যেই অজ্ঞানের পারাবার অতিক্রম করেছেন। এমন কি নীচ কুলোদ্ভূত কোন মানুষও যদি ভগবানের দিব্যনাম কীর্তনে মগ্ন হন, তিনিও বেদান্ত অধ্যয়নের স্তর অতিক্রম করেছেন বলে বুঝতে হবে। সেই সম্পর্কে *শ্রীমদ্ভাগবতে* বলা হয়েছে—

অহো বত স্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ততে নাম তুভ্যম্ ।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্যা
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে ॥

"শ্বপচ (কুকুরভোজী চণ্ডাল) গুণোদ্ভূত মানুষও যদি শ্রীকৃষ্ণের দিব্যনাম কীর্তন করেন, তা হলে বুঝতে হবে, তাঁর পূর্বজন্মে তিনি সব রকম তপশ্চর্যা এবং সব রকম যজ্ঞ অনুষ্ঠান সম্পাদন করেছেন।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৩/৩৩/৭)
আর একটি শ্লোকে বলা হয়েছে—

ঋগ্বেদোঽথ যজুর্বেদঃ সামবেদোঽপ্যথর্বণঃ ।
অধীতাস্তেন যেনোক্তং হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্ ॥

"যে মানুষ *হ* এবং *রি* এই দুটি অক্ষর কীর্তন করেন, তিনি ইতিমধ্যেই *সাম, ঋক, যজুঃ* এবং *অথর্ব* এই চারটি বেদ অধ্যয়ন করেছেন।"

এই শ্লোকগুলির অজুহাতে একদল সহজিয়া সব কিছু অত্যন্ত সস্তাভাবে নেয়। তারা নিজেদের অতি উন্নত বৈষ্ণব বলে মনে করে, অথচ বেদান্ত-সূত্র অথবা বেদান্ত দর্শন স্পর্শ পর্যন্ত করে না। প্রকৃত বৈষ্ণব কিন্তু বেদান্ত দর্শন অধ্যয়ন করেন। কিন্তু বেদান্ত দর্শন অধ্যয়ন করার পর কেউ যদি ভগবানের দিব্যনাম কীর্তন করার পন্থা গ্রহণ না করেন, তা হলে তিনি মায়াবাদীদের থেকে কোন অংশেই শ্রেয় নন। মায়াবাদী হওয়া উচিত নয়, আবার সেই সঙ্গে বেদান্ত দর্শনের বিষয়বস্তু সম্বন্ধেও অজ্ঞ থাকা উচিত নয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রকাশানন্দ সরস্বতীর সঙ্গে আলোচনাকালে বেদান্ত সম্বন্ধে জ্ঞান প্রদর্শন করেছিলেন। এর থেকে বোঝা যায় যে, বৈষ্ণবদের কর্তব্য হচ্ছে সর্বতোভাবে বেদান্ত দর্শন সম্বন্ধে অবগত থাকা। তবে তার অর্থ এই নয় যে, বেদান্ত অধ্যয়নকে পারমার্থিক অনুশীলনের মূল বিষয় বলে মনে করে, ভগবানের দিব্যনাম কীর্তনে বিরত হওয়া। ভক্তের কর্তব্য হচ্ছে বেদান্ত দর্শন হৃদয়ঙ্গম করা এবং সেই সঙ্গে ভগবানের দিব্যনাম কীর্তন করার গুরুত্ব সম্বন্ধে অবগত থাকা। বেদান্ত অধ্যয়নের ফলে কেউ যদি নির্বিশেষবাদী হয়ে যান, তা হলে বুঝতে হবে যে, তিনি বেদান্ত দর্শনের মর্ম উপলব্ধি করতে পারেননি। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* (১৫/১৫) প্রতিপন্ন হয়েছে। বেদান্ত মানে হচ্ছে, 'সমস্ত জ্ঞানের অন্ত'। সমস্ত জ্ঞানের অন্ত হচ্ছে কৃষ্ণ-তত্ত্বজ্ঞান, এবং কৃষ্ণ তাঁর নাম থেকে অভিন্ন। সহজিয়ারা চারটি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আচার্যভাষ্য সমন্বিত বেদান্ত দর্শন অধ্যয়নের পরোয়া করে না। গৌড়ীয় সম্প্রদায়ে *গোবিন্দভাষ্য* নামক বেদান্ত ভাষ্য রয়েছে,

কিন্তু সহজিয়ারা মনে করে যে, এই ধরনের ভাষ্যগুলি হচ্ছে দার্শনিক জল্পনা-কল্পনা এবং তারা মহান বৈষ্ণব আচার্যদের মিশ্রভক্ত বলে মনে করে। এইভাবে তারা নরকে যাওয়ার পথ পরিষ্কার করে।

শ্লোক ৭৩

কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হবে সংসার-মোচন ।
কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ ॥ ৭৩ ॥

শ্লোকার্থ

" 'কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণের দিব্যনাম কীর্তন করার ফলে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়। 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তন করার ফলেই কেবল শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের দর্শন লাভ করা যায়।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাঁর অনুভাষ্যে বলেছেন যে, জীব যখন দিব্যজ্ঞান লাভ করেন, তখন তিনি মায়ার প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে সর্বতোভাবে ভগবানের সেবায় যুক্ত হন। পরমেশ্বর ভগবান মুকুন্দের সঙ্গে যুক্ত না হওয়া পর্যন্ত ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তিজাত সকাম কর্ম থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। কিন্তু নিরপরাধে কেউ যখন ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করেন, তখন তিনি সব রকম জড় প্রভাবের অতীত অপ্রাকৃত জগৎ উপলব্ধি করতে পারেন। ভগবানের সেবা করার ফলে ভক্ত শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মাধুর্য এই পাঁচটি রসে ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হন এবং এইভাবে সম্পর্কের মাধ্যমে তিনি দিব্য আনন্দ আস্বাদন করেন। এই সম্পর্ক অবশ্যই দেহ এবং মনের অতীত। কেউ যখন হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন যে, ভগবানের দিব্যনাম পরমেশ্বর ভগবান থেকে অভিন্ন, তখন তিনি ভগবানের দিব্যনাম কীর্তন করার পূর্ণ যোগ্যতা অর্জন করেন। এইভাবে আনন্দে মগ্ন হয়ে যিনি কীর্তন এবং নৃত্য করেন, তখন বুঝতে হবে যে, তিনি ভগবানের সঙ্গে সরাসরিভাবে সম্পর্কযুক্ত।

বৈদিক তত্ত্ব অনুসারে পারমার্থিক প্রগতির তিনটি স্তর রয়েছে, যথা—*সম্বন্ধ, অভিধেয়* এবং *প্রয়োজন*। সম্বন্ধজ্ঞানের অর্থ হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হওয়া। অভিধেয়-তত্ত্ব হচ্ছে সেই সম্পর্ক অনুসারে আচরণ করা, এবং প্রয়োজন হচ্ছে জীবের পরম উদ্দেশ্য ভগবৎ-প্রেম লাভ করা (*প্রেমা পুমর্থো মহান্*)। কেউ যদি সদ্গুরুর নির্দেশ অনুসারে ভগবদ্ভক্তির বিধি-নিষেধগুলি

অনুশীলন করেন, তা হলে তিনি অনায়াসে জীবনের পরম উদ্দেশ্য সাধন করতে পারবেন। যে মানুষ 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তনে অত্যন্ত আসক্ত, তিনি অনায়াসে প্রত্যক্ষভাবে পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করার সুযোগ লাভ করতে পারবেন। তাঁর পক্ষে আর ব্যাকরণের বাক্যবিন্যাস হৃদয়ঙ্গম করার প্রয়োজন নেই, যা মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা সাধারণত করে থাকেন। এই বিষয়ে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য পর্যন্ত খুব জোর দিয়ে বলেছেন, *নহি নহি রক্ষতি ডুকৃঞ্করণে*—"কেবল ব্যাকরণের বিভক্তি আর উপসর্গ নিয়ে বাক্যবিন্যাস করলে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায় না।" যে ভক্ত 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তনে মগ্ন হয়েছেন, তিনি ব্যাকরণের বাক্যবিন্যাসীদের দ্বারা মোহাচ্ছন্ন হন না। ভগবানের শক্তি 'হরে' এবং স্বয়ং ভগবান 'শ্রীকৃষ্ণ'কে সম্বোধন করার মাধ্যমে ভক্ত হৃদয়াভ্যন্তরে হৃদয়রাজ ভগবানকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। এইভাবে শ্রীমতী রাধারাণী এবং শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করার ফলে সরাসরিভাবে ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়া যায়। 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' দ্বারা ভগবান এবং তাঁর শক্তিকে সম্বোধন করার ফলে, সমস্ত শাস্ত্র এবং সমস্ত জ্ঞান উপস্থিত থাকে, কারণ এই অপ্রাকৃত শব্দতরঙ্গ বদ্ধ জীবকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করে সরাসরিভাবে পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় যুক্ত করতে পারে।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নিজেকে একজন মূর্খরূপে উপস্থাপন করেছিলেন, কিন্তু তবুও তাঁর গুরুপাদপদ্মের নির্দেশাবলী তিনি নিষ্ঠাভরে পালন করছিলেন, যা হচ্ছে *শ্রীমদ্ভাগবতে* ব্যাসদেবের নির্দেশ।

অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে ।
লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্ ॥

"জীবের যে জড়-জাগতিক দুঃখ-দুর্দশা তা সম্পূর্ণ অর্থহীন এবং ভক্তিযোগে ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ফলে তা তৎক্ষণাৎ বিদূরিত হয়। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই সেই কথা জানে না এবং তাই মহামুনি বেদব্যাস ভগবৎ-তত্ত্ব সমন্বিত বৈদিক শাস্ত্র প্রণয়ন করেছিলেন" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১/৭/৬)। ভক্তিযোগ অনুশীলনের ফলে জীব জড় জগতের সমস্ত বন্ধন এবং ভ্রান্তি থেকে মুক্ত হতে পারেন, তাই ব্যাসদেব শ্রীনারদ মুনির নির্দেশ অনুসারে অত্যন্ত দয়াপরবশ হয়ে বদ্ধ জীবদের মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত করার জন্য *শ্রীমদ্ভাগবত* প্রদান করেছেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর গুরুদেব তাই তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তনের প্রতি যুক্ত হওয়ার জন্য নিয়মিতভাবে *শ্রীমদ্ভাগবত* অধ্যয়ন করতে হবে।

ভগবানের দিব্যনাম ভগবান থেকে অভিন্ন। যে মানুষ সম্পূর্ণভাবে মায়ার প্রভাব থেকে মুক্ত হয়েছেন, তিনি এই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। সদ্গুরুর কৃপার

প্রভাবে লভ্য এই জ্ঞান জীবকে চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত করে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নিজেকে মূর্খ বলে প্রতিপন্ন করেছিলেন, কারণ গুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করার পূর্বে তিনি বুঝতে পারেননি যে, কেবলমাত্র 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তন করার ফলে সমস্ত জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়। কিন্তু যে মুহূর্তে তিনি তাঁর গৌরবের দাসত্ব বরণ করে তাঁর নির্দেশ পালন করতে শুরু করেছিলেন, তখনই তিনি অনায়াসে মুক্তির পথ দর্শন করতে পেরেছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তন যে সব রকম অপরাধমুক্ত ছিল তা বুঝতে হবে। দশটি নাম অপরাধ হচ্ছে— (১) ভগবদ্ভক্তের নিন্দা করা, (২) বিভিন্ন দেব-দেবীর নামকে ভগবানের নামের সমপর্যায়ভুক্ত অথবা অনেক ভগবান আছেন বলে মনে করা, (৩) গুরুদেবের নির্দেশ অবজ্ঞা করা, (৪) বৈদিক শাস্ত্র এবং বৈদিক শাস্ত্রের অনুগামী শাস্ত্রের নিন্দা করা, (৫) ভগবানের নামের অর্থবাদ করা, (৬) ভগবানের নামের মহিমাকে অতিস্তুতি বলে মনে করা, (৭) নামবলে পাপাচরণ করা, (৮) 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তনকে বেদের কর্মকাণ্ডের যাগযজ্ঞ ও তপস্যার মতো পুণ্যকর্ম বলে মনে করা, (৯) ভগবৎ-বিদ্বেষীদের কাছে ভগবানের নামের মহিমা প্রচার করা, (১০) ভগবানের নামের মহিমা শ্রবণ করা সত্ত্বেও জড় বিষয়াসক্তি বজায় রাখা।

শ্লোক ৭৪

নাম বিনু কলিকালে নাহি আর ধর্ম ।
সর্বমন্ত্রসার নাম, এই শাস্ত্রমর্ম ॥ ৭৪ ॥

শ্লোকার্থ

"এই কলিযুগে ভগবানের দিব্যনাম কীর্তন করা ছাড়া আর কোন ধর্ম নেই। এই নাম হচ্ছে সমস্ত বৈদিক মন্ত্রের সার। এটিই সমস্ত শাস্ত্রের মর্ম।

তাৎপর্য

সত্য, ত্রেতা এবং দ্বাপর যুগে পরম্পরার ধারা কঠোর নিষ্ঠা সহকারে অনুসরণ করা হত, কিন্তু এই কলিযুগে মানুষ শ্রৌত-পরম্পরা বা পরম্পরার ধারায় জ্ঞান আহরণ করার পন্থার গুরুত্ব অবহেলা করে। এই যুগে মানুষ তর্ক করে যে, তথাকথিত বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তাদের সীমিত জ্ঞানের অতীত যে বস্তু তাঁকে তারা জানতে পারবে। তারা জানে না যে, প্রকৃত সত্য মানুষের কাছে উদ্ঘাটিত হয় অবরোহ পন্থায় এবং তত্ত্বজ্ঞানী মহাজনদের কাছ থেকে

সেই জ্ঞান মানুষের কাছে নেমে আসে। তর্ক করার এই প্রবণতা বৈদিক পন্থার বিরোধী এবং এই রকম মনোভাবাপন্ন মানুষের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের দিব্যনাম যে শ্রীকৃষ্ণ থেকে অভিন্ন তা হৃদয়ঙ্গম করা অত্যন্ত কঠিন। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর দিব্যনাম অভিন্ন, তাই কৃষ্ণনাম নিত্য শুদ্ধ এবং জড় কলুষের অতীত। এই নাম শব্দরূপে পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং। ভগবানের নাম জড় শব্দতরঙ্গ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন. যে কথা শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর বলে গিয়েছেন—'গোলোকের প্রেমধন, হরিনাম সংকীর্তন'। যে সমস্ত জড়বাদী অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের প্রতি এবং তথাকথিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, তাঁরা 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তনের প্রতি শ্রদ্ধালু হতে পারেন না। কিন্তু নিরপরাধে 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তন করার ফলেই যে সব রকম স্থূল এবং সূক্ষ্ম বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়, তা ধ্রুব সত্য। চিৎ-জগৎকে বলা হয় 'বৈকুণ্ঠ', যার অর্থ 'কুণ্ঠাহীন'। জড় জগতে সকলেই কুণ্ঠাযুক্ত এবং বৈকুণ্ঠে সকলেই কুণ্ঠামুক্ত। তাই যারা নানা রকম কুণ্ঠায় জর্জরিত, তারা 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রে'র মহিমা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না, যা হচ্ছে সব রকম কুণ্ঠা থেকে মুক্ত। এই যুগে 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তন করাই হচ্ছে কলুষিত জড় জগতের অতীত চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত হওয়ার পন্থা। যেহেতু ভগবানের দিব্যনাম বদ্ধজীবদের মুক্ত করতে পারে, তাই এখানে বলা হয়েছে, 'সর্বমন্ত্রসার' অর্থাৎ সমস্ত বৈদিক মন্ত্রের সার।

এই জড় জগতে কোন বস্তুর পরিচায়ক যে নাম, তা তর্কবিতর্ক এবং অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের দ্বারা গ্রাহ্য হতে পারে, কিন্তু চিৎ-জগতে নাম এবং নামী, যশ এবং যশস্বী অভিন্ন। তেমনই পরমেশ্বর ভগবানের রূপ, গুণ, লীলা আদি সব কিছুই তাঁর থেকে অভিন্ন। মায়াবাদীরা যদিও নিজেদের অদ্বৈতবাদী বলে প্রচার করে, তবুও তারা পরমেশ্বর ভগবান এবং তাঁর নামের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করে। এই নাম অপরাধের জন্য তারা ব্রহ্মজ্ঞানের স্তর থেকে অধঃপতিত হয়। সেই সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১০/২/৩২) বলা হয়েছে—

আরুহ্যকৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ॥

যদিও তারা কঠোর তপশ্চর্যার প্রভাবে ব্রহ্মজ্ঞানের স্তরে উন্নীত হয়, কিন্তু পরম সত্য পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের প্রতি অবজ্ঞাজনিত অপরাধের ফলে তারা অধঃপতিত হয়। তারা যদিও *সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম* ('সবই হচ্ছে ব্রহ্ম')—এই মন্ত্র উপলব্ধি করেছে বলে দাবি করে, কিন্তু তারা বুঝতে পারে না যে, ভগবানের দিব্য নামও ব্রহ্ম। কিন্তু তারা সেই ভ্রান্ত ধারণা থেকে মুক্ত হতে পারে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না জীব ভগবানের দিব্য নামের আশ্রয় গ্রহণ করছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা অপরাধ মুক্ত হয়ে ভগবানের দিব্যনাম কীর্তন করতে পারবে না।

শ্লোক ৭৫

এত বলি' এক শ্লোক শিখাইল মোরে ।
কণ্ঠে করি' এই শ্লোক করিহ বিচারে ॥ ৭৫ ॥

শ্লোকার্থ

"হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রের এই মহিমা বর্ণনা করার পর, আমার গুরুদেব আমাকে একটি শ্লোক শিখিয়েছিলেন এবং সেই কথা বিচার করে নিরন্তর ভগবানের নাম কীর্তন করতে আমাকে উপদেশ দিয়েছিলেন।

শ্লোক ৭৬

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্ ।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥ ৭৬ ॥

শব্দার্থ

হরেঃ নাম—ভগবানের দিব্যনাম; হরেঃ নাম—ভগবানের দিব্যনাম; হরেঃ নাম—ভগবানের দিব্যনাম; এব—অবশ্যই; কেবলম্—একমাত্র; কলৌ—এই কলিযুগে; ন অস্তি—নেই; এব—অবশ্যই; ন অস্তি—নেই; এব—অবশ্যই; ন অস্তি—নেই; এব —অবশ্যই; গতিঃ—গতি; অন্যথা—অন্য কোন।

অনুবাদ

" 'এই কলিযুগ ভগবানের দিব্যনাম কীর্তন করা ছাড়া আর অন্য কোন গতি নেই, আর অন্য কোন গতি নেই, আর অন্য কোন গতি নেই।'

তাৎপর্য

সত্যযুগে পারমার্থিক পথে অগ্রসর হওয়ার পন্থা হচ্ছে ধ্যান, ত্রেতাযুগে পারমার্থিক উন্নতি সাধনের পন্থা হচ্ছে শ্রীবিষ্ণুর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য যজ্ঞ করা এবং দ্বাপর যুগের পন্থা হচ্ছে মহা আড়ম্বরে মন্দিরে ভগবানের পূজা করা, কিন্তু কলিযুগে কেবল ভগবানের দিব্যনাম কীর্তন করার মাধ্যমে পারমার্থিক উন্নতি সাধন করা যায়। সেই কথা বিভিন্ন শাস্ত্রে প্রতিপন্ন হয়েছে। এই বিষয়ে *শ্রীমদ্ভাগবতে* বহু উল্লেখ রয়েছে। দ্বাদশ স্কন্ধে বলা হয়েছে, *কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ*—এই কলিযুগ পাপে পূর্ণ, এবং সেই জন্য মানুষ নানাভাবে দুর্দশাগ্রস্ত, কিন্তু তবুও এই যুগে এক

মহান গুণ হচ্ছে—কেবলমাত্র 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তন করার ফলে মানুষ সব রকমের জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে চিৎ-জগতে উন্নীত হতে পারে। *নারদ-পঞ্চরাত্রে* 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রে'র মহিমা কীর্তন করে বলা হয়েছে—

ত্রয়ো বেদাঃ ষড়ঙ্গানি ছন্দাংসি বিবিধাঃ সুরাঃ ।
সর্বম্ অষ্টাক্ষরান্তঃস্থং যচ্চান্যদপি বাঙ্ময়ম্ ।
সর্ববেদান্তসারার্থঃ সংসারার্ণবতারণঃ ॥

"তিন প্রকার বৈদিক ক্রিয়া (কর্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড এবং উপাসনা কাণ্ড), ছন্দ বা বৈদিক মন্ত্র এবং দেব-দেবীদের সন্তুষ্ট করার পন্থা—এই সবই 'হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ' এই আটটি অক্ষরে নিহিত রয়েছে। এটিই হচ্ছে সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের সারমর্ম। এটিই হচ্ছে সমস্ত বেদান্তের চরম তত্ত্ব। ভবসাগর পার হওয়ার একমাত্র পন্থা হচ্ছে 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তন করা। তেমনই *কলিসন্তরণ উপনিষদে* বর্ণনা করা হয়েছে, *হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে । হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে* ॥ —বত্রিশ অক্ষর সমন্বিত এই ষোলটি নাম কলিযুগের সমস্ত কলুষ বিনষ্ট করার একমাত্র উপায়। সমস্ত *বেদে* বর্ণিত হয়েছে যে, অজ্ঞান সমুদ্র পার হওয়ার জন্য ভগবানের দিব্যনাম কীর্তন করা ব্যতীত আর কোন উপায় নেই। তেমনই *মুণ্ডক উপনিষদের* ভাষ্য প্রদানকালে শ্রীমধ্বাচার্য বলেছেন—

দ্বাপরীয়ৈর্জনৈর্বিষ্ণুঃ পঞ্চরাত্রৈশ্চ কেবলম্ ।
কলৌ তু নামমাত্রেণ পূজ্যতে ভগবান্ হরিঃ ॥

"দ্বাপর যুগে কৃষ্ণ বা বিষ্ণুকে *পাঞ্চরাত্রিকী* বিধি অনুসারে মহাড়ম্বরে পূজা করার মাধ্যমে সন্তুষ্ট করা যায়, কিন্তু কলিযুগে কেবলমাত্র নামকীর্তন করার মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির পূজা করা যায় এবং তাঁর সন্তুষ্টি বিধান করা যায়।" *ভক্তিসন্দর্ভে* (২৮৪) শ্রীল জীব গোস্বামী অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে ভগবানের নামকীর্তনের বর্ণনা করে বলেছেন—

ননু ভগবন্নামাত্মকা এব মন্ত্রাঃ তত্র বিশেষেণ নমঃশব্দাদ্যলঙ্কৃতাঃ শ্রীভগবতা শ্রীমদৃষিভিশ্চাহিতশক্তিবিশেষাঃ, শ্রীভগবতা সমমাত্মসম্বন্ধবিশেষপ্রতিপাদকাশ্চ তত্র কেবলানি শ্রীভগবন্নামান্যপি নিরপেক্ষাণ্যেব পরমপুরুষার্থফলপর্যন্তদানসমর্থানি ততো মন্ত্রেষু নামতোঽপ্যধিকসামর্থ্যে লব্ধে কথং দীক্ষাদ্যপেক্ষা? উচ্যতে—যদ্যপি স্বরূপতো নাস্তি, তথাপি প্রায়ঃ স্বভাবতো দেহাদিসম্বন্ধেন কদর্যশীলানাং বিক্ষিপ্তচিত্তানাং জনানাং তৎসঙ্কোচীকরণায় শ্রীমদৃষিপ্রভৃতিভিরত্রার্চনমার্গে ক্বচিৎ ক্বচিৎ কাচিৎ কাচিন্মর্যাদা স্থাপিতাস্তি ।

শ্রীল জীব গোস্বামী বলেছেন যে, সমস্ত বৈদিক মন্ত্রের সার হচ্ছে ভগবানের দিব্যনাম কীর্তন করা। সমস্ত মন্ত্র 'নম ওঁ' দিয়ে শুরু হয় এবং অবশেষে পরমেশ্বর ভগবানের নামকে সম্বোধন করা হয়। নারদ মুনির মতো মহান ঋষি এবং অন্যান্য ঋষিগণ কর্তৃক উচ্চারিত প্রতিটি মন্ত্রে ভগবানের পরম ইচ্ছার দ্বারা বিশেষ শক্তি নিহিত রয়েছে। মন্ত্রসমূহ ভগবানের সঙ্গে মন্ত্রোচ্চারণকারীর সম্বন্ধ প্রতিপন্ন করে।

মন্ত্রে যে ভগবানের অন্যভাবের অপেক্ষা রহিত নামসমূহ আছে, তা-ই পরম পুরুষার্থ পর্যন্ত দান করতে সমর্থ; তা হলে নাম থেকে যে মন্ত্র অধিক সামর্থ্য লাভ করছে না, নামকীর্তনকারীই সেই মন্ত্রে দীক্ষার অপেক্ষা কেন? তার উত্তরে বলা হয়েছে—যদিও নামকারীর স্বরূপত দীক্ষার অপেক্ষা নেই, তা হলেও প্রায়ই স্বাভাবিকভাবে বদ্ধ জীব মাত্রেরই পূর্ব-পূর্ব জন্মের সংস্কারবশত দেহ-গেহ আদি সম্বন্ধ থাকায় কদর্য স্বভাব ও চিত্তচাঞ্চল্য আদি হয়ে থাকে। অতএব সেই কদর্য স্বভাব ও চিত্তচাঞ্চল্য আদি সংকট মোচন করে দ্রুত শুদ্ধতা সম্পাদনের জন্য ভগবৎ-অর্চন আদি দরকার আছে। মন্দিরে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের আরাধনার ফলে জড় কলুষজাত চিত্তচাঞ্চল্য দূর হয়। তাই নারদ মুনি তাঁর *পাঞ্চরাত্রিকী-বিধিতে* এবং অন্যান্য মুনি-ঋষিরা উল্লেখ করেছেন যে, বদ্ধ জীব যেহেতু ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রতি আসক্ত, তাই ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের বাসনা দমন করে বিধিমার্গে মন্দিরে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের আরাধনা করা অত্যন্ত প্রয়োজন। শ্রীল রূপ গোস্বামী বর্ণনা করেছেন যে, মুক্ত পুরুষেরাই ভগবানের দিব্যনাম কীর্তন করতে পারেন, কিন্তু যাদের আমাদের দীক্ষা দিতে হবে তারা প্রায় সকলেই বদ্ধ জীব। তাই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, শাস্ত্রের বিধি-নিষেধগুলি অনুসরণ করে নিরপরাধে ভগবানের নামকীর্তন করতে হবে, কিন্তু তবুও পূর্বজন্মের বদভ্যাসের ফলে এই সমস্ত বিধি-নিষেধগুলি কখনও কখনও তারা লঙ্ঘন করে। তাই ভগবানের নাম করার সঙ্গে সঙ্গে বিধিমার্গে ভগবানের আরাধনা করাও অত্যন্ত প্রয়োজন।

শ্লোক ৭৭

এই আজ্ঞা পাঞা নাম লই অনুক্ষণ ।
নাম লৈতে লৈতে মোর ভ্রান্ত হৈল মন ॥ ৭৭ ॥

শ্লোকার্থ

"আমার গুরুদেবের কাছ থেকে এই আদেশ পেয়ে, আমি নিরন্তর ভগবানের দিব্যনাম কীর্তন করতে লাগলাম এবং এইভাবে নাম নিতে নিতে আমার মন বিভ্রান্ত হল।

শ্লোক ৭৮

ধৈর্য ধরিতে নারি, হৈলাম উন্মত্ত ।
হাসি, কান্দি, নাচি, গাই, যৈছে মদমত্ত ॥ ৭৮ ॥

শ্লোকার্থ

"এইভাবে ভগবানের নাম নিতে নিতে আমি নিজেকে আর স্থির রাখতে পারলাম না এবং আমি উন্মাদের মতো হাসতে লাগলাম, কাঁদতে লাগলাম, নাচতে লাগলাম এবং গান গাইতে লাগলাম।

শ্লোক ৭৯

তবে ধৈর্য ধরি' মনে করিলুঁ বিচার ।
কৃষ্ণনামে জ্ঞানাচ্ছন্ন হইল আমার ॥ ৭৯ ॥

শ্লোকার্থ

"তখন নিজেকে একটু সংযত করে আমি বিচার করতে লাগলাম যে, কৃষ্ণনাম কীর্তন করতে করতে আমার জ্ঞান আচ্ছন্ন হয়েছে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ইঙ্গিত করেছেন যে, কৃষ্ণনাম কীর্তন করার সময় আর ভগবৎ-তত্ত্ব নিয়ে দার্শনিক জল্পনা-কল্পনা করার প্রয়োজন হয় না, কারণ কীর্তনকারী আপনা থেকেই আনন্দে মগ্ন হন এবং সব রকম বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে উন্মাদের মতো কীর্তন করেন, নৃত্য করেন, হাসেন এবং কাঁদেন।

শ্লোক ৮০

পাগল হইলাঙ আমি, ধৈর্য নাহি মনে ।
এত চিন্তি' নিবেদিলুঁ গুরুর চরণে ॥ ৮০ ॥

শ্লোকার্থ

আমি দেখলাম যে, এইভাবে নামকীর্তন করার ফলে আমি পাগল হয়ে গিয়েছি, তখন আমি আমার গুরুদেবের চরণে সেই কথা নিবেদন করলাম।

তাৎপর্য

একজন আদর্শ আচার্যরূপে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আমাদের দেখিয়ে গিয়েছেন যে, গুরুর প্রতি শিষ্যের কি রকম আচরণ করা উচিত। কোন বিষয়ে তাঁর মনে যখন সন্দেহ জাগে, তখন তাঁর কর্তব্য হচ্ছে সেই সন্দেহ নিরসনের জন্য গুরুদেবের শরণাপন্ন হওয়া। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন যে, 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তন করতে করতে তিনি এক দিব্য উন্মাদনা অনুভব করেছিলেন, যা কেবল মুক্ত পুরুষদের পক্ষেই সম্ভব। কিন্তু সেই মুক্ত অবস্থাতেও কোন বিষয়ে তাঁর মনে কোন সন্দেহের উদয় হলে, তিনি সেই সম্বন্ধে তাঁর গুরুদেবকে নিবেদন করেছেন। এইভাবে মুক্ত অবস্থাতেও আমাদের মনে করা উচিত নয় যে, আমরা আমাদের গুরুদেব থেকে স্বতন্ত্র। পক্ষান্তরে পারমার্থিক জগতের প্রগতি সম্বন্ধে যখনই সন্দেহের উদয় হয়, তখন আমাদের কর্তব্য হচ্ছে গুরুদেবকে সেই কথা নিবেদন করা।

শ্লোক ৮১

কিবা মন্ত্র দিলা, গোসাঞি, কিবা তার বল ।
জপিতে জপিতে মন্ত্র করিল পাগল ॥ ৮১ ॥

শ্লোকার্থ

" 'হে প্রভু, আপনি আমাকে কি মন্ত্র দিয়েছেন? যে অদ্ভুত তার প্রভাব। সেই মন্ত্র জপ করতে করতে আমি পাগল হয়ে গেলাম।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর *শিক্ষাষ্টকে* প্রার্থনা করেছেন—

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্ ।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্বং গোবিন্দবিরহেণ মে ॥

"হে গোবিন্দ। তোমার বিরহে এক নিমেষকে আমার এক যুগ বলে মনে হচ্ছে। অবিরত ধারায় আমার চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরে পড়ছে এবং সমস্ত জগৎকে শূন্য বলে মনে হচ্ছে।" ভক্তের অভিলাষ হচ্ছে 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তন করার সময় তাঁর দু'চোখ দিয়ে যেন আনন্দাশ্রু ঝরে পড়ে, ভাবের আবেগে তাঁর কণ্ঠ রোধ হয়ে আসে এবং হৃদয় স্পন্দিত হয়। এইগুলি হচ্ছে ভগবানের দিব্যনাম কীর্তনের

লক্ষণ। গভীর আনন্দে তখন গোবিন্দের বিরহে সমস্ত জগৎ শূন্য বলে মনে হয়। এটিই হচ্ছে গোবিন্দের বিরহের অনুভূতির লক্ষণ। জড় জগতে আমরা সকলেই গোবিন্দের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিষয়ভোগে মগ্ন হয়ে পড়েছি। কেউ যখন চিন্ময় স্তরে প্রকৃতিস্থ হন, তখন তিনি গোবিন্দের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য আকুল হয়ে উঠেন এবং গোবিন্দের বিরহে সমস্ত জগৎকে তখন তাঁর শূন্য বলে মনে হয়।

শ্লোক ৮২

হাসায়, নাচায়, মোরে করায় ক্রন্দন।
এত শুনি' গুরু হাসি বলিলা বচন ॥ ৮২ ॥

শ্লোকার্থ

" 'দিব্যনাম কীর্তনের আনন্দ আমাকে হাসায়, নাচায় এবং ক্রন্দন করায়।' আমার এই কথা শুনে গুরুদেব হেসে বললেন—

তাৎপর্য

শিষ্য যখন পারমার্থিক জীবনে উন্নতি সাধন করে, তখন গুরুদেব অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে হাসেন এবং মনে করেন, "আমার শিষ্য কত সফল হয়েছে।" পিতা-মাতা যেমন তাঁদের শিশুসন্তানকে তার পায়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়াতে দেখে আনন্দের আতিশয্যে হাসেন, গুরুদেবও তেমনই শিষ্যের পারমার্থিক উন্নতিতে আনন্দ অনুভব করেন।

শ্লোক ৮৩

কৃষ্ণনাম-মহামন্ত্রের এই ত' স্বভাব।
যেই জপে, তার কৃষ্ণে উপজয়ে ভাব ॥ ৮৩ ॥

শ্লোকার্থ

" 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রের এটিই স্বভাব যে, যে-ই তা জপ করে, তারই তৎক্ষণাৎ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমময়ী ভক্তিভাবের উদয় হয়।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে—

অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ ॥

"আমি হচ্ছি সমস্ত চেতন এবং জড় জগতের উৎস। আমার থেকেই সব কিছু প্রকাশিত হয়। সেই তত্ত্ব পূর্ণরূপে অবগত হয়ে যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানী মানুষেরা ভক্তিযুক্ত হয়ে সর্বান্তঃকরণে আমার ভজনা করে" (*ভগবদ্গীতা* ১০/৮) এই শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, কেউ যখন 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' জপ করেন, তখন তাঁর 'ভাব' বা দিব্য আনন্দের অনুভূতি হয়। এই স্তর থেকে চিন্ময় উপলব্ধি শুরু হয়। ভগবৎ-প্রেম বিকাশের এটিই হচ্ছে প্রাথমিক স্তর। নবীন ভক্ত শ্রবণ, কীর্তন, ভক্তসঙ্গ এবং বিধি-নিষেধ অনুশীলন আদির মাধ্যমে ভগবদ্ভক্তি সাধন করতে শুরু করেন এবং তার ফলে তাঁর সমস্ত অনাকাঙ্ক্ষিত বদভ্যাসগুলি দূর হয়। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণে তাঁর রতি জন্মায়। তখন তিনি এক নিমেষের জন্যও শ্রীকৃষ্ণকে ভুলে থাকতে পারেন না। 'ভাব' হচ্ছে পারমার্থিক মার্গে প্রায় সাফল্য অর্জনের স্তর। ঐকান্তিকভাবে তত্ত্বজ্ঞান লাভেচ্ছু শিষ্য শ্রবণ করার মাধ্যমে গুরুদেবের কাছ থেকে ভগবানের দিব্যনাম প্রাপ্ত হন এবং তারপর দীক্ষা গ্রহণের পর তিনি গুরুদেবের দ্বারা বিধি-নিষেধগুলি অনুসরণ করেন। এইভাবে যখন যথাযথভাবে 'নাম-প্রভুর' সেবা করা হয়, তখন আপনা থেকেই নামের স্বাভাবিক ক্রিয়া শুরু হয় অর্থাৎ ভক্ত তখন নিরপরাধে নাম করার যোগ্যতা অর্জন করেন। এইভাবে যখন কেউ পূর্ণরূপে দিব্যনাম কীর্তন করার উপযুক্ত হন, তখন তিনি সারা পৃথিবী জুড়ে শিষ্য গ্রহণ করার যোগ্যতা অর্জন করেন এবং প্রকৃত জগদ্গুরুতে পরিণত হন। তখন তাঁর প্রভাবে সমস্ত পৃথিবী ভগবানের দিব্যনাম সমন্বিত 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তন করতে শুরু করে। এই ধরনের গুরুদেবের সমস্ত শিষ্য শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গভীর থেকে গভীরতরভাবে অনুরক্ত হন এবং এইভাবে তাঁদের ভক্তিমার্গে অগ্রসর হতে দেখে, তিনি কখনও কাঁদেন, কখনও হাসেন, কখনও নৃত্য করেন এবং কখনও কীর্তন করেন। শুদ্ধ ভক্তের শ্রীঅঙ্গে এই লক্ষণগুলি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়। আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের কৃষ্ণভক্তরা যখন কীর্তন করেন এবং নৃত্য করেন, তখন বিদেশীদের এইভাবে আনন্দে মগ্ন হয়ে নৃত্য-কীর্তন করতে দেখে ভারতবাসীরা পর্যন্ত আশ্চর্য হন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন যে, শুধু অভ্যাসের ফলেই যে এই স্তরে উন্নীত হওয়া যায় তা নয়,

বরং যিনি 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তন করেন, কোন রকম প্রচেষ্টা ছাড়াই তাঁর মধ্যে সমস্ত লক্ষণগুলি প্রকাশিত হয়।

'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রে'র চিন্ময় স্বভাব সম্বন্ধে অজ্ঞ কিছু মূর্খলোক আমাদের উচ্চৈঃস্বরে কীর্তনে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তনের প্রভাবে যিনি যথার্থ মহাত্মায় পরিণত হয়েছেন, তাঁর সান্নিধ্যে অন্যরাও 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তন করতে শুরু করে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন, 'কৃষ্ণ-শক্তি বিনা নহে তার প্রবর্তন'—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ শক্তি ছাড়া 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রে'র মহিমা প্রচার করা যায় না। ভক্তদের 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' প্রচারের ফলেই সমস্ত পৃথিবীর মানুষ ভগবানের দিব্য নামের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করার সুযোগ পাচ্ছে। ভগবানের দিব্যনাম শ্রবণ করার সময়, কীর্তন করার সময় এবং নৃত্য করার সময়, আপনা থেকেই পরমেশ্বর ভগবানের কথা মনে পড়ে যায়, এবং যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণের নামের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, তাই কীর্তনকারী তখন শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যুক্ত হন। এইভাবে ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়ে ভগবদ্ভক্ত ভগবানের সেবা করার স্বাভাবিক বৃত্তিতে যুক্ত হন। নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের সেবা করার এই বৃত্তিকে বলা হয় 'ভাব' এবং এই স্তরে তিনি নিরন্তর বিভিন্নভাবে শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করেন। যিনি এই ভাবের স্তর প্রাপ্ত হয়েছেন, তিনি আর মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ থাকেন না। অন্য সমস্ত চিন্ময় লক্ষণগুলি, যথা—রোমাঞ্চ, কম্প, অশ্রু ইত্যাদি এই ভাবের স্তরে যুক্ত হয় এবং ভগবদ্ভক্ত ধীরে ধীরে কৃষ্ণপ্রেম লাভ করেন।

শ্রীকৃষ্ণের দিব্য নামকে বলা হয় 'মহামন্ত্র'। *নারদ-পঞ্চরাত্রে* বর্ণিত অন্য সমস্ত মন্ত্রগুলিকে কেবল 'মন্ত্র' বলা হয়, কিন্তু ভগবানের দিব্যনাম সমন্বিত এই মন্ত্রকে বলা হয় 'মহামন্ত্র'।

শ্লোক ৮৪

কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমা—পরম পুরুষার্থ।
যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ ॥ ৮৪ ॥

শ্লোকার্থ

" 'ধর্ম, অর্থনৈতিক উন্নতি, কামভোগ এবং মুক্তি—এই চারটি হল চতুর্বর্গ, কিন্তু পঞ্চম পুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেমের তুলনায় এই চতুর্বর্গ পথের পাশে পড়ে থাকা একটি তৃণের মতোই অর্থহীন হয়ে যায়।

তাৎপর্য

'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তন করার সময় অর্থনৈতিক উন্নতি, ধর্ম, কাম ভোগ এবং চরমে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি—এই জড়-জাগতিক উন্নতি সাধনের বাসনাগুলি করা উচিত নয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলে গিয়েছেন যে, জীবনের চরম প্রাপ্তি হচ্ছে কৃষ্ণপ্রেম (*প্রেমা পুমর্থো মহান্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদম্*)। ভগবৎ-প্রেমের সঙ্গে আমরা যখন ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষের তুলনা করি, তখন আমরা বুঝতে পারি যে, এগুলি 'বুভুক্ষু' বা জড় জগৎ ভোগ করার আকাঙ্ক্ষী এবং 'মুমুক্ষু' বা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষী এদের কাম্য হতে পারে, কিন্তু ভগবৎ-প্রেমের আগের স্তরের 'ভাব' প্রাপ্ত হয়েছেন যে সমস্ত শুদ্ধ ভক্ত, তাঁদের কাছে এগুলি অত্যন্ত নগণ্য।

ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ হচ্ছে জড়-জাগতিক স্তরে ধর্মের চারটি পর্যায়। তাই *শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রথমেই ঘোষণা করা হয়েছে, *ধর্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র*—এই চারটি জড় আকাঙ্ক্ষা সমন্বিত ছল ধর্ম *শ্রীমদ্ভাগবতে* সম্পূর্ণভাবে বর্জন করা হয়েছে, কারণ *শ্রীমদ্ভাগবতে* কেবল জীবের সুপ্ত ভগবৎ-প্রেমের পুনর্জাগরণের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। *ভগবদ্গীতা* হচ্ছে *শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রাথমিক পাঠ, এবং তাই তার শেষ কথা হচ্ছে, *সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*—"সব রকমের ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও।" (*ভগবদ্গীতা* ১৮/৬৬) এই পন্থা অবলম্বন করতে হলে ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষের সমস্ত ধারণা ত্যাগ করে, পূর্ণরূপে ভগবানের সেবায় যুক্ত হতে হবে। ভগবানের সেবা এই চতুর্বর্গের অতীত। ভগবানের সেবা করার প্রবণতা জীবাত্মার স্বাভাবিক বৃত্তি, তাই তা জীবাত্মা এবং ভগবানের মতোই নিত্য। এই নিত্যত্বকে বলা হয় 'সনাতন'। কেউ যখন ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় প্রতিষ্ঠিত হন, তখন বুঝতে হবে যে, তিনি তাঁর জীবনের চরম লক্ষ্য খুঁজে পেতে সক্ষম হয়েছেন। তখন সব কিছুই ভগবানের দিব্য নামের প্রভাবে আপনা থেকেই সম্পাদিত হয় এবং ভক্ত স্বাভাবিকভাবেই পারমার্থিক পথে অগ্রসর হতে থাকেন।

শ্লোক ৮৫

পঞ্চম পুরুষার্থ—প্রেমানন্দামৃতসিন্ধু।
মোক্ষাদি আনন্দ যার নহে এক বিন্দু ॥ ৮৫ ॥

শ্লোকার্থ

" 'কৃষ্ণপ্রেমের আনন্দ একটি অমৃতের সমুদ্রের মতো, তার তুলনায় ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষের আনন্দ এক বিন্দুর মতোও নয়।

শ্লোক ৮৬

কৃষ্ণনামের ফল—'প্রেমা', সর্বশাস্ত্রে কয় ।
ভাগ্যে সেই প্রেমা তোমায় করিল উদয় ॥ ৮৬ ॥

শ্লোকার্থ

" 'সমস্ত শাস্ত্রে বর্ণনা করা হয়েছে যে, শুদ্ধ ভগবৎ-প্রেম পুনর্জাগরিত করা প্রতিটি জীবের কর্তব্য। তোমার চিত্তে সেই প্রেমের উদয় হয়েছে, তাই তুমি অত্যন্ত ভাগ্যবান।

শ্লোক ৮৭

প্রেমার স্বভাবে করে চিত্ত-তনু ক্ষোভ ।
কৃষ্ণের চরণ-প্রাপ্ত্যে উপজায় লোভ ॥ ৮৭ ॥

শ্লোকার্থ

" 'কৃষ্ণপ্রেমের স্বভাব হচ্ছে দেহ ও মনে চিন্ময় ক্ষোভের উদ্রেক করে, এবং শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দের আশ্রয় লাভের প্রতি অধিক থেকে অধিকতর লোভের সৃষ্টি করা!

শ্লোক ৮৮

প্রেমার স্বভাবে ভক্ত হাসে, কান্দে, গায় ।
উন্মত্ত হইয়া নাচে, ইতি-উতি ধায় ॥ ৮৮ ॥

শ্লোকার্থ

" 'কারও চিত্তে যখন ভগবৎ-প্রেমের উদয় হয়, তখন তিনি স্বাভাবিকভাবে কখনও ক্রন্দন করেন, কখনও হাসেন, কখনও গান করেন এবং কখনও উন্মাদের মতো এদিক ওদিক ছোটাছুটি করেন।

তাৎপর্য

এই সম্পর্কে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী বলেছেন যে, ভগবদ্ভক্তিবিহীন মানুষেরা কখনও কখনও প্রেমের এই সমস্ত বাহ্যিক লক্ষণগুলি প্রদর্শন করে কৃত্রিমভাবে তারা হাসে, কাঁদে এবং উন্মাদের মতো নৃত্য করে, কিন্তু তাতে তারা কৃষ্ণভক্তির পথে উন্নতি সাধন করে না। পক্ষান্তরে, স্বাভাবিকভাবেই যখন দেহে ভগবৎ-প্রেমের লক্ষণ প্রকাশিত হয়, তখন এই সমস্ত কৃত্রিম লোকদেখানো বিকারগুলি পরিত্যাগ করতে হয়। প্রকৃতপক্ষে হাস্য, ক্রন্দন এবং নৃত্য আদির মাধ্যমে যে প্রকৃত আনন্দ অনুভূত হয়, তা হচ্ছে কৃষ্ণভক্তির মার্গে যথাযথভাবে অগ্রসর হওয়ার লক্ষণ। স্বতঃস্ফূর্তভাবে যাঁরা নিরন্তর ভগবানের সেবায় যুক্ত, তাঁরাই এই স্তর প্রাপ্ত হন। অন্তরে ভগবদ্ভক্তির বিকাশ না করে যারা বাইরে কৃত্রিমভাবে এই সমস্ত লক্ষণগুলি প্রকাশ করে, তারা মানব-সমাজে কেবল উৎপাতেরই সৃষ্টি করে।

শ্লোক ৮৯-৯০

স্বেদ, কম্প, রোমাঞ্চাশ্রু, গদ্‌গদ, বৈবর্ণ্য ।
উন্মাদ, বিষাদ, ধৈর্য, গর্ব, হর্ষ, দৈন্য ॥ ৮৯ ॥
এত ভাবে প্রেমা ভক্তগণেরে নাচায় ।
কৃষ্ণের আনন্দামৃতসাগরে ভাসায় ॥ ৯০ ॥

শ্লোকার্থ

" 'স্বেদ, কম্প, রোমাঞ্চ, অশ্রু, গদ্‌গদ স্বর, বৈবর্ণ্য, উন্মাদনা, বিষাদ, ধৈর্য, গর্ব, হর্ষ এবং দৈন্য—এইগুলি হচ্ছে ভগবৎ-প্রেমের কয়েকটি স্বাভাবিক লক্ষণ, যা 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তন করার সময় ভক্তকে নাচায় এবং আনন্দামৃতের সমুদ্রে ভাসায়।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামী তাঁর *প্রীতি সন্দর্ভে* (শ্লোক ৬৬) ভগবৎ-প্রেমের এই অবস্থার বিশ্লেষণ করে লিখেছেন—*ভগবৎপ্রীতিরূপা বৃত্তির্মায়াদিময়ী ন ভবতি; কিন্তু স্বরূপশক্ত্যানন্দরূপা, যদানন্দপরাধীনঃ শ্রীভগবানপীতি।* তেমনই, একোনসপ্ততিতম শ্লোকে তিনি আরও বলেছেন—*তদেবং প্রীতের্লক্ষণং চিত্তদ্রবতস্য চ রোমহর্ষাদিকম্।*

কথঞ্চিজ্জাতেঽপি চিদ্দ্রবে রোমহর্ষাদিকে বা ন চেদাশয়শুদ্ধিস্তদাপি ন ভক্তেঃ সম্যগাবির্ভাব ইতি জ্ঞাপিতম্। আশয়শুদ্ধির্নাম চান্যতাৎপর্যপরিত্যাগঃ প্রীতিতাৎপর্যং চ। অতএবানিমিত্তা স্বাভাবিকী চেতি তদ্বিশেষণম্। ভগবৎ-প্রেম এই জড় জগতের বস্তু নয়, কারণ তা হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের অন্তরঙ্গা আনন্দশক্তি। যেহেতু পরমেশ্বর ভগবানও তাঁর আনন্দ প্রদায়িনী শক্তির পরাধীন, তাই কেউ যখন এই ভগবৎ-প্রেমানন্দের সংস্পর্শে আসেন, তখন তাঁর চিত্ত দ্রবীভূত হয়, এবং রোমাঞ্চ আদি লক্ষণ প্রকাশিত হয়। কখনও কখনও কোন মানুষকে এইভাবে দ্রবীভূত হতে এবং এই সমস্ত লক্ষণগুলি প্রকাশ করতে দেখা যায়। অথচ তাদের ব্যবহারের ত্রুটি থাকে। তখন বুঝতে হবে যে, তিনি পূর্ণরূপে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির স্তরে অধিষ্ঠিত হতে পারেননি। যদি কোন ভক্তকে ভগবৎ-প্রেমানন্দে নৃত্য এবং ক্রন্দন করা সত্ত্বেও জড় বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট থাকতে দেখা যায়, তখন বুঝতে হবে যে, তিনি শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি অর্জন করতে পারেননি। শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির স্তরকে বলা হয় *আশ্রয়-শুদ্ধি*। যিনি *আশ্রয়-শুদ্ধির* স্তরে অধিষ্ঠিত হয়েছেন, তিনি সব রকম জড় ভোগের প্রতি বিরক্ত হন এবং ভগবৎ-প্রেমানন্দে সম্পূর্ণরূপে মগ্ন হন। অর্থাৎ সব রকম জড় উদ্দেশ্য রহিত হয়ে, শুদ্ধ চিন্ময় স্তরে যখন ভগবদ্ভক্তি সম্পাদিত হয়, তখন আশ্রয়-শুদ্ধির লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়। এইগুলি হচ্ছে ভগবদ্ভক্তির বৈশিষ্ট্য। সেই সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতে* বলা হয়েছে—

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

"পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি অহৈতুকী এবং অপ্রতিহতা ভক্তিই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম, কারণ তার ফলে আত্মা সর্বতোভাবে প্রসন্ন হয়।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১/২/৬)।

শ্লোক ৯১

ভাল হৈল, পাইলে তুমি পরমপুরুষার্থ।
তোমার প্রেমেতে আমি হৈলাঙ কৃতার্থ ॥ ৯১ ॥

শ্লোকার্থ

" 'হে বৎস, তুমি যে পরম পুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেম লাভ করেছ তাতে খুব ভাল হয়েছে। তার ফলে আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি এবং আমি কৃতার্থ হয়েছি।

তাৎপর্য

শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, গুরুদেব যদি অন্তত একজনকেও শুদ্ধ ভক্তে পরিণত করতে পারেন, তা হলে তাঁর উদ্দেশ্য সফল হয়। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর সব সময় বলতেন, "এই সমস্ত মঠ-মন্দির এবং সম্পত্তির পরিবর্তে যদি আমি অন্তত একজন মানুষকেও শুদ্ধ ভক্তে পরিণত করতে পারি, তা হলে আমার উদ্দেশ্য সফল হবে।" কৃষ্ণ-তত্ত্ববিজ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করা অত্যন্ত কঠিন। সুতরাং কৃষ্ণপ্রেম লাভ করা যে কত দুষ্কর, তা আমরা কল্পনাও করতে পারি না। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং গুরুদেবের কৃপায় যদি একজন শিষ্যও শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি লাভ করেন, তা হলে গুরুদেব অত্যন্ত প্রীত হন। শিষ্য টাকা-পয়সা নিয়ে এলেও গুরুদেব খুশি হন না, কিন্তু তিনি যখন দেখেন যে, শিষ্য শাস্ত্রের বিধি-নিষেধগুলি অনুশীলন করে পারমার্থিক পথে উন্নতি সাধন করছে, তখন তিনি অত্যন্ত খুশি হন এবং তাঁর কাছে নিজেকে কৃতজ্ঞ বলে মনে করেন।

শ্লোক ৯২

নাচ, গাও, ভক্তসঙ্গে কর সংকীর্তন।
কৃষ্ণনাম উপদেশি' তার' সর্বজন ॥ ৯২ ॥

শ্লোকার্থ

" 'বৎস, নাচ, গাও এবং ভক্তসঙ্গে সংকীর্তন কর। তা ছাড়া তুমি কৃষ্ণনাম সংকীর্তন করার মহিমা সম্পর্কে সকলকে উপদেশ দাও। কারণ এইভাবে তুমি সমস্ত অধঃপতিত জীবদের উদ্ধার করতে পারবে।'

তাৎপর্য

গুরুদেব চান যে, তাঁর শিষ্যরা কেবল বিধি-নিষেধগুলি পালন করে নৃত্য-কীর্তন করুক তা-ই নয়, তিনি চান তারা যেন জীবকে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত করার জন্য সংকীর্তন আন্দোলন প্রচার করে, কারণ কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের ভিত্তি হচ্ছে নিজে ভগবদ্ভক্তি আচরণ করে অপরের মঙ্গলের জন্য তা প্রচার করা। ঈশ্বরের দুই প্রকার ঐকান্তিক ভক্ত রয়েছেন—'গোষ্ঠ্যানন্দী' এবং 'ভজনানন্দী'। যাঁরা কেবল নিজের জন্য ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করে সন্তুষ্ট থাকেন, তাঁদের বলা হয় ভজনানন্দী, আর যাঁরা কেবল ভক্তিমার্গে নিজেদের সিদ্ধিলাভ করেই সন্তুষ্ট নন, পক্ষান্তরে অপরকেও ভগবানের দিব্যনাম কীর্তন করার মাধ্যমে পারমার্থিক পথে

অগ্রসর হতে দেখতে চান, তাঁদের বলা হয় 'গোষ্ঠ্যানন্দী'। গোষ্ঠ্যানন্দীর একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত হচ্ছেন প্রহ্লাদ মহারাজ। ভগবান শ্রীনৃসিংহদেব যখন বর প্রার্থনা করতে বললেন, তখন প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছিলেন—

নৈবোদ্বিজে পর দুরত্যয়বৈতরণ্যা-
ত্ত্বদ্বীর্যগায়নমহামৃতমগ্নচিত্তঃ ।
শোচে ততো বিমুখচেতস ইন্দ্রিয়ার্থ
মায়াসুখায় ভরমুদ্বহতো বিমূঢ়ান্ ॥

"হে ভগবান, আমার নিজের কোন সমস্যা নেই। আমি আপনার কাছ থেকে কোন বর চাই না, কারণ আপনার দিব্যনাম কীর্তন করেই আমি সম্পূর্ণভাবে সন্তুষ্ট। আমার পক্ষে এই যথেষ্ট, কারণ, যখনই আমি আপনার নাম কীর্তন করি, তখনই আমি আনন্দসাগরে মগ্ন হই। আমার কেবল তাদের জন্যই অনুশোচনা হয়, যারা আপনার প্রতি ভক্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছে। জড় সুখভোগের জন্য তারা জড়-জাগতিক কার্যকলাপে লিপ্ত হয়ে নানাভাবে দুঃখকষ্ট ভোগ করছে। ভগবানের প্রতি আসক্তি রহিত হয়ে, ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের আশায় দিন-রাত কঠোর পরিশ্রম করে তাদের জীবনের অপচয় করছে। আমি কেবল তাদেরই জন্য অনুশোচনা করি এবং মায়ার বন্ধন থেকে তাদের মুক্ত করার জন্য নানা রকম পরিকল্পনা করি" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৭/৯/৪৩)।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাঁর *অনুভাষ্যে* বিশ্লেষণ করেছেন, "যে মানুষ তাঁর ঐকান্তিক সেবার দ্বারা গুরুদেবের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন, তিনি সমগোত্রীয় কৃষ্ণভক্তদের সঙ্গে নৃত্য এবং কীর্তন করতে ভালবাসেন। গুরুদেব এই ধরনের শিষ্যকে সমস্ত পৃথিবীর পতিত জীবদের উদ্ধার করার দায়িত্ব দান করেন। যাঁরা ভক্তিমার্গে উন্নতি সাধন করেননি, তাঁরাই কেবল নির্জন স্থানে 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' জপ করতে চান।" শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের ভাষায়, তা হচ্ছে এক প্রকারের প্রবঞ্চনা, কারণ তাঁরা হরিদাস ঠাকুরের মতো অতি উন্নত ভক্তের কার্যকলাপের অনুকরণ করতে চান। এইভাবে অতি উন্নত ধরনের ভক্তের আচরণ অনুকরণের চেষ্টা করা উচিত নয়। পক্ষান্তরে, সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে সারা পৃথিবী জুড়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করা। তা হলেই পারমার্থিক পথে সাফল্য অর্জন করা যায়। যাঁরা প্রচারকার্যে দক্ষ নন, তাঁরা অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ করে নির্জন স্থানে ভজন করতে পারেন, কিন্তু যিনি ভক্তিমার্গে যথার্থই উন্নত, তাঁর কর্তব্য হচ্ছে ভগবদ্ভক্তিবিহীন মানুষদের কাছে ভগবানের মহিমা প্রচার করে, তাদেরকেও

ভগবদ্ভক্তির অমৃত ও রস আস্বাদন করানো। ভক্ত অভক্তদের সঙ্গদান করেন, কিন্তু তাদের দ্বারা কখনও প্রভাবিত হন না। এইভাবে শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ প্রভাবে ভগবদ্ভক্তিহীন জীবেরা ভগবানের ভক্তে পরিণত হওয়ার সুযোগ পান। এই সম্পর্কে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর *শ্রীমদ্ভাগবতের* (১০/৩৩/৩১) *নৈতৎ সমাচরেজ্জাতুমনসাপি হ্যনীশ্বরঃ* এবং *ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর* নিম্নলিখিত শ্লোকটি আলোচনা করতে উপদেশ দিয়েছেন—

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥

(*ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* ১/২/২৫৫)

মহাপুরুষদের কার্যকলাপের অনুকরণ করা উচিত নয়। জড় সুখভোগের প্রতি অনাসক্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের সেবার জন্য সব কিছু গ্রহণ করা উচিত।

শ্লোক ৯৩

এত বলি' এক শ্লোক শিখাইল মোরে ।
ভাগবতের সার এই বলে বারে বারে ॥ ৯৩ ॥

শ্লোকার্থ

"এই কথা বলে, আমার গুরুদেব শ্রীমদ্ভাগবতের একটি শ্লোক আমায় শিখিয়েছিলেন এবং বারংবার তিনি আমাকে বলেছিলেন যে, এটি হচ্ছে শ্রীমদ্ভাগবতের সার।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতের (১১/২/৪০) এই শ্লোকটি বসুদেবকে ভাগবত-ধর্ম সম্বন্ধে শিক্ষা প্রদান করার সময় নারদ মুনির উক্তি। বসুদেব ইতিমধ্যেই ভাগবত-ধর্মের ফল প্রাপ্ত হয়েছিলেন, কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। কিন্তু তবুও অন্যদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি ভাগবত-ধর্ম সম্বন্ধে নারদ মুনির কাছ থেকে শুনতে চেয়েছিলেন। এটিই হচ্ছে মহান ভক্তের বিনীত মনোভাব।

শ্লোক ৯৪

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥ ৯৪ ॥

শব্দার্থ

এবংব্রতঃ—এইভাবে যখন কেউ নৃত্য-কীর্তনে ব্রতপরায়ণ হন; স্ব—নিজে; প্রিয়—অত্যন্ত প্রিয়; নাম—ভগবানের দিব্যনাম; কীর্ত্যা—কীর্তন করে; জাত—এইভাবে বিকশিত হয়; অনুরাগঃ—অনুরাগ; দ্রুত-চিত্তঃ—অত্যন্ত আগ্রহভরে; উচ্চৈঃ—জোরে জোরে; হসতি—হাসে; অথো—ও; রোদিতি—ক্রন্দন করে; রৌতি—উত্তেজিত হয়; গায়তি—গান করে; উন্মাদবৎ—উন্মাদের মতো; নৃত্যতি—নৃত্য করে; লোক-বাহ্যঃ—কে কি বলে তার অপেক্ষা না করে।

অনুবাদ

" 'কেউ যখন ভক্তিমার্গে যথার্থ উন্নতি সাধন করে এবং তার অতি প্রিয় ভগবানের দিব্যনাম কীর্তন করে আনন্দমগ্ন হন, তখন তিনি অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উচ্চৈঃ স্বরে ভগবানের নাম কীর্তন করেন। তিনি কখনও হাসেন, কখনও কাঁদেন এবং কখনও উন্মাদের মতো নৃত্য করেন। বাইরের লোকেরা কে কি বলে সেই সম্বন্ধে তাঁর কোন জ্ঞান থাকে না।'

শ্লোক ৯৫-৯৬

এই তাঁর বাক্যে আমি দৃঢ় বিশ্বাস ধরি' ।
নিরন্তর কৃষ্ণনাম সংকীর্তন করি ॥ ৯৫ ॥
সেই কৃষ্ণনাম কভু গাওয়ায়, নাচায় ।
গাহি, নাচি নাহি আমি আপন-ইচ্ছায় ॥ ৯৬ ॥

শ্লোকার্থ

"আমার গুরুদেবের এই কথায় সুদৃঢ় বিশ্বাস করে, আমি নিরন্তর কৃষ্ণনাম কীর্তন করি। কৃষ্ণনাম কখনও আমাকে গাওয়ায় এবং নাচায়, তাই আমি নাচি এবং

গান করি। আমি নিজের থেকেই তা করি না, নামের প্রভাবে আপনা থেকেই তা হয়ে থাকে।

তাৎপর্য

যে মানুষ গুরুদেবের বাক্যে আস্থা না রেখে স্বাধীনভাবে কার্য করে, সে কখনও ভগবানের দিব্যনাম কীর্তন করতে পারে না। *বেদে* বলা হয়েছে—

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥

"পরমেশ্বর ভগবান এবং গুরুদেবের বাণীতে যাঁর পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে, সেই মহাত্মার কাছেই বৈদিক তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশিত হয়।" এই বৈদিক নির্দেশটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর ব্যক্তিগত আচরণের দ্বারা এই নির্দেশের সমর্থন করে গিয়েছেন। তাঁর গুরুদেবের বাক্যে বিশ্বাস করে তিনি সংকীর্তন আন্দোলনের সূচনা করেছেন, ঠিক যেমন আজকের এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন শুরু হয়েছে আমাদের গুরু মহারাজের বাণীর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাসের প্রভাবে। তিনি চেয়েছিলেন আমরা যেন ভগবানের বাণী প্রচার করি, এবং তাঁর সেই নির্দেশের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে আমি চেষ্টা করেছিলাম কোন না কোনভাবে তাঁর সেই নির্দেশ পালন করতে এবং আজ এই আন্দোলন সারা পৃথিবী জুড়ে সাফল্য লাভ করেছে। তাই শ্রীগুরুদেব এবং পরমেশ্বর ভগবানের বাণীতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস পোষণ করাই হচ্ছে সফল হওয়ার গোপন রহস্য। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কখনও তাঁর গুরুদেবের নির্দেশ অমান্য করেননি এবং সংকীর্তন আন্দোলনের প্রচার বন্ধ করেননি। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী এই জগৎ থেকে বিদায় নেওয়ার সময়, তাঁর সমস্ত শিষ্যদের সংঘবদ্ধভাবে সমস্ত পৃথিবী জুড়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে কিছু স্বার্থান্বেষী মূর্খ শিষ্য তাঁর সেই নির্দেশ অমান্য করে। তারা সকলেই চেয়েছিল প্রতিষ্ঠানের নেতা হতে এবং তারা তাদের গুরুদেবের আদেশ অমান্য করে আদালতে মামলা মোকদ্দমা শুরু করেছিল, তার ফলে প্রচার বন্ধ হয়ে যায় এবং প্রতিষ্ঠানটি ভেঙ্গে পড়ে। এটি অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এবং তা নিয়ে আলোচনা করতে অন্তরে আমি প্রচণ্ড বেদনা অনুভব করি, কিন্তু তবুও এই সত্য প্রকাশ করতে আমি বাধ্য হই যাতে ভবিষ্যতে আমরা সেই ভুল না করি। আমরা আমাদের গুরু মহারাজের বাক্যে সুদৃঢ় বিশ্বাস করে অত্যন্ত বিনীতভাবে এই আন্দোলন শুরু করেছিলাম, তখন আমরা ছিলাম অত্যন্ত অসহায়—কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে এই আন্দোলন আজ সফল হয়েছে।

আমাদের বুঝতে হবে যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কীর্তন এবং নৃত্য সম্পাদিত হয়েছিল চিৎ-জগতের হ্লাদিনী শক্তির প্রভাবে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভগবানের দিব্য নামকে জড় শব্দতরঙ্গ বলে কখনই মনে করেননি। এমন কি কোন শুদ্ধ ভক্তও 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তনকে জড় সঙ্গীত বলে মনে করেন না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কখনও দিব্য নামের প্রভু হওয়ার চেষ্টা করেননি, পক্ষান্তরে তিনি শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন কিভাবে ভগবানের দিব্য নামের সেবক হতে হয়। যদি কেউ লোক দেখাবার জন্য ভগবানের দিব্যনাম কীর্তন করে, তা হলে তার পিত্ত বৃদ্ধি হতে পারে কিন্তু সে কৃষ্ণপ্রেম লাভ করতে পারবে না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ঐকান্তিক বিনয়ের সঙ্গে বলেছিলেন, "আমি অত্যন্ত মূর্খ এবং ভাল-মন্দ বিচার করার জ্ঞান আমার নেই। *বেদান্ত-সূত্রের* প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করার জন্য আমি কখনও শঙ্কর-সম্প্রদায় বা মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের ব্যাখ্যা অনুসরণ করিনি। মায়াবাদী দার্শনিকদের যুক্তিহীন তর্কের প্রতি আমি অত্যন্ত ভীত, তাই তাদের *বেদান্ত-সূত্রের* ব্যাখ্যায় কোন প্রামাণিকতা রয়েছে বলে আমি মনে করি না। আমি ঐকান্তিকভাবে বিশ্বাস করি যে, কেবল ভগবানের দিব্যনাম কীর্তন করার ফলে জড় জগতের সমস্ত ভ্রান্ত ধারণার অবসান হয়। আমি বিশ্বাস করি, কেবলমাত্র ভগবানের দিব্যনাম কীর্তন করার ফলে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় লাভ করা যায়। কলহের যুগ এই কলিযুগে, ভগবানের নাম কীর্তনই হচ্ছে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার একমাত্র উপায়।"

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আরও বলেছিলেন, 'ভগবানের নাম কীর্তনের ফলে আমি উন্মাদের মতো হয়ে গিয়েছি। কিন্তু আমার গুরুদেবের কাছে অনুসন্ধানের পর জানতে পেরেছি যে, জড়-জাগতিক সুখভোগের আশায় ধর্ম-অনুশীলন (*ধর্ম*), অর্থনৈতিক উন্নতি (*অর্থ*), ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ (*কাম*) এবং জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি (*মোক্ষ*), এই চতুর্বর্গ লাভের প্রচেষ্টা না করে, ভগবৎ-প্রেমের বিকাশ করাই হচ্ছে জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য। চতুর্বর্গের ঊর্ধ্বে তা হচ্ছে পঞ্চম পুরুষার্থ। যিনি এই ভগবৎ-প্রেম লাভ করেছেন তিনি লোকে কি বলে না বলে তার অপেক্ষা না করে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে নামকীর্তন করেন।" জীবনের এই অবস্থাকে বলা হয় *ভগবৎ-জীবন* বা ভক্ত-জীবন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আরও বলেছিলেন, "লোক দেখানোর জন্য আমি নৃত্য-কীর্তন করি না। গুরুদেবের বাণীতে দৃঢ় বিশ্বাস করে আমি নৃত্য-কীর্তন করি। মায়াবাদী দার্শনিকেরা যদিও এই নৃত্য-কীর্তন পছন্দ করেন না, কিন্তু তবুও গুরুদেবের বাক্যে দৃঢ় নিষ্ঠা সহকারে আমি তা করে যাই। অতএব এই নৃত্য-কীর্তনে আমার কোন কৃতিত্ব নেই, কারণ পরমেশ্বর ভগবানের কৃপার প্রভাবে তা আপনা থেকেই সম্পাদিত হচ্ছে।"

শ্লোক ৯৭

কৃষ্ণনামে যে আনন্দসিন্ধু-আস্বাদন ।
ব্রহ্মানন্দ তার আগে খাতোদক-সম ॥ ৯৭ ॥

শ্লোকার্থ

" 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার ফলে যে আনন্দামৃত-সিন্ধু আস্বাদন করা যায়, তার তুলনায় ব্রহ্মানন্দ হচ্ছে অগভীর খাদের জলের মতো।

তাৎপর্য

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে বর্ণনা করা হয়েছে—

ব্রহ্মানন্দো ভবেদেষ চেৎ পরার্দ্ধগুণীকৃতঃ ।
নৈতি ভক্তিসুখাম্ভোধেঃ পরমাণু তুলামপি ॥

"ব্রহ্মানন্দ অর্থাৎ নির্বিশেষ ব্রহ্মকে উপলব্ধি করার ফলে যে চিন্ময় আনন্দ অনুভব হয়, তা যদি কেবল বর্ধিত করা যায়, তা হলেও তা ভগবদ্ভক্তির এক কণার সমতুল্য হতে পারে না।" (*ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* ১/১/৩৮)

শ্লোক ৯৮

ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদ-বিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য মে ।
সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রাহ্মাণ্যপি জগদ্গুরো ॥ ৯৮ ॥

শব্দার্থ

ত্বৎ—আপনার; **সাক্ষাৎ**—মিলন; **করণ**—এই ধরনের ক্রিয়া; **আহ্লাদ**—আনন্দ; **বিশুদ্ধ**—বিশুদ্ধ; **অব্ধি**—সমুদ্র; **স্থিতস্য**—অবস্থিত হয়ে; **মে**—আমার দ্বারা; **সুখানি**—সুখ; **গোষ্পদায়ন্তে**—বাছুরের খুরের দ্বারা তৈরি ছোট গর্ত; **ব্রাহ্মাণি**—নির্বিশেষ ব্রহ্ম উপলব্ধি জাত আনন্দ; **অপি**—ও; **জগৎ-গুরো**—হে জগদ্গুরু।

অনুবাদ

" 'হে জগদ্গুরু ভগবান! প্রত্যক্ষভাবে আপনার দর্শন লাভ করে, আমি আনন্দের সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়েছি। তার ফলে এখন আমি বুঝতে পারছি যে, এই আনন্দ-সমুদ্রের তুলনা নেই। ব্রহ্মানন্দের তথাকথিত সুখ গো-বাছুরের পায়ের খুরের ছাপে তৈরি ছোট গর্তের জলের মতো।' "

তাৎপর্য

শুদ্ধ ভগবৎ-প্রেমে যে দিব্য আনন্দ আস্বাদন করা যায়, তা সমুদ্রের মতো, আর তা যদি নির্বিশেষ ব্রহ্মোপলব্ধি প্রসূত হয়, তা হলে তা ঠিক গোষ্পদের জলের মতো। এই শ্লোকটি *হরিভক্তি-সুধোদয়* (১৪/৩৬) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ৯৯

প্রভুর মিষ্টবাক্য শুনি' সন্ন্যাসীর গণ।
চিত্ত ফিরি' গেল, কহে মধুর বচন ॥ ৯৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কথা শুনে সমস্ত মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা অভিভূত হলেন। তাঁদের চিত্তের পরিবর্তন হল এবং তাঁরা তখন মধুর স্বরে বললেন—

তাৎপর্য

বারাণসীতে মায়াবাদীরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সমালোচনা করেছিলেন, কারণ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভগবানের দিব্যনাম কীর্তন করছিলেন এবং তাঁরা তা পছন্দ করেননি। সংকীর্তন আন্দোলনে বিরোধিতা করার জন্য আসুরিক বৃত্তি চিরকালই রয়েছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সময় যা ছিল, তেমনই তারও বহু আগে, প্রহ্লাদ মহারাজের সময়েও তা ছিল। প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর পিতার বিরোধিতা সত্ত্বেও সংকীর্তন করতেন। তার ফলে পিতা এবং পুত্রের মধ্যে বিরোধ হয়। *ভগবদ্গীতায়* ভগবান বলেছেন—

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥

"যারা অত্যন্ত মূর্খ, যারা নরাধম, যাদের জ্ঞান মায়ার দ্বারা অপহৃত হয়েছে এবং যারা আসুরিক ভাবাপন্ন, সেই সমস্ত দুষ্কৃতকারীরা কখনও আমার শরণাগত হয় না" (*ভগবদ্গীতা* ৭/১৫)। মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা হচ্ছে *আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ* অর্থাৎ আসুরিক ভাবাপন্ন, যারা ভগবানের রূপে বিশ্বাস করে না। মায়াবাদীরা বলে যে, সব কিছুর পরম উৎস হচ্ছে নির্বিশেষ এবং তারা এইভাবে ভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকার করে। ভগবান নেই একথা যারা বলে, তারা সরাসরিভাবে ভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকার করে। আর যারা বলে ভগবান আছেন, কিন্তু তাঁর মাথা নেই,

পা নেই, হাত নেই, তিনি কথা বলতে পারেন না, শুনতে পারেন না এবং খেতে পারেন না, তা হচ্ছে পরোক্ষভাবে ভগবানের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা। যে মানুষ দেখতে পায় না তাকে বলা হয় অন্ধ, আর যে মানুষ চলতে পারে না তাকে বলা হয় খঞ্জ, যার হাত নেই তাকে বলা হয় অসহায়, যে কথা বলতে পারে না তাকে বলা হয় মূক, আর যে শুনতে পায় না তাকে বলা হয় বধির। মায়াবাদীদের মতে যে ভগবানের পা নেই, চোখ নেই, কান নেই, হাত নেই—তা পরোক্ষভাবে ভগবানকে অন্ধ, মূক, খঞ্জ ইত্যাদি বলে অপবাদ দেওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই যদিও তারা নিজেদের মহা বৈদান্তিক বলে প্রতিষ্ঠা করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা হচ্ছে *মায়য়াপহৃতজ্ঞানা;* অর্থাৎ, যদিও তাদের বড় বড় পণ্ডিত বলে মনে হয়, প্রকৃতপক্ষে তাদের জ্ঞান মায়ার দ্বারা অপহৃত হয়েছে।

মায়াবাদীরা সব সময় বৈষ্ণবদের বিরোধিতা করে, কারণ বৈষ্ণবেরা পরমেশ্বরকে সর্বকারণের পরম কারণ বলে স্বীকার করে এবং তাঁর সেবা করতে চায়, তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চায় এবং তাঁকে দেখতে চায়, ঠিক যেমন ভগবানও তাঁর ভক্তকে দেখতে চান, তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চান, তার সঙ্গে একসাথে বসে খেতে চান এবং তার সঙ্গে নাচতে চান। এই সবিশেষ প্রীতির বিনিময় মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের চিত্তে অনুভূতি জাগায় না। তাই কাশীর মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্য ছিল, ভগবান সম্বন্ধে তাঁর সবিশেষ ধারণাকে পরাস্ত করা। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কিন্তু একজন আদর্শ প্রচারকরূপে মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের মনোভাবের পরিবর্তন করেছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মধুর বাণী শুনে তাদের চিত্ত দ্রবীভূত হয়েছিল এবং তারা তাঁর প্রতি বন্ধু ভাবাপন্ন হয়ে মিষ্টবাক্যে তাঁর সঙ্গে কথা বলেছিল। তেমনই, সমস্ত প্রচারকদের নানা বিরুদ্ধ আচরণের সম্মুখীন হতে হবে, কিন্তু তাঁরা যেন কখনও তাদের শত্রুতে পরিণত না করেন। এমনিতেই তারা শত্রু, আর তার উপর যদি তাদের সঙ্গে কর্কশভাবে এবং অবিনীতভাবে ব্যবহার করা হয়, তা হলে তাদের শত্রুতা কেবল বৃদ্ধি পাবে। তাই আমাদের কর্তব্য হচ্ছে, যতদূর সম্ভব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পদাঙ্ক অনুসরণ করা এবং শাস্ত্রের উদ্ধৃতি ও আচার্যদের সিদ্ধান্ত উপস্থাপন করে তাদের চিত্তে প্রত্যয় উৎপন্ন করানো। এইভাবেই আমাদের ভগবৎ-বিদ্বেষীদের পরাস্ত করতে চেষ্টা করতে হবে।

শ্লোক ১০০

যে কিছু কহিলে তুমি, সব সত্য হয়।
কৃষ্ণপ্রেমা সেই পায়, যার ভাগ্যোদয় ॥ ১০০ ॥

শ্লোকার্থ

"হে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, তুমি যা বললে তা সবই সত্য। যে মহাসৌভাগ্যবান সে-ই কেবল কৃষ্ণপ্রেম লাভ করতে পারে।

তাৎপর্য

যিনি অত্যন্ত সৌভাগ্যবান, তিনিই কেবল কৃষ্ণভক্তি লাভ করতে পারেন। সেই সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীরূপ গোস্বামীকে বলেছেন—

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব ।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ ॥

(*শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত মধ্য* ১৯/১৫১)

জড়া-প্রকৃতির নিয়মের বন্ধনে আবদ্ধ অসংখ্য জীব রয়েছে এবং তারা এই ব্রহ্মাণ্ডে বিভিন্ন দেহ ধারণ করে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে ভ্রমণ করে চলেছে। তাদের মধ্যে যিনি ভাগ্যবান, তিনি শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় সদ্‌গুরুর সান্নিধ্যে আসেন এবং ভগবদ্ভক্তির মহিমা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। সদ্‌গুরু বা আচার্যের পরিচালনায় ভগবদ্ভক্তি অনুশীলন করার ফলে তিনি ভগবৎ-প্রেম লাভ করেন। যাঁর চিত্তে কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হয়েছে এবং তার ফলে যিনি পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তে পরিণত হয়েছেন, তিনি অত্যন্ত ভাগ্যবান। মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা এই কথা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে স্বীকার করেন। কৃষ্ণভক্ত হওয়া সহজ নয়, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপার প্রভাবেই যে তা সম্ভব, সেই কথা বর্ণনা প্রসঙ্গে অচিরেই প্রমাণিত হবে।

শ্লোক ১০১

কৃষ্ণে ভক্তি কর—ইহায় সবার সন্তোষ ।
বেদান্ত না শুন কেনে, তার কিবা দোষ ॥ ১০১ ॥

শ্লোকার্থ

"তুমি কৃষ্ণে ভক্তি কর তাতে কোন আপত্তি নেই, পক্ষান্তরে তার ফলে সকলেই অত্যন্ত সন্তুষ্ট। কিন্তু তুমি বেদান্ত-সূত্র আলোচনা করতে চাও না কেন? তার কি দোষ?"

তাৎপর্য

এই সম্পর্কে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন, "মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা মনে করে যে, *শারীরক-ভাষ্য* নামক শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যকৃত *বেদান্ত সূত্রের* ব্যাখ্যা, যা

অদ্বৈতবাদরূপে প্রতিষ্ঠিত, তা হচ্ছে *বেদান্ত-সূত্রের* যথার্থ ভাষ্য। এইভাবে তারা *বেদান্ত-সূত্র, উপনিষদ* সমস্ত বৈদিক শাস্ত্র তাদের নির্বিশেষ মতের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করে। একজন প্রখ্যাত মায়াবাদী সন্ন্যাসী সদানন্দ যোগীন্দ্র *বেদান্ত-সার* নামক গ্রন্থ রচনা করেছেন, এবং তাতে তিনি লিখেছেন—

বেদান্তো নাম উপনিষৎ-প্রমাণম্ ।
তদোপকারীণি শারীরক-সূত্রাদীনি চ ॥

সদানন্দ যোগীন্দ্রের মতে শঙ্করাচার্যকৃত উপনিষদ ও বেদান্তের *শারীরক ভাষ্য* হচ্ছে বৈদিক প্রমাণের একমাত্র উৎস। কিন্তু আসলে *বেদান্ত* বলতে সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের সারমর্মকে বোঝায় এবং শঙ্করাচার্যের *শারীরক-ভাষ্য* ছাড়া *বেদান্তের* মধ্যে আর কিছু নেই তা ঠিক নয়। বৈষ্ণব আচার্যদের রচিত আরও অনেক *বেদান্ত* ভাষ্য রয়েছে এবং তাঁরা কেউই শঙ্করাচার্যের অনুসরণ করেননি, অথবা তাঁর কল্পনাপ্রসূত ভাষ্যকে স্বীকার করেননি। তাঁদের ভাষ্যসমূহ দ্বৈতবাদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। শঙ্করাচার্য এবং তাঁর অনুগামী অদ্বৈতবাদীরা প্রতিপন্ন করতে চায় যে, ভগবান ও জীব এক এবং পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করার পরিবর্তে তারা নিজেরাই ভগবান হতে চায়। অন্যদের কাছে তারা ভগবানের মতো পূজিত হতে চায়। এই ধরনের মানুষেরা *শুদ্ধাদ্বৈত, শুদ্ধ-দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত* এবং *অচিন্ত্য-ভেদাভেদ*—এই সমস্ত বৈষ্ণব আচার্যদের দর্শন স্বীকার করে না। মায়াবাদীরা এই সমস্ত দর্শন আলোচনা করে না, কারণ তাদের বদ্ধমূল ধারণা যে, তাদের *কেবলাদ্বৈতবাদ* হচ্ছে একমাত্র দর্শন। এই দর্শনকে তারা *বেদান্ত-সূত্রের* বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত বলে মনে করে। তারা মনে করে যে, শ্রীকৃষ্ণের দেহ জড় উপাদান দ্বারা গঠিত এবং কৃষ্ণভক্তি হচ্ছে কেবল ভাবপ্রবণতা মাত্র। তাদের বলা হয় মায়াবাদী, কারণ তাদের মতে শ্রীকৃষ্ণের দেহ মায়ার দ্বারা রচিত এবং তাঁর প্রতি ভক্তের যে ভক্তিমূলক সেবা তাও মায়া। তারা মনে করে যে, এইরূপ ভগবদ্ভক্তিও এক প্রকার সকাম কর্ম (*কর্মকাণ্ড*)। তাদের দৃষ্টিতে ভক্তি হচ্ছে মনোধর্ম-প্রসূত জল্পনা-কল্পনা অথবা ধ্যান। এটিই হচ্ছে মায়াবাদী দর্শন এবং বৈষ্ণব দর্শনের মধ্যে পার্থক্য।

শ্লোক ১০২

এত শুনি' হাসি' প্রভু বলিলা বচন ।
দুঃখ না মানহ যদি, করি নিবেদন ॥ ১০২ ॥

শ্লোকার্থ

মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের এই কথা শুনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মৃদু হেসে বললেন, "আপনারা যদি কিছু মনে না করেন, তা হলে বেদান্ত-দর্শন সম্বন্ধে আমি কিছু বলব।"

তাৎপর্য

মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উক্তি সমর্থন করে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি কেন বেদান্ত-দর্শন আলোচনা করেন না। প্রকৃতপক্ষে সমস্ত বৈষ্ণব আচরণই বেদান্ত-দর্শনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। বৈষ্ণবেরা কখনও বেদান্তের অবমাননা করেন না। তবে তাঁরা *শারীরক-ভাষ্যের* ভিত্তিতে বেদান্ত হৃদয়ঙ্গম করতে চান না। তাই, সেই সংশয় দূর করার জন্য মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের অনুমতি নিয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাদের বেদান্ত দর্শন সম্বন্ধে কিছু বলতে চেয়েছিলেন। বৈষ্ণবেরা হচ্ছেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দার্শনিক, এবং তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছেন শ্রীল জীব গোস্বামী, যাঁর দর্শন শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের দ্বারা চারশ বছর পর আবার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাই সকলেরই খুব ভাল করে জেনে রাখা উচিত যে, বৈষ্ণব দার্শনিকেরা ভাবুক নন অথবা সহজিয়াদের মতো সস্তা ভক্ত নন। সমস্ত বৈষ্ণব আচার্যরা ছিলেন পূর্ণরূপে বেদান্ত তত্ত্ববেত্তা মহান পণ্ডিত, কারণ বেদান্ত-দর্শন না জানলে আচার্য হওয়া যায় না। বেদের অনুগামী ভারতীয় পরমার্থবাদীদের মধ্যে আচার্যরূপে স্বীকৃতি লাভ করতে হলে, অবশ্যই পাঠ করার মাধ্যমে অথবা শ্রবণ করার মাধ্যমে বেদান্ত-দর্শনে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করতে হয়।

বেদান্ত-দর্শনের অনুসরণের ফলে ভক্তির বিকাশ হয়। সেই কথা *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/২/১২) বলা হয়েছে—

তচ্ছ্রদ্দধানা মুনয়ো জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তয়া ।
পশ্যন্ত্যাত্মনি চাত্মানং ভক্ত্যা শ্রুতগৃহীতয়া ॥

এই শ্লোকে *ভক্ত্যা শ্রুতগৃহীতয়া* কথাটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ তাতে বোঝানো হয়েছে যে, ভগবদ্ভক্তি লাভ করা যায় উপনিষদ এবং বেদান্ত-দর্শনের ভিত্তিতে। শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন—

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি-পঞ্চরাত্র-বিধিং বিনা ।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে ॥

"*বেদ, পুরাণ, পঞ্চরাত্র* ইত্যাদির বিধি-বিধান ছাড়াই সম্পাদিত যে ভক্তি, তা ভাবুকতা ছাড়া আর কিছুই নয় এবং তা কেবল সমাজে উৎপাতেরই সৃষ্টি করে।"

বিভিন্ন স্তরের বৈষ্ণব রয়েছেন (কনিষ্ঠ অধিকারী, মধ্যম অধিকারী এবং উত্তম অধিকারী), তবে 'মধ্যম অধিকারী' প্রচারক হতে হলে, *বেদান্ত-সূত্র* এবং অন্যান্য শাস্ত্রে যথেষ্ট পারদর্শী হতে হয়। কারণ বেদান্ত-দর্শনের ভিত্তিতে যখন ভক্তিযোগের বিকাশ হয়, তা অকৃত্রিম এবং দৃঢ় হয়। এই সম্পর্কে উপরোক্ত শ্লোকটির অনুবাদ এবং তাৎপর্য উল্লেখ করা যায় (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১/২/১২)—

অনুবাদ : অপ্রাকৃত বস্তুতে সুদৃঢ় এবং নিশ্চয় বিশ্বাসযুক্ত মুনিগণ জ্ঞান ও বৈরাগ্যযুক্ত হয়ে শাস্ত্র শ্রবণজনিত উপলব্ধি অনুসারে, ভগবানের প্রতি প্রেমময়ী সেবার দ্বারা তাঁদের শুদ্ধ হৃদয়ে পরমাত্মারূপে সেই তত্ত্ববস্তুকে দর্শন করেন।

তাৎপর্য : বাসুদেব বা পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি ভক্তিযুক্ত সেবার মাধ্যমেই পরমতত্ত্বকে জানা যায়, কারণ তিনিই হচ্ছেন পূর্ণ পরমতত্ত্ব। ব্রহ্ম হচ্ছে তাঁর দেহ-বিচ্ছুরিত রশ্মিচ্ছটা, এবং পরমাত্মা হচ্ছেন তাঁর আংশিক প্রকাশ। তাই ব্রহ্ম-উপলব্ধি বা পরমাত্মা-উপলব্ধি হচ্ছে পরমতত্ত্বের আংশিক উপলব্ধি। চার শ্রেণীর মানুষ রয়েছে—কর্মী, জ্ঞানী, যোগী এবং ভক্ত। কর্মীরা হচ্ছে জড়বাদী, কিন্তু অন্য তিন শ্রেণীর মানুষেরা অধ্যাত্মবাদী। সর্বশ্রেষ্ঠ অধ্যাত্মবাদী হচ্ছেন ভগবদ্ভক্ত, যাঁরা পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করতে পেরেছেন। দ্বিতীয় স্তরের অধ্যাত্মবাদী হচ্ছে তাঁরা, যাঁরা পরমেশ্বর ভগবানের অংশ-প্রকাশ পরমাত্মাকে আংশিকভাবে উপলব্ধি করেছেন, আর তৃতীয় শ্রেণীর অধ্যাত্মবাদী হচ্ছেন তাঁরা, যাঁরা সেই পরম-পুরুষের চিন্ময় রশ্মিচ্ছটা দর্শন করেছেন। *ভগবদ্গীতা* এবং অন্যান্য বৈদিক শাস্ত্রে নির্দেশিত হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবানকে জ্ঞান এবং বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তির মাধ্যমেই কেবল জানা যায়। আমরা ইতিপূর্বেই জ্ঞান এবং বৈরাগ্যের মাধ্যমে কিভাবে ভক্তিযোগ অবলম্বন করা যায়, সেই বিষয়ে আলোচনা করেছি। যেহেতু ব্রহ্ম-উপলব্ধি এবং পরমাত্মা-উপলব্ধি হচ্ছে পরমতত্ত্বের অপূর্ণ উপলব্ধি, তাই ব্রহ্ম এবং পরমাত্মা উপলব্ধির পন্থা দুটিও অর্থাৎ *জ্ঞান* এবং *যোগ*—পরমতত্ত্ব উপলব্ধির অপূর্ণ পন্থা। ভগবদ্ভক্তি পূর্ণ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং জড় বিষয়াসক্তি রহিত বৈরাগ্যযুক্ত ও তদুপরি তা *বেদান্ত-সূত্রের* ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। এই পূর্ণাঙ্গ পন্থাটির মাধ্যমেই কেবল ঐকান্তিকভাবে অনুসন্ধিৎসু মানুষেরা পরমতত্ত্বকে উপলব্ধি করতে পারেন। তাই ভগবদ্ভক্তির পন্থা অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন অধ্যাত্মবাদীদের জন্য নয়। তিন রকমের ভক্ত রয়েছেন, যথা—উত্তম অধিকারী ভক্ত, মধ্যম অধিকারী ভক্ত এবং কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্ত। কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্ত হচ্ছে তারা, যাদের যথার্থ জ্ঞান নেই এবং যারা জড় বিষয়ের প্রতি বৈরাগ্যযুক্ত নয়, কিন্তু তারা মন্দিরে ভগবানের পূজার প্রতি আকৃষ্ট। তাদের বলা হয় প্রাকৃত ভক্ত। প্রাকৃত ভক্তরা পারমার্থিক উন্নতির থেকে জড় বিষয় লাভের প্রতি বেশি আসক্ত। তাই এই প্রাকৃত ভক্তের স্তর থেকে মধ্যম অধিকারী ভক্তের স্তরে উন্নীত হওয়ার জন্য একজন ভক্তকে সর্বতোভাবে চেষ্টা করতে হবে। মধ্যম অধিকারের ভক্তির স্তরে ভক্ত ভক্তিমার্গের চারটি তত্ত্ব দর্শন করতে পারেন। যথা—পরমেশ্বর ভগবান, ভগবানের ভক্ত, ভগবান সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ মানুষ এবং ভগবৎ-বিদ্বেষী। পরমতত্ত্বকে জানবার যোগ্যতা অর্জন করার জন্য ভক্তকে অন্তত মধ্যম অধিকারীর ভক্তির স্তরে উন্নীত হতে হবে।

সেই জন্য কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্তকে ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রামাণিক সূত্র থেকে নির্দেশ গ্রহণ করতে হবে। প্রথম শ্রেণীর ভাগবত হচ্ছেন ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত এবং অন্য ভাগবত হচ্ছেন ভগবানের বাণী। কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্তকে তাই ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে জানবার জন্য ব্যক্তি-ভাগবতের শরণাগত হতে হয়। এই ধরনের ব্যক্তি-ভাগবত *শ্রীমদ্ভাগবতের* পেশাদারি পাঠক নয়, যারা তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য ভাগবত পাঠ করে অর্থ উপার্জন করে। যথার্থ ব্যক্তি-ভাগবত হচ্ছেন শুকদেব গোস্বামীর প্রতিনিধি, যিনি শ্রীল সূত গোস্বামীর মতো, এবং যিনি অবশ্যই জনসাধারণের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলের জন্য ভগবদ্ভক্তির মাহাত্ম্য প্রচার করেন। কনিষ্ঠ ভক্তের ভগবানের কথা শ্রবণে কোন রুচি নেই বললেই চলে। এই ধরনের

কনিষ্ঠ ভক্ত পেশাদারি ভাগবত পাঠকের কাছে পাঠ শোনার অভিনয় করে। কিন্তু তাদের এই পাঠ শোনা ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। এই ধরনের কলুষযুক্ত শ্রবণ এবং কীর্তনের ফলে সর্বনাশ হয়, তাই এই ভ্রান্ত পন্থা সম্বন্ধে সকলকে খুব সতর্ক হতে হবে। পরমেশ্বর ভগবানের পবিত্র বাণী যা *ভগবদ্গীতা* ও *শ্রীমদ্ভাগবত* বর্ণিত হয়েছে, তা নিঃসন্দেহে অপ্রাকৃত বিষয়, কিন্তু তা হলেও এই প্রকার অপ্রাকৃত বিষয় পেশাদারি মানুষদের কাছ থেকে গ্রহণ করা উচিত নয়, কারণ সর্পের জিহ্বার স্পর্শে দুধ যেমন বিষে পরিণত হয়, ঠিক তেমনই এই পেশাদারি পাঠকদের মুখ থেকে *শ্রীমদ্ভাগবত* শুনলে তার ফলও বিষবৎ হবে।

তাই ঐকান্তিক ভক্তকে তাঁর পারমার্থিক মঙ্গল সাধনের জন্য *উপনিষদ*, *বেদান্ত* এবং পূর্বতন আচার্য অথবা গোস্বামীদের প্রদত্ত গ্রন্থাবলীর মাধ্যমে বৈদিক জ্ঞান গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। এই সমস্ত গ্রন্থাবলী শ্রবণ না করলে, কেউই যথার্থ উন্নতি সাধন করতে পারে না। শ্রবণ এবং অনুশীলন না করলে, কেবল লোকদেখানো ভক্তি সৃষ্টি হয়। তাই *শ্রুতি*, *স্মৃতি*, *পুরাণ* অথবা *পঞ্চরাত্র* আদি শাস্ত্রসমূহে প্রদত্ত বিধি-বিধান ছাড়া লোকদেখানো ভক্তি তৎক্ষণাৎ বর্জন করতে হবে। অনধিকারী মানুষকে কখনও শুদ্ধ ভক্ত বলে মনে করা উচিত নয়। বৈদিক শাস্ত্র থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানের মাধ্যমে পরমাত্মারূপে পরমেশ্বর ভগবানকে নিরন্তর দর্শন করা যায়। তাকে বলা হয় *সমাধি*।

শ্লোক ১০৩

'ইহা শুনি' বলে সর্ব সন্ন্যাসীর গণ।
তোমাকে দেখিয়ে যৈছে সাক্ষাৎ নারায়ণ ॥ ১০৩ ॥

শ্লোকার্থ

সেই কথা শুনে মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা কিছুটা বিনয়াবনত হন এবং বলেন তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি যেন সাক্ষাৎ নারায়ণ।

তাৎপর্য

মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা পরস্পরকে নারায়ণ বলে সম্বোধন করেন। তাঁরা যখন কোন সন্ন্যাসীকে দেখেন, তখন 'নমো নারায়ণ' (অর্থাৎ আমি নারায়ণরূপী তোমাকে প্রণতি জানাই) বলে তাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। যদিও তাঁরা খুব ভাল মতোই জানেন যে, তিনি কি ধরনের নারায়ণ। নারায়ণ চতুর্ভুজ, কিন্তু তাঁরা যদিও নারায়ণ হবার গর্বে স্ফীত, তবুও তাঁরা দুটি হাতের বেশি আর কিছু প্রদর্শন করতে পারেন না। যেহেতু তাঁদের দর্শন অনুসারে নারায়ণ এবং একজন সাধারণ মানুষ উভয়ই সমপর্যায়ভুক্ত, তাই তাঁরা কখনও কখনও 'দরিদ্র-নারায়ণ' কথাটি ব্যবহার করেন। এই কথাটি ব্যবহার করেছিলেন একজন তথাকথিত স্বামী, যাঁর বেদান্ত দর্শন সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই ছিল না। তাই মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা যদিও পরস্পরকে নারায়ণ বলে সম্বোধন করেন, নারায়ণ যে কে, সেই সম্বন্ধে তাঁদের কোন ধারণাই নেই। কিন্তু

তাঁদের তপশ্চর্যা এবং পুণ্যফলের প্রভাবে তাঁরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে সাক্ষাৎ নারায়ণরূপে জানতে পেরেছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন নারায়ণের ভক্তরূপে পরমেশ্বর ভগবান অর্থাৎ নারায়ণ স্বয়ং, এবং এইভাবে মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, তিনি হচ্ছেন সাক্ষাৎ নারায়ণ আর তাঁরা সকলে হচ্ছেন গর্বস্ফীত কৃত্রিম নারায়ণ। তা বুঝতে পেরে তাঁরা তখন তাঁকে বলেছিলেন—

শ্লোক ১০৪

তোমার বচন শুনি' জুড়ায় শ্রবণ।
তোমার মাধুরী দেখি' জুড়ায় নয়ন ॥ ১০৪ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁরা বললেন, "হে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য! তোমার কথা শুনে আমরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছি, তোমার অঙ্গ মাধুরী দর্শন করে আমরা অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছি।"

তাৎপর্য

শাস্ত্রে বর্ণনা করা হয়েছে—

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ ॥

"পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ ও লীলা জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না, কিন্তু কেউ যখন ভগবানের সেবা করেন, তখন ভগবান নিজেকে তাঁর কাছে প্রকাশ করেন।" (*ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* ১/২/২৩৪)। নারায়ণের প্রতি মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের সেবার ফল এখানে প্রত্যক্ষভাবে দেখা গেল। যেহেতু তাঁরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে একটু শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন এবং যেহেতু তাঁরা ছিলেন পুণ্যবান এবং সন্ন্যাস-আশ্রমের কঠোর নিয়ম যথার্থই পালন করেছিলেন, তাই তাঁদের বেদান্ত-দর্শন সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান ছিল, এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপার প্রভাবে তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, তিনি হচ্ছেন ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ স্বয়ং ভগবান। ভগবানের ছয়টি ঐশ্বর্যের একটি হচ্ছে শ্রী বা সৌন্দর্য। তাঁর অসাধারণ সৌন্দর্য দর্শন করে মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন স্বয়ং নারায়ণ। তিনি তথাকথিত সন্ন্যাসীদের সৃষ্ট দরিদ্র-নারায়ণের মতো প্রাহসনিক নারায়ণ নন।

শ্লোক ১০৫

তোমার প্রভাবে সবার আনন্দিত মন ।
কভু অসঙ্গত নহে তোমার বচন ॥ ১০৫ ॥

শ্লোকার্থ

"তোমার প্রভাবে আমাদের সকলের মন অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছে, আমরা বিশ্বাস করি যে, তোমার বচন অসঙ্গত নয়। তাই তুমি বেদান্ত-সূত্র সম্বন্ধে বলতে পার।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকে 'তোমার প্রভাবে' কথাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কেউ যদি পারমার্থিক মার্গে উন্নত স্তরে অধিষ্ঠিত না হন, তা হলে তিনি শ্রোতাদের প্রভাবিত করতে পারেন না। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গেয়েছেন, 'শুদ্ধভকত-চরণরেণু ভজন-অনুকূল'—যতক্ষণ না কেউ শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ লাভ করেছেন, ততক্ষণ তিনি ভগবদ্ভক্তের তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন না। এই সমস্ত মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা ভক্তরূপী ভগবানের সাক্ষাৎ লাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন, এবং অবশ্যই তাঁরা ভগবানের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাঁরা জানতেন যে, যেহেতু যথার্থ মহাত্মা কখনও অসত্য কথা বলেন না, তাই তিনি যা বলেন তা সবই সত্য এবং বেদবিহিত। গভীর তত্ত্ববেত্তা পুরুষ কখনও এমন কিছু বলেন না, যা অর্থহীন। মায়াবাদীরা যে নিজেদের পরমেশ্বর ভগবান বলে দাবি করেন, তা সম্পূর্ণ অর্থহীন, কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কখনও এই ধরনের অর্থহীন বাক্য উচ্চারণ করেননি। তাই তাঁর সম্বন্ধে মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের সমস্ত সংশয় দূর হয়েছিল, এবং তাঁরা তাঁর কাছ থেকে বেদান্ত-দর্শনের তাৎপর্য শ্রবণ করতে চেয়েছিলেন।

শ্লোক ১০৬

প্রভু কহে, বেদান্ত-সূত্র ঈশ্বর-বচন ।
ব্যাসরূপে কৈল যাহা শ্রীনারায়ণ ॥ ১০৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন—"বেদান্ত-সূত্র হচ্ছে ব্যাসদেবরূপে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীনারায়ণের বাণী।

তাৎপর্য

বৈদিক জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করার পন্থা প্রদর্শনকারী *বেদান্ত-সূত্র* হচ্ছে বৈদিক জ্ঞানের সংক্ষিপ্তসার। *বেদান্ত-সূত্রের* শুরুই হচ্ছে, *অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা* (অর্থাৎ "এখনই পরম তত্ত্ব সম্বন্ধে অনুসন্ধান করার সময়") কথাটি দিয়ে এবং এটিই হচ্ছে মানব-জীবনের বিশেষ উদ্দেশ্য। তাই *বেদান্ত-সূত্রে* অত্যন্ত সংক্ষেপে মানব-জীবনের উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই তত্ত্ব *বায়ু পুরাণে* এবং *স্কন্দ পুরাণেও* প্রতিপন্ন হয়েছে। সূত্র সম্বন্ধে বর্ণনা করে সেখানে বলা হয়েছে—

অল্পাক্ষরমসন্দিগ্ধং সারবৎ বিশ্বতোমুখম্ ।
অস্তোভমনবদ্যং চ সূত্রং সূত্রবিদো বিদুঃ ॥

"অল্প কথায় যা সমস্ত জ্ঞানের সারমর্ম প্রকাশ করে, তাকে বলা হয় *সূত্র*। তার প্রয়োগ অবশ্যই সার্বজনীন হতে হবে এবং তার ভাষা নিখুঁত হতে হবে।" এই ধরনের *সূত্র* সম্বন্ধে যিনি অবগত, তিনি অবশ্যই *বেদান্ত-সূত্র* সম্বন্ধে অবগত। পণ্ডিতমণ্ডলীর কাছে *বেদান্ত-সূত্র* নিম্নলিখিত নাম গুলির দ্বারা পরিচিত—
(১) *ব্রহ্ম-সূত্র*, (২) *শারীরক*, (৩) *ব্যাস-সূত্র*, (৪) *বাদরায়ণ-সূত্র*, (৫) *উত্তর-মীমাংসা* এবং (৬) *বেদান্ত-দর্শন*।

বেদান্ত-সূত্রের চারটি অধ্যায় রয়েছে এবং প্রতি অধ্যায়ের চারটি পাদ রয়েছে। তাই *বেদান্ত-সূত্রকে* ষোড়শ-পাদ বলা যায়। প্রতিটি পাদের বিষয় পাঁচটি অধিকরণের মাধ্যমে পূর্ণরূপে বর্ণিত হয়েছে। এই অধিকরণগুলিকে বলা হয় *প্রতিজ্ঞা*, *হেতু*, *উদাহরণ*, *উপনয়* এবং *নিগমন*। প্রতিটি বিষয় অবশ্যই *প্রতিজ্ঞার* মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হয়। *বেদান্ত-সূত্রের* প্রথমেই যে *প্রতিজ্ঞা* রয়েছে, তা হচ্ছে *অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা* । এই *প্রতিজ্ঞা* নির্দেশ করে যে, পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে অনুসন্ধান করার উদ্দেশ্য নিয়ে এই গ্রন্থ রচিত হয়েছে। তেমনই *হেতুর* মাধ্যমে কারণের বর্ণনা করা হয়, তারপর সেই সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য *উদাহরণ* এবং তারপর বিষয়বস্তুটি হৃদয়ঙ্গম করার জন্য ধীরে ধীরে নিকটবর্তী করা হয় *উপনয়* এর মাধ্যমে, এবং অবশেষে বৈদিক শাস্ত্রের প্রামাণিক উদ্ধৃতির মাধ্যমে তা প্রতিষ্ঠা করতে হয় *নিগমন* পন্থায়।

মহান অভিধান রচয়িতা হেমচন্দ্র, যিনি কোষকার নামেও পরিচিত, তিনি বলেন যে—বেদের ব্রাহ্মণ অংশের সঙ্গে উপনিষদ অংশই বেদান্ত। প্রফেসর আপ্তে তাঁর অভিধানে *বেদের* ব্রাহ্মণ অংশের বর্ণনা করে বলেছেন যে, যে অংশে বিভিন্ন যজ্ঞে মন্ত্র উচ্চারণের বিধি বর্ণিত হয়েছে, তা হচ্ছে *ব্রাহ্মণ*। এই *ব্রাহ্মণ* অংশে বিভিন্ন

অংশের উৎস বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, এবং কখনও কখনও কাহিনীর আকারে তার বর্ণনা করা হয়েছে। এই *ব্রাহ্মণ* বেদের মন্ত্র-অংশ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। হেমচন্দ্র বলেছেন যে, বেদের শেষভাগ হচ্ছে *বেদান্ত-সূত্র*। *বেদ* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'জ্ঞান', এবং *অন্ত* মানে হচ্ছে 'শেষ'। অর্থাৎ *বেদের* চরম উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যথাযথ উপলব্ধি হচ্ছে *বেদান্ত*। *বেদের* চরম উদ্দেশ্য যে শাস্ত্রে প্রদর্শিত হয়েছে, তাও *বেদান্ত*। *উপনিষদ* প্রমাণ-স্বরূপে যে শাস্ত্রে ব্যবহৃত এবং তার উপকারক যে সমস্ত সূত্রাদি, তাও *বেদান্ত*।

তত্ত্বজ্ঞানী পণ্ডিতদের মতে জ্ঞানের তিনটি উৎস রয়েছে, তাদের বলা হয় *প্রস্থান-ত্রয়*। এই সমস্ত তত্ত্ববেত্তাদের মতানুসারে *বেদান্তও* হচ্ছে এই রকম একটি উৎস, কারণ তা যুক্তি প্রমাণের ভিত্তিতে বৈদিক জ্ঞান প্রতিষ্ঠা করে। *ভগবদ্গীতায়* (১৩/৫) ভগবান বলেছেন, *ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ*—"কার্য এবং কারণ সম্বন্ধে যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তিতে জীবনের চরম উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত হওয়ার পন্থা *ব্রহ্মসূত্রে* নিরূপণ করা হয়েছে।" তাই *বেদান্ত-সূত্রকে প্রস্থান-ত্রয়ের* অন্যতম *ন্যায়-প্রস্থান* বলা হয়। উপনিষদগুলি—*শ্রুতি-প্রস্থান* এবং *গীতা, মহাভারত,* পুরাণাদি—*স্মৃতি-প্রস্থান*। সমস্ত বিজ্ঞান-সম্মত অলৌকিক জ্ঞান *শ্রুতি, স্মৃতি* এবং শব্দ প্রমাণের দ্বারা সমন্বিত হতে হবে।

শ্রীনারায়ণের নিঃশ্বাস থেকে বেদসমূহ জগতে প্রকাশিত হয়েছে। সেই নারায়ণের শ্রীমুখনিঃসৃত শাস্ত্র হচ্ছে *সাত্বত-পঞ্চরাত্র*। শ্রীনারায়ণের শক্ত্যাবেশ অবতার শ্রীব্যাসদেব আবার কারও মতে অপান্তরতমা নামক মহান ঋষি *বেদান্ত-সূত্র* প্রণয়ন করেছেন। *পঞ্চরাত্র* ও *বেদান্তে* একই অভিমত প্রকাশিত হয়েছে—এটিই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উক্তি। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রতিপন্ন করেছেন যে, এই দুইয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই এবং তিনি ঘোষণা করেছেন যে, যেহেতু *বেদান্ত-সূত্র* প্রণয়ন করেছেন শ্রীল ব্যাসদেব, তাই বুঝতে হবে যে, তা নারায়ণের নিঃশ্বাস থেকে প্রকাশিত হয়েছে। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন যে, শ্রীল ব্যাসদেব যখন *বেদান্ত-সূত্র* রচনা করছিলেন, তখন আরও সাতজন ঋষি প্রণীত বেদান্ত-মতের সমালোচনা করেছেন। তাঁরা হচ্ছেন—আত্রেয়, আশ্মরথ্য, ঔড়ুলোমি, কার্ষ্ণাজিনি, কাশকৃৎস্ন, জৈমিনি এবং বাদরী। এ ছাড়া পারাশরী ও কর্মন্দীভিক্ষুও ব্যাসদেবের পূর্বে *বেদান্ত-সূত্র* সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন।

বেদান্ত-সূত্রের চারটি অধ্যায়। প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে জীবের সঙ্গে পরমেশ্বর ভগবানের সম্পর্কের আলোচনা করা হয়েছে। একে বলা হয় *সম্বন্ধ-জ্ঞান*। তৃতীয়

অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়ে কিভাবে আচরণ করতে হয়। একে বলা হয় অভিধেয়-জ্ঞান। জীবের সঙ্গে ভগবানের সম্পর্কের কথা বর্ণনা করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, "জীবের 'স্বরূপ' হয়—কৃষ্ণের 'নিত্যদাস'" (*চৈঃ চঃ মধ্য* ২০/১০৮)। তাই, সেই সম্পর্কযুক্ত হতে হলে, সাধনভক্তি বা বিধিবদ্ধভাবে পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করতে হয়। একে বলা হয় *অভিধেয়-জ্ঞান*। চতুর্থ অধ্যায়ে এই ধরনের ভগবৎ-সেবার মুখ্য ফল সম্বন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে (*প্রয়োজন-জ্ঞান*)। জীবের চরম উদ্দেশ্য হচ্ছে, আমাদের প্রকৃত আলয় ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়া। *বেদান্ত-সূত্রে, অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ* বলতে সেই চরম উদ্দেশ্যকে নির্দেশ করা হয়েছে।

নারায়ণের শক্ত্যাবেশ অবতার শ্রীল ব্যাসদেব *বেদান্ত-সূত্র* রচনা করেছেন, এবং অপ্রামাণিক ও অযোগ্য ভাষ্যকারদের কাছ থেকে তা রক্ষা করার জন্য তিনি স্বয়ং তাঁর গুরুদেব নারদ মুনির নির্দেশানুসারে *বেদান্ত-সূত্রের* প্রকৃত ভাষ্য *শ্রীমদ্ভাগবত* রচনা করেছেন। *শ্রীমদ্ভাগবত* ছাড়াও সমস্ত মহান বৈষ্ণব আচার্যদের কথিত *বেদান্ত-সূত্রের* বিভিন্ন ভাষ্য রয়েছে, এবং প্রত্যেক ভাষ্যেই ভগবদ্ভক্তির তত্ত্ব অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। শঙ্কর-ভাষ্যের অনুগামীরা কেবল বিষ্ণুভক্তির উল্লেখ না করে নির্বিশেষভাবে *বেদান্ত-সূত্রের* বর্ণনা করেছেন। সাধারণত মানুষ *শারীরক-ভাষ্য* বা *বেদান্ত-সূত্রের* নির্বিশেষ বর্ণনার প্রতি আসক্ত, কিন্তু বিষ্ণুভক্তিবিহীন সমস্ত ভাষ্যই মূল *বেদান্ত-সূত্র* থেকে ভিন্ন বলে বুঝতে হবে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যথাযথভাবে প্রতিপন্ন করেছেন যে, বিষ্ণুভক্তির ভিত্তিতে রচিত বিভিন্ন বৈষ্ণব আচার্যদের ভাষ্যই হচ্ছে *বেদান্ত-সূত্রের* প্রকৃত অর্থ প্রকাশক, শঙ্করাচার্যের 'শারীরক-ভাষ্য' নয়।

শ্লোক ১০৭

ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব।
ঈশ্বরের বাক্যে নাহি দোষ এই সব ॥ ১০৭ ॥

শ্লোকার্থ

ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা এবং করণাপাটব, এই জড় ত্রুটিগুলি পরমেশ্বর ভগবানের বাক্যে থাকে না।

তাৎপর্য

কোন বস্তুকে তার প্রকৃত রূপ থেকে ভিন্ন বলে মনে করা অথবা ভ্রান্ত জ্ঞানকে বলা হয় ভ্রম। যেমন, অন্ধকারে একটি রজ্জুকে সর্প বলে ভ্রম হয়, অথবা শুক্তিকে রৌপ্য বলে ভ্রম হয়। তেমনই শ্রবণের অনবধানতা জনিত ভ্রান্তি হচ্ছে *প্রমাদ*, এবং এই ধরনের ভ্রান্ত জ্ঞান অন্যদের দান করা হচ্ছে *বিপ্রলিপ্সা* বা প্রতারণা। জড় বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকেরা সাধারণত 'হয়ত' এবং 'খুব সম্ভবত' ইত্যাদি শব্দগুলি ব্যবহার করে। প্রকৃত তথ্য সম্বন্ধে তাদের যথার্থ জ্ঞান নেই, তাই তারা যখন অন্যদের জ্ঞান দান করে, তা প্রতারণা বা বিপ্রলিপ্সার একটি দৃষ্টান্ত। বদ্ধ জীবের সব চাইতে বড় ত্রুটি হচ্ছে তার অপূর্ণ ইন্দ্রিয়। যেমন, আমাদের চক্ষুর যদিও দর্শন করার ক্ষমতা রয়েছে, তবুও যা অনেক দূরে রয়েছে তা আমরা দেখতে পাই না, আবার আমাদের চোখের সব চাইতে কাছে রয়েছে যে চোখের পাতা তাও আমরা দেখতে পাই না। আমাদের ভ্রান্ত দৃষ্টিতে সূর্যকে একটি গোলকের মতো মনে হয়, আর পাণ্ডুরোগে ভুগছে যে মানুষ, তার কাছে সব কিছুই হরিদ্রাবর্ণ দেখায়। তাই আমাদের ভ্রান্ত দৃষ্টি দ্বারা লব্ধ যে জ্ঞান, তার উপর আমরা নির্ভর করতে পারি না। আমাদের কর্ণেন্দ্রিয়ও তেমনই ভ্রান্ত। টেলিফোন মন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত অনেক দূরের শব্দ আমরা শুনতে পাই না। এইভাবে আমরা যদি আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে বিশ্লেষণ করি, তা হলে আমরা দেখতে পাই যে, সব কয়টি ইন্দ্রিয়ই ভ্রান্ত। তাই ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে জ্ঞান আহরণ করা সম্পূর্ণ অর্থহীন। বৈদিক প্রথা হচ্ছে, মহাজনদের কাছ থেকে শ্রবণ করার মাধ্যমে জ্ঞান আহরণ করা। *ভগবদ্গীতায়* ভগবান বলেছেন, *এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ*—"পরম্পরার ধারায় রাজর্ষিরা এই পরম তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেছিলেন" (*ভগবদ্গীতা* ৪/২)। আমাদের শ্রবণ করতে হবে টেলিফোন থেকে নয়, তত্ত্বজ্ঞানী মহাজনের কাছ থেকে, কারণ যথার্থ জ্ঞান তাঁর কাছেই রয়েছে।

শ্লোক ১০৮

উপনিষৎ-সহিত সূত্র কহে যেই তত্ত্ব ।
মুখ্যবৃত্ত্যে সেই অর্থ পরম মহত্ত্ব ॥ ১০৮ ॥

শ্লোকার্থ

"উপনিষদসমূহে এবং ব্রহ্মসূত্রে পরমতত্ত্ব বর্ণিত হয়েছে, তবে সেই শ্লোকগুলি যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে, তাই হচ্ছে উপলব্ধির পরম মহত্ত্ব।

তাৎপর্য

শঙ্করাচার্যের সময় থেকে শাস্ত্রের অর্থ বিকৃত করার প্রচলন হয়েছে। তথাকথিত সমস্ত পণ্ডিতেরা নিজেদের মনগড়া অর্থ বিশ্লেষণ করে গর্ব অনুভব করে, এবং তারা ঘোষণা করে যে, যে কেউ তাদের ইচ্ছামতো বৈদিক শাস্ত্র উপলব্ধি করতে পারে। অর্থাৎ 'যে ভাবে তুমি চাও সেভাবেই'—এই কথাগুলি হচ্ছে মূর্খতা, বোকামি, এবং এগুলিই বৈদিক সংস্কৃতির সর্বনাশ ডেকে এনেছে। বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান কখনও খেয়াল খুশিমতো গ্রহণ করা যায় না। যেমন গণিতশাস্ত্রে দুয়ে দুয়ে চার হয়, কখনও তিন বা পাঁচ হয় না। প্রকৃত জ্ঞানকে যদিও পরিবর্তন করা যায় না, কিন্তু আজকালকার মানুষেরা বৈদিক জ্ঞানকে তাদের ইচ্ছামতো গ্রহণ করার রীতি প্রচলন করেছে সেই জন্যই আমরা *ভগবদ্গীতা যথাযথ* প্রকাশ করেছি। আমরা আমাদের মনগড়া অর্থ বিশ্লেষণ করিনি। *ভগবদ্গীতার* কোন কোন ভাষ্যকার বলেন যে, *ভগবদ্গীতার* প্রথম শ্লোকের *কুরুক্ষেত্র* হচ্ছে দেহ, কিন্তু আমরা তা স্বীকার করি না। আমাদের মতে কুরুক্ষেত্র স্থানটি এখনও রয়েছে, এবং বৈদিক শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে তা হচ্ছে *ধর্মক্ষেত্র*। পুণ্যতিথি উপলক্ষ্যে মানুষ আজও সেখানে যায়। কিন্তু মূর্খ ভাষ্যকারেরা বলে যে, *কুরুক্ষেত্র* হচ্ছে দেহ এবং *পঞ্চপাণ্ডব* হচ্ছে পাঁচটি ইন্দ্রিয়। এইভাবে তারা কদর্থ করে, এবং তার ফলে মানুষ বিপথগামী হয়। এখানে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রতিপন্ন করেছেন যে *উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র* আদি সমস্ত বৈদিক শাস্ত্র, তা সে *শ্রুতি, স্মৃতি* বা *ন্যায়* যাই হোক না কেন, তা সবই তাদের মুখ্য অর্থ অনুসারে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। বৈদিক শাস্ত্রের মুখ্য অর্থ বর্ণনা করাটাই হচ্ছে মহত্ত্ব, কিন্তু ভ্রান্ত ইন্দ্রিয়লব্ধ ভ্রান্ত জ্ঞানের দ্বারা নিজেদের মনগড়া অর্থ বিশ্লেষণ করলে সর্বনাশ হবে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেইভাবে *বেদের* অর্থ বিশ্লেষণ করার প্রচেষ্টাকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেছেন।

উপনিষদগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত এগারটি উপনিষদ প্রধান—ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক এবং শ্বেতাশ্বতর। মুক্তিকোপনিষদে ৩০-৩৯ শ্লোকে ১০৮টি উপনিষদের নামের উল্লেখ আছে। *(১) ঈশোপনিষদ, (২) কেনোপনিষদ, (৩) কঠোপনিষদ, (৪) প্রশ্নোপনিষদ, (৫) মুণ্ডকোপনিষদ, (৬) মাণ্ডুক্যোপনিষদ, (৭) তৈত্তিরীয়োপনিষদ, (৮) ঐতরেয়োপনিষদ, (৯) ছান্দোগ্যোপনিষদ, (১০) বৃহদারণ্যকোপনিষদ, (১১) ব্রহ্মোপনিষদ, (১২) কৈবল্যোপনিষদ, (১৩) জাবালোপনিষদ, (১৪) শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ, (১৫) হংসোপনিষদ, (১৬) আরুণেয়োপনিষদ, (১৭) গর্ভোপনিষদ, (১৮) নারায়ণোপনিষদ, (১৯) পরমহংসোপনিষদ, (২০) অমৃত-*

বিন্দূপনিষদ, (২১) নাদবিন্দূপনিষদ, (২২) শিরোপনিষদ, (২৩) অথর্ব-শিখোপনিষদ, (২৪) মৈত্রায়ণী-উপনিষদ, (২৫) কৌষীতকী-উপনিষদ, (২৬) বৃহজ্জাবালোপনিষদ, (২৭) নৃসিংহতাপনীয়োপনিষদ, (২৮) কালাগ্নি-রুদ্রোপনিষদ, (২৯) মৈত্রেয়ী-উপনিষদ, (৩০) সুবালোপনিষদ, (৩১) ক্ষুরিকোপনিষদ, (৩২) মন্ত্রিকোপনিষদ, (৩৩) সর্বসারোপনিষদ, (৩৪) নিরালম্বো-পনিষদ, (৩৫) সুখ-রহস্যোপনিষদ, (৩৬) ব্রজ-সূচিকোপনিষদ, (৩৭) তেজো-বিন্দূপনিষদ, (৩৮) নাদ-বিন্দূপনিষদ, (৩৯) ধ্যান-বিন্দূপনিষদ, (৪০) ব্রহ্ম-বিদ্যোপনিষদ, (৪১) যোগ-তত্ত্বোপনিষদ, (৪২) আত্ম-বোধোপনিষদ, (৪৩) নারদ-পরিব্রাজকোপনিষদ, (৪৪) ত্রিশিখী-উপনিষদ, (৪৫) সীতোপনিষদ, (৪৬) যোগ-চূড়ামণি-উপনিষদ, (৪৭) নির্বাণোপনিষদ, (৪৮) মণ্ডল-ব্রাহ্মণোপনিষদ, (৪৯) দক্ষিণা-মূর্তি-উপনিষদ, (৫০) সরভোপনিষদ, (৫১) স্কন্দোপনিষদ, (৫২) মহানারায়ণোপনিষদ, (৫৩) অদ্বয়-তারকোপনিষদ, (৫৪) রাম-রহস্যোপনিষদ, (৫৫) রামতাপণি-উপনিষদ, (৫৬) বাসুদেবোপনিষদ, (৫৭) মুদ্গলোপনিষদ, (৫৮) শাণ্ডিল্যোপনিষদ, (৫৯) পৈঙ্গলোপনিষদ, (৬০) ভিক্ষুপনিষদ, (৬১) মহদুপনিষদ, (৬২) শারীরকোপনিষদ, (৬৩) যোগ-শিখোপনিষদ, (৬৪) তুরীয়াতীতোপনিষদ, (৬৫) সন্ন্যাসোপনিষদ, (৬৬) পরমহংস-পরিব্রাজকোপনিষদ, (৬৭) মালিকোপনিষদ, (৬৮) অব্যক্তোপনিষদ, (৬৯) একাক্ষরোপনিষদ, (৭০) পূর্ণোপনিষদ, (৭১) সূর্যোপনিষদ, (৭২) অক্ষি-উপনিষদ, (৭৩) অধ্যাত্মোপনিষদ, (৭৪) কুণ্ডিকোপনিষদ, (৭৫) সাবিত্রী-উপনিষদ, (৭৬) আত্মোপনিষদ, (৭৭) পাশুপতোপনিষদ, (৭৮) পরংব্রহ্মোপনিষদ, (৭৯) অবধূতোপনিষদ, (৮০) ত্রিপুরাতপনোপনিষদ, (৮১) দেবী-উপনিষদ, (৮২) ত্রিপুরোপনিষদ, (৮৩) কঠ-রুদ্রোপনিষদ, (৮৪) ভাবনোপনিষদ, (৮৫) হৃদয়োপনিষদ, (৮৬) যোগ-কুণ্ডলিনী-উপনিষদ, (৮৭) ভস্মোপনিষদ, (৮৮) রুদ্রাক্ষোপনিষদ, (৮৯) গণোপনিষদ, (৯০) দর্শনোপনিষদ, (৯১) তারসারোপনিষদ, (৯২) মহাবাক্যোপনিষদ, (৯৩) পঞ্চব্রহ্মোপনিষদ, (৯৪) প্রাণাগ্নিহোত্রোপনিষদ, (৯৫) গোপাল-তপনোপনিষদ, (৯৬) কৃষ্ণোপনিষদ, (৯৭) যাজ্ঞবল্ক্যোপনিষদ, (৯৮) বরাহোপনিষদ, (৯৯) শাঠ্যায়নী-উপনিষদ, (১০০) হয়গ্রীবোপনিষদ, (১০১) দত্তাত্রেয়োপনিষদ, (১০২) গারুড়োপনিষদ, (১০৩) কলি-উপনিষদ, (১০৪) জাবালি-উপনিষদ, (১০৫) সৌভাগ্যোপনিষদ, (১০৬) সরস্বতী-রহস্যোপনিষদ, (১০৭) বহ্বৃচোপনিষদ, (১০৮) মুক্তিকোপনিষদ। এইভাবে ১০৮টি সাধারণভাবে স্বীকৃত উপনিষদ রয়েছে, যার মধ্যে ১১টি হচ্ছে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ, এই কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

শ্লোক ১০৯

গৌণ-বৃত্ত্যে যেবা ভাষ্য করিল আচার্য।
তাহার শ্রবণে নাশ হয় সর্ব কার্য ॥ ১০৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য সমস্ত বৈদিক শাস্ত্র গৌণ অর্থ অনুসারে বর্ণনা করেছেন। সেই ব্যাখ্যা যে শ্রবণ করে, তার সর্বনাশ হয়।

শ্লোক ১১০

তাঁহার নাহিক দোষ, ঈশ্বর-আজ্ঞা পাঞা।
গৌণার্থ করিল মুখ্য অর্থ আচ্ছাদিয়া ॥ ১১০ ॥

শ্লোকার্থ

শঙ্করাচার্যের তাতে কোন দোষ নেই, কারণ পরমেশ্বর ভগবানের আজ্ঞা অনুসারে তিনি মুখ্য অর্থ আচ্ছাদন করে গৌণ অর্থ প্রকাশ করেছেন।

তাৎপর্য

বৈদিক শাস্ত্রসমূহ হচ্ছে প্রকৃত জ্ঞানের আধার, কিন্তু তা যদি যথাযথভাবে গ্রহণ না করা হয়, তা হলে মানুষ বিভ্রান্ত হয়। যেমন, *ভগবদ্গীতা* হচ্ছে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈদিক শাস্ত্র, যা হাজার হাজার বছর ধরে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু যেহেতু তত্ত্বজ্ঞান রহিত মূর্খ পাষণ্ডীরা এই *ভগবদ্গীতার* ভাষ্য রচনা করেছে, তাই তা পাঠ করে কারও কোন লাভ হচ্ছে না এবং কেউই কৃষ্ণভাবনার অমৃতস্বরূপ ভগবদ্ভক্তির মার্গ অবলম্বন করতে পারছে না। কিন্তু *ভগবদ্গীতা* যখন যথাযথভাবে দান করা হল, তখন দেখা গেল যে, চার-পাঁচ বছরের মধ্যেই সারা পৃথিবীর হাজার হাজার মানুষ কৃষ্ণভক্তে পরিণত হয়েছে। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, "মুখ্যবৃত্ত্যে সেই অর্থ পরম মহত্ত্ব"—ভ্রান্তভাবে ব্যাখ্যা না করে যদি মুখ্য অর্থ অনুসারে বৈদিক শাস্ত্রের অর্থ প্রকাশ করা হয় তা হলে তা অপূর্ব মহিমামণ্ডিত হয়ে ওঠে। দুর্ভাগ্যবশত, পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশ অনুসারে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য অসুরদের আস্তিকে পরিণত করার জন্য নাস্তিকতার আশ্রয় গ্রহণ করে ভগবৎ-তত্ত্ব প্রদান করেছিলেন, এবং তা করার জন্য তিনি বৈদিক জ্ঞানের মুখ্য অর্থ

পরিত্যাগ করে গৌণ অর্থ করেছিলেন। সেই উদ্দেশ্যেই তিনি *বেদান্ত-সূত্রের শারীরক-ভাষ্য* রচনা করেছিলেন। তাই *শারীরক-ভাষ্যের* তেমন কোন গুরুত্ব দেওয়া উচিত নয়। বেদান্ত-দর্শন হৃদয়ঙ্গম করতে হলে *শ্রীমদ্ভাগবত* পাঠ করা অবশ্য কর্তব্য, যার শুরুতেই বলা হয়েছে, *ওঁ নমো ভাগবতে বাসুদেবায়, জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্*—"বসুদেব তনয় শ্রীকৃষ্ণকে আমি আমার প্রণতি নিবেদন করি, যিনি হচ্ছেন সর্বব্যাপ্ত পরমেশ্বর ভগবান। সেই অপ্রাকৃত বাস্তব বস্তুর আমি ধ্যান করি, যিনি হচ্ছেন সর্বকারণের পরম কারণ, যাঁর থেকে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশিত হয়, যাঁকে আশ্রয় করে তারা বিরাজ করে এবং যাঁর মধ্যে তারা লয় প্রাপ্ত হয়। সেই নিত্য জ্যোতির্ময় ভগবানের আমি ধ্যান করি, যিনি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সব কিছু সম্বন্ধেই অবগত এবং যিনি সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১/১/১)। *শ্রীমদ্ভাগবত* হচ্ছে *বেদান্ত-সূত্রের* প্রকৃত ভাষ্য। দুর্ভাগ্যবশত কেউ যদি শঙ্করাচার্যের শারীরক-ভাষ্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তা হলে তার পারমার্থিক জীবন বিনষ্ট হয়ে যায়।

কেউ তর্ক উত্থাপন করতে পারে যে, শঙ্করাচার্য যেহেতু দেবাদিদেব মহাদেবের অবতার, তা হলে কেন তিনি মানুষকে এইভাবে প্রতারণা করলেন? তার উত্তর হচ্ছে, তা তিনি করেছেন তাঁর প্রভু পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশ অনুসারে। সেই সত্য *পদ্ম পুরাণে* দেবাদিদেব মহাদেবের নিজের কথাতেই প্রতিপন্ন হয়েছে—

মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে ।
ময়ৈব কল্পিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণরূপিণা ॥
ব্রহ্মণশ্চাপরং রূপং নির্গুণং বক্ষ্যতে ময়া ।
সর্বস্বং জগতোঽপ্যস্য মোহনার্থং কলৌ যুগে ॥
বেদান্তে তু মহাশাস্ত্রে মায়াবাদমবৈদিকম্ ।
ময়ৈব বক্ষ্যতে দেবি জগতাং নাশকারণাৎ ॥

শিব পার্বতীকে বললেন, "মায়াবাদ দর্শন হচ্ছে অসৎ-শাস্ত্র। তা হচ্ছে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ। হে পার্বতী, কলিযুগে ব্রাহ্মণরূপে আমি এই কল্পিত মায়াবাদ প্রচার করি। ভগবৎ-বিদ্বেষী অসুরদের প্রতারণা করার জন্য আমি পরমেশ্বর ভগবানকে নিরাকার এবং নির্গুণ বলে বর্ণনা করি। তেমনই সমস্ত ভগবৎ-বিদ্বেষী জনসাধারণকে মোহাচ্ছন্ন করার জন্য ভগবানের রূপকে অস্বীকার করে, বেদান্তের বিশ্লেষণপূর্বক আমি এই মায়াবাদ দর্শন রচনা করি।" *শিব পুরাণে* পরমেশ্বর ভগবান শিবকে বলেছেন—

দ্বাপরাদৌ যুগে ভূত্বা কলয়া মানুষাদিষু ।
স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বং চ জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু ॥

"কলিযুগে *বেদের* কল্পিত অর্থ প্রচার করে জনসাধারণকে আমার প্রতি বিমুখ কর।" এইগুলি হচ্ছে পুরাণের বর্ণনা।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর *মুখ্যবৃত্তি* অর্থে বলেছেন *অবিধাবৃত্তি* বা যে অর্থ অভিধান থেকে অনায়াসে বুঝতে পারা যায়, কিন্তু *গৌণবৃত্তি* হচ্ছে অভিধানের অর্থ আলোচনা না করে কল্পিত অর্থ তৈরি করা। যেমন, একজন রাজনীতিবিদ্ বলেছেন যে, *ভগবদ্গীতায়* বর্ণিত কুরুক্ষেত্র হচ্ছে দেহ, কিন্তু অভিধানে কোথাও এই রকম বর্ণনা নেই। তাই এই কল্পিত অর্থটি হচ্ছে, *গৌণবৃত্তি*। কিন্তু অভিধানে যে প্রত্যক্ষ অর্থটি পাওয়া যায়, তা হচ্ছে *মুখ্যবৃত্তি* বা *অবিধাবৃত্তি*। এই দুইয়ের মধ্যে এটিই হচ্ছে পার্থক্য। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু *অবিধাবৃত্তি* অনুসারে বৈদিক শাস্ত্র হৃদয়ঙ্গম করতে নির্দেশ দিয়েছেন, এবং তিনি *গৌণবৃত্তি* বর্জন করেছেন। কখনও কখনও অবশ্য প্রয়োজনবোধে *গৌণবৃত্তি* বা *লক্ষণাবৃত্তি* অনুসারে বৈদিক শাস্ত্র ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তবে সেই ব্যাখ্যাগুলি সনাতন সত্য বলে গ্রহণ করা উচিত নয়।

উপনিষদ এবং *বেদান্ত-সূত্রের* আলোচনার উদ্দেশ্য হচ্ছে, দর্শনের মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানের সবিশেষ রূপ প্রতিষ্ঠা করা। নির্বিশেষবাদীরা কিন্তু তাদের দর্শন প্রতিষ্ঠা করার জন্য *লক্ষণাবৃত্তি* বা *গৌণবৃত্তি* অনুসারে তা গ্রহণ করে। ফলে, তত্ত্ববাদী বা পরমতত্ত্বের অনুসন্ধানী না হয়ে, তারা মায়াবাদী বা মায়ার দ্বারা মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। মহান বৈষ্ণবাচার্য শ্রীবিষ্ণুস্বামী যখন *শুদ্ধাদ্বৈতবাদ* অনুসারে তাঁর বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করেন, তৎক্ষণাৎ মায়াবাদীরা এই দর্শনের সুযোগ নিয়ে তাঁদের *অদ্বৈতবাদ* বা *কেবলাদ্বৈতবাদ* প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন। এই *কেবলাদ্বৈতবাদ* খণ্ডন করার জন্য শ্রীপাদ রামানুজাচার্য তাঁর *বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ* প্রতিষ্ঠা করেন এবং শ্রীমধ্বাচার্য *তত্ত্ববাদ* প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁরা দুজনেই ছিলেন মায়াবাদীদের কাছে এক দুর্ভেদ্য প্রতিবন্ধকের মতো, কারণ তাঁরা বৈদিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে তাঁদের দর্শন খণ্ডন করেন। মহর্ষি রামানুজের *বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ* এবং শ্রীমধ্বাচার্যের *তত্ত্ববাদ* যে কিভাবে মায়াবাদ দর্শনকে প্রবল বিক্রমে পরাজিত করেছে, তা বৈদিক দর্শনের পাঠকেরা খুব ভালভাবেই জানেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বেদান্ত-দর্শনের মুখ্য অর্থ গ্রহণ করে তৎক্ষণাৎ মায়াবাদ-দর্শন খণ্ডন করেছিলেন। *শারীরক-ভাষ্য* অনুসরণ করলে সর্বনাশ হয়। সেই সত্য *পদ্ম পুরাণে* প্রতিপন্ন করা হয়েছে, যেখানে শিব পার্বতীকে বলছেন—

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি তামসানি যথাক্রমম্ ।
যেষাং শ্রবণমাত্রেণ পাতিত্যং জ্ঞানিনামপি ॥

অপার্থং শ্রুতিবাক্যানাং দর্শয়ন্নোকর্হিতম্ ।
কর্মস্বরূপত্যাজাদ্বত্র চ প্রতিপাদাতে ॥
সর্বকর্ম পরিভ্রংশান্নৈষ্কর্ম্যং তত্র চোচ্যাতে ।
পরাত্মজীবয়োরৈক্যং ময়াত্র প্রতিপাদাতে ॥

"হে দেবি, মায়াবাদ দর্শনের মাধ্যমে আমি যে কিভাবে অজ্ঞানের অন্ধকার প্রচার করেছি, সেই কথা শ্রবণ কর। কেবল তা শ্রবণ করা মাত্র জ্ঞানীদের পর্যন্ত অধঃপতন হবে। এই দর্শনের মাধ্যমে, যা সমস্ত মানুষদের কাছে অত্যন্ত অমঙ্গলজনক, তা বর্ণনা করে আমি *বেদের* কদর্থ করেছি, এবং কর্মের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করার জন্য সব রকম কর্ম পরিত্যাগ করার নির্দেশ দিয়েছি। এই মায়াবাদ-দর্শনে আমি জীবাত্মা এবং পরমাত্মাকে এক বলে বর্ণনা করেছি।" শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং তাঁর অনুগামীরা যে কিভাবে মায়াবাদ দর্শন বর্জন করেছেন, সেই কথা *চৈতন্য-চরিতামৃতের* অন্ত্যলীলার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৯৪ থেকে ৯৯ শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে। সেখানে স্বরূপ দামোদর গোস্বামী বলেছেন, "যে মানুষ মায়াবাদ দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হয়, সে উন্মাদ". বিশেষ করে কোন বৈষ্ণব যদি শারীরক-ভাষ্য অধ্যয়ন করে নিজেকে ভগবান বলে মনে করেন। মায়াবাদী দার্শনিকেরা তাঁদের যুক্তিগুলি এত আকর্ষণীয় ভাষায় উপস্থাপন করেছেন যে, তা শুনে মহাভাগবতের মতো অতি উচ্চস্তরের ভক্তেরও চিত্ত বিচলিত হতে পারে। যে দর্শনে ভগবান এবং জীবকে এক এবং অভিন্ন বলে বর্ণনা করা হয়, প্রকৃত বৈষ্ণব কখনই তা সহ্য করতে পারেন না।

শ্লোক ১১১

'ব্রহ্ম'-শব্দে মুখ্য অর্থে কহে—'ভগবান্' ।
চিদৈশ্বর্য-পরিপূর্ণ, অনূর্ধ্ব-সমান ॥ ১১১ ॥

শ্লোকার্থ

" 'ব্রহ্ম' শব্দটির মুখ্য অর্থ হচ্ছে চিদৈশ্বর্য পরিপূর্ণ পরমেশ্বর ভগবান। কেউই তাঁর সমান নয় বা তাঁর থেকে মহৎ নয়।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই উক্তিটি *শ্রীমদ্ভাগবতে* প্রতিপন্ন হয়েছে—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্ ।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥

"যা অদ্বয়জ্ঞান অর্থাৎ এক এবং অদ্বিতীয় বাস্তব বস্তু, জ্ঞানীরা তাঁকেই পরমার্থ বলেন। সেই তত্ত্ববস্তু ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান—এই ত্রিবিধ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত বা কথিত হন" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১/২/১১)। পরমতত্ত্বের অস্পষ্ট দর্শন হচ্ছে ব্রহ্ম, তাঁর আংশিক উপলব্ধি হচ্ছে পরমাত্মা এবং তাঁর চরম উপলব্ধি হচ্ছে ভগবান। পরমেশ্বর বা ভগবান হচ্ছেন ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ, তিনি হচ্ছেন অসমোর্ধ্ব অর্থাৎ তাঁর সমান কেউ নেই এবং তাঁর ঊর্ধ্বেও কেউ নেই। সেই কথা *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও* প্রতিপন্ন হয়েছে, যেখানে ভগবান বলেছেন, *মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়*— "হে ধনঞ্জয়, আমার থেকে পরতর আর কিছু নেই" (*ভগবদ্গীতা* ৭/৭)। এই রকম বহু শ্লোকে প্রমাণিত হয়েছে যে, পরমতত্ত্বের চরম উপলব্ধি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ।

শ্লোক ১১২

তাঁহার বিভূতি, দেহ,—সব চিদাকার ।
চিদ্বিভূতি আচ্ছাদি' তাঁরে কহে 'নিরাকার' ॥ ১১২ ॥

শ্লোকার্থ

"পরমেশ্বর ভগবানের দেহ, ঐশ্বর্য, পরিকর আদি সব কিছুই চিন্ময়। মায়াবাদী দার্শনিকেরা কিন্তু তাঁর চিৎ-বিভূতি আচ্ছাদিত করে তাঁকে নিরাকার বলে বর্ণনা করে।

তাৎপর্য

ব্রহ্ম-সংহিতায় বর্ণনা করা হয়েছে, *ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ*— "পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দেহ চিন্ময় অর্থাৎ নিত্য, জ্ঞানময় এবং আনন্দময়।" এই জড় জগতে সকলের দেহই তাঁর ঠিক বিপরীত—অসৎ বা অনিত্য, অজ্ঞান এবং দুঃখময়। তাই পরমেশ্বর ভগবানের দেহ যে আমাদের মতো জড় নয়, সেই কথা বোঝাবার জন্য কখনও কখনও তাঁকে নিরাকার বলে বর্ণনা করা হয়।

মায়াবাদী দার্শনিকেরা জানে না, পরমেশ্বর ভগবান নিরাকার কিভাবে। পরমেশ্বর ভগবানের রূপ আমাদের মতো নয়, তা চিন্ময়। সেই কথা না বুঝে, মায়াবাদী দার্শনিকেরা কেবল প্রচার করে যে, পরমেশ্বর ভগবান বা ব্রহ্ম হচ্ছেন নিরাকার।

এই সম্পর্কে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বেদের বহু উক্তির উল্লেখ করেছেন। কেউ যদি এই সমস্ত বৈদিক উক্তির মুখ্য অর্থ গ্রহণ করেন, তা হলে তিনি বুঝতে পারেন যে, পরমেশ্বর ভগবানের রূপ *সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ* অর্থাৎ তিনি চিন্ময় দেহসম্পন্ন।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হয়েছে, *পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে*। তা থেকে বুঝা যায় যে, পরমেশ্বর ভগবানের দেহ চিন্ময়, কারণ যদিও তিনি বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হন, তবুও তিনি একই থাকেন। *ভগবদ্গীতায়* ভগবান বলেছেন, *অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে*—"আমিই সব কিছুর উৎস। সব কিছু আমার থেকেই প্রকাশিত হয়" (*ভগবদ্গীতা* ১০/৮)। মায়াবাদী দার্শনিকেরা তাদের জড় ধারণা অনুসারে অনুমান করে যে, পরমতত্ত্ব যদি নিজেকে সব কিছুর মধ্যে বিস্তার করেন, তা হলে তাঁর প্রকৃত বৃত্তি নিশ্চয়ই নষ্ট হয়ে যায়। তাই তারা মনে করে যে, ভগবানের বিরাটরূপ ছাড়া আর কোন রূপ থাকতে পারে না। কিন্তু *বৃহদারণ্যক উপনিষদে* প্রতিপন্ন হয়েছে, *পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে*—"যদিও তিনি নিজেকে বিভিন্নরূপে বিস্তার করেন, তবুও তাঁর স্বরূপের কোন বিকার হয় না। তাঁর আদি চিন্ময় স্বরূপ যেমন তেমনই থাকে।" *শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও* বলা হয়েছে, *বিচিত্রশক্তিঃ পুরুষঃ পুরাণঃ*—"আদি পুরুষ পরমেশ্বর ভগবানের বিচিত্র শক্তি রয়েছে।" *স বৃক্ষকালাকৃতিভিঃ পরোঽন্যোঃ যস্মাৎ প্রপঞ্চ পরিবর্ততেঽয়ং ধর্মাবহং পাপনুদং ভগেশম্*—"তিনি হচ্ছেন জড় সৃষ্টির উৎস, এবং তাঁরই প্রভাবে সব কিছুর পরিবর্তন হয়। তিনি ধর্মের রক্ষাকর্তা এবং সব রকম পাপকর্মের সংহারক। তিনি সর্ব ঐশ্বর্যের ঈশ্বর।" (৬/৬) *বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ*—"এখন আমি পরমেশ্বর ভগবানকে মহত্তম থেকেও মহত্তররূপে জানতে পেরেছি। তিনি সূর্যের মতো জ্যোতির্ময়, এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন এই জড় জগতের অতীত।" (৩/৮) *পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ*—"তিনি হচ্ছেন সমস্ত ঈশ্বরদের ঈশ্বর, পরমেরও পরম।" (৬/৭) *মহান প্রভুর্বৈ পুরুষঃ*—"তিনি হচ্ছেন প্রভু এবং পরম পুরুষ।" (৩/১২) *পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে*—তাঁর পরা শক্তি আমরা বিভিন্নভাবে উপলব্ধি করতে পারি।" (৬/৮) এই সমস্ত *শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের* বর্ণনা। তেমনই, *ঋগ্বেদে* বর্ণনা করা হয়েছে *তদ্বিষ্ণো পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ*—"শ্রীবিষ্ণু হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান এবং যাঁরা যথার্থই তত্ত্বজ্ঞানী, তাঁরা সর্বদাই তাঁর শ্রীপাদপদ্মের কথা চিন্তা করেন।" *প্রশ্ন উপনিষদে* বলা হয়েছে, *স ঈক্ষাঞ্চক্রে*—"তিনি জড়া প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করেছেন।" (৬/৩) *ঐতরেয় উপনিষদে* বর্ণনা করা হয়েছে, *স ঐক্ষত*— "তিনি জড় সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টিপাত করেছিলেন"—এবং *স ইমাঁল্লোকান্ অসৃজত*—"তিনি এই জড় জগৎ সৃষ্টি করেছেন।" (১/১/১-২)।

ভগবান যে নিরাকার নন, তা প্রমাণ করার জন্য *বেদ* এবং *উপনিষদ* থেকে এইভাবে বহু শ্লোকের উল্লেখ করা যায়। *কঠোপনিষদেও* বলা হয়েছে, *নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্*—"তিনি হচ্ছেন পরম নিত্য এবং পরম চেতন পুরুষ, যিনি অন্য সমস্ত জীবদের পালন করেন।" এই সমস্ত বৈদিক প্রমাণ থেকে হৃদয়ঙ্গম করা যায় যে, পরমতত্ত্ব হচ্ছেন একজন পুরুষ, যাঁর সমান অথবা যাঁর ঊর্ধ্বে আর কেউ নেই। যদিও মূর্খ মায়াবাদীরা মনে করে যে, তারা শ্রীকৃষ্ণের থেকেও বড়, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন অসমোর্ধ্ব, অর্থাৎ তাঁর সমান কেউ নেই, এবং তাঁর থেকে বড়ও কেউ নেই।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (৩/১৯) বর্ণনা করা হয়েছে *অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা*। এই শ্লোকে ভগবানকে হস্ত এবং পদহীন বলে বর্ণনা করা হয়েছে। যদিও এটি একটি নির্বিশেষ বর্ণনা, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, ভগবানের কোন রূপ নেই। জড় রূপের অতীত তাঁর এক চিন্ময় রূপ রয়েছে। এই শ্লোকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই পার্থক্য নিরূপণ করেছেন।

শ্লোক ১১৩

চিদানন্দ—তেঁহো, তাঁর স্থান, পরিবার ।
তাঁরে কহে—প্রাকৃত-সত্ত্বের বিকার ॥ ১১৩ ॥

শ্লোকার্থ

"পরমেশ্বর ভগবান চিন্ময় শক্তিতে পূর্ণ। তাই তাঁর রূপ, নাম, যশ এবং পরিকর সবই চিন্ময়। অজ্ঞতাবশত মায়াবাদী দার্শনিকেরা বলেন যে, সেগুলি প্রাকৃত সত্ত্বগুণের বিকার মাত্র।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতার সপ্তম অধ্যায়ে পরমেশ্বর ভগবান তাঁর শক্তিসমূহকে দুটি ভাগে বিভক্ত করেছেন—প্রাকৃত এবং অপ্রাকৃত, অথবা পরা প্রকৃতি এবং অপরা প্রকৃতি। *বিষ্ণু পুরাণেও* এই একই পার্থক্য করা হয়েছে। মায়াবাদী দার্শনিকেরা এই দুটি প্রকৃতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ—কিন্তু যিনি যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানী, তিনি সেই প্রকৃতি দুটি হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। এই জড় জগতে কত বৈচিত্র্য এবং কত রকমের কার্যকলাপ রয়েছে, সুতরাং চিৎ-জগৎ চিৎ-বৈচিত্র্যহীন হয় কি করে? কিন্তু মায়াবাদীরা তা বুঝতে পারে না। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১০/২/৩২) বলা হয়েছে—*যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ*—"চিৎ-জগৎ সম্বন্ধে যাদের

কোন ধারণাই নেই, সেই অবিশুদ্ধ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা নিজেদের মুক্ত বলে অভিমান করে।" মায়াবাদী দার্শনিকেরা তাদের অবিশুদ্ধ বুদ্ধির প্রভাবে অথবা জ্ঞানের অভাবে, জড় এবং চিৎ-বৈচিত্রের পার্থক্য বুঝতে পারে না; তাই তারা চিৎ-বৈচিত্র্য সম্বন্ধে চিন্তা করতে পারে না, কারণ তাদের বদ্ধমূল ধারণা যে, সমস্ত বৈচিত্র্যই হচ্ছে জড়।

তাই এই শ্লোকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বিশ্লেষণ করেছেন যে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমতত্ত্ব, তাঁর দেহ চিন্ময় এবং তাঁর নাম, ধাম, পরিকর এবং গুণ সমস্তই চিন্ময়। জড়া প্রকৃতির সত্ত্বগুণের সঙ্গে চিৎ-বৈচিত্র্যের কোন সম্পর্ক নেই। মায়াবাদী দার্শনিকেরা যেহেতু স্পষ্টভাবে চিৎ-বৈচিত্র্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না; তাই তারা কল্পনা করে যে, জড় জগতে যা কিছু রয়েছে, তা সব প্রত্যাখ্যান করলেই তারা চিৎ-জগতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। জড়া প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোগুণ চিৎ-জগতে সক্রিয় হতে পারে না, তাই চিৎ-জগৎকে বলা হয় নির্গুণ। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, *ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন।* জড় প্রকৃতির তিনটি গুণের প্রভাবে জড় জগতের প্রকাশ, কিন্তু এই তিনের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত চিৎ-জগতে প্রবেশ করতে হলে, এই গুণগুলি থেকে মুক্ত হতে হবে। পরবর্তী শ্লোকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মায়াবাদ দর্শন থেকে শিবকে বিযুক্ত করেছেন।

শ্লোক ১১৪

তাঁর দোষ নাহি, তেঁহো আজ্ঞাকারী দাস ।
আর যেই শুনে তার হয় সর্বনাশ ॥ ১১৪ ॥

শ্লোকার্থ

শিবের অবতার শঙ্করাচার্য নির্দোষ, কারণ তিনি হচ্ছেন ভগবানের আজ্ঞাপালনকারী দাস। কিন্তু যে তাঁর সেই মায়াবাদী দর্শন অনুসরণ করে, তার সর্বনাশ হয়। তাদের পারমার্থিক প্রগতি চিরকালের জন্য বিনষ্ট হয়ে যায়।

তাৎপর্য

মায়াবাদী দার্শনিকেরা ব্যাকরণের বাক্যবিন্যাসের মাধ্যমে তাদের বেদান্তজ্ঞান প্রদর্শন করার ব্যাপারে অত্যন্ত গর্বিত, কিন্তু *ভগবদ্গীতায়* শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, তারা হচ্ছে *মায়য়াপহৃতজ্ঞানাঃ*, অর্থাৎ মায়ার প্রভাবে প্রকৃত জ্ঞান থেকে বঞ্চিত। মায়ার দুটি

শক্তির প্রভাবে তার ক্রিয়া সম্পাদিত হয়—*বিক্ষেপাত্মিকা-শক্তি* বা জীবকে ভবসমুদ্রে প্রক্ষিপ্ত করার শক্তি এবং *আবরণাত্মিকা-শক্তি* বা জীবের জ্ঞানকে আচ্ছাদিত করার শক্তি। *ভগবদ্গীতায়* আবরণাত্মিকা-শক্তির ক্রিয়া *মায়য়াপহৃতজ্ঞানা* শব্দটিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

দৈবীমায়া বা শ্রীকৃষ্ণের মায়াশক্তি যে কোন মায়াবাদীদের জ্ঞান অপহরণ করে নেয়। সেই কথা *ভগবদ্গীতাতেও আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ* কথাটির মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। যেহেতু তারা আসুরিক অর্থাৎ ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না, তাই মায়া তাদের জ্ঞান অপহরণ করে নেয়। ভগবানের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী মায়াবাদী দুই প্রকার—শঙ্করাচার্যের অনুগামী কাশীর নির্বিশেষবাদী এবং সারনাথের বৌদ্ধগণ। এরা উভয়েই মায়াবাদী, এবং নাস্তিক দর্শনের জন্য শ্রীকৃষ্ণ তাদের জ্ঞান অপহরণ করে নেন। এরা উভয়েই ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। বৌদ্ধ-দর্শন আত্মা এবং ভগবান উভয়ের অস্তিত্বই অস্বীকার করে, এবং শঙ্কর-সম্প্রদায় যদিও সরাসরিভাবে ভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকার করে না, কিন্তু তারা বলে যে, পরমতত্ত্ব নিরাকার। তাই তারা উভয়েই *অবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ*, অর্থাৎ তাদের জ্ঞান এবং বুদ্ধি অপূর্ব এবং অবিশুদ্ধ।

বিখ্যাত মায়াবাদী সদানন্দ যোগীন্দ্র *বেদান্তসার* নামক একটি গ্রন্থে শঙ্করাচার্যের দর্শন ব্যাখ্যা করেছেন, এবং শঙ্করাচার্যের অনুগামীরা তাঁর এই গ্রন্থটির প্রভূত গুরুত্ব দান করে। এই *বেদান্তসার* গ্রন্থে সদানন্দ যোগীন্দ্র বর্ণনা করেছেন যে, সচ্চিদানন্দ অদ্বয়বস্তুই ব্রহ্ম; অজ্ঞান আদি সকল জড়সমূহই অবস্তু। এই অজ্ঞান বা জড়ের বর্ণনা করে তিনি বলেছেন, তা হচ্ছে সৎ এবং অসৎ থেকে পৃথক জ্ঞান। তা অনির্বচনীয় কিন্তু তা ত্রিগুণাত্মক। এইভাবে তিনি বিবেচনা করেছেন যে, শুদ্ধ জ্ঞান ব্যতীত যা কিছু, তা সবই জড়। এই অজ্ঞান কখনও সর্বব্যাপ্ত এবং কখনও ব্যষ্টিগতভাবে এক এবং অনেকরূপে ব্যবহৃত হয়। এই সমষ্টি উৎকৃষ্ট উপাধি বিশিষ্ট হলে 'বিশুদ্ধসত্ত্বপ্রধান' নাম লাভ করে। চৈতন্যে 'বিশুদ্ধসত্ত্বপ্রধান' (সমষ্টি অজ্ঞান) প্রতিফলিত হলে সর্বজ্ঞ, সর্বেশ্বর, সর্বনিয়ন্তা, সদসদ্ব্যক্ত, জীবসমূহের অন্তর্যামী, জগতের কারণ, 'ঈশ্বর'-সংজ্ঞা লাভ করে। 'ঈশ্বর'—সকল অজ্ঞানের প্রকাশক বলে 'সর্বজ্ঞ'। তাদের মতে, ঈশ্বরত্ব প্রাকৃত সত্ত্বের অজ্ঞানজ বিকার মাত্র। জীব—মলিনসত্ত্বপ্রধান ও ব্যষ্টি-উপাধি বিশিষ্ট। অর্থাৎ তাঁর মতে সর্বব্যাপ্ত বিষ্ণু এবং জীব উভয়েই অজ্ঞানজাত।

সরল ভাষায় বলা যায় যে, সদানন্দ যোগীন্দ্রের মতে যেহেতু সব কিছুই নিরাকার, তাই বিষ্ণু এবং জীব উভয়েই অজ্ঞানজাত। তিনি আরও বিশ্লেষণ

করেছেন যে, বৈষ্ণবদের বিশুদ্ধ সত্ত্ব সম্বন্ধে যে ধারণা, তা হচ্ছে *প্রধান* বা জড় সৃষ্টির মূলতত্ত্ব। তাঁর মতে সর্বব্যাপ্ত জ্ঞান যখন বিশুদ্ধ সত্ত্বের দ্বারা কলুষিত হয়, যা হচ্ছে সত্ত্বগুণের বিকার, তখন সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, সর্বকারণের পরম কারণ এবং অন্তর্যামী পরম ঈশ্বর-সংজ্ঞা লাভ করে। সদানন্দ যোগীন্দ্রের মতে, যেহেতু ঈশ্বর সমস্ত অজ্ঞানের আধার, তাই তাঁকে সর্বজ্ঞ বলা যায়। কিন্তু যিনি সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন, তিনি ঈশ্বরের থেকেও অধিক বা প্রভু। তাই তাঁর সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, ঈশ্বর হচ্ছেন অজ্ঞানের বিকার এবং জীব অজ্ঞানের আবরণে আচ্ছাদিত। এইভাবে তিনি ব্যষ্টি এবং সমষ্টির অস্তিত্ব অজ্ঞানাচ্ছন্ন বলে বর্ণনা করেছেন। মায়াবাদীদের মতে পরমেশ্বর ভগবান এবং তাঁর নিত্য সেবকরূপে জীব সম্বন্ধে বৈষ্ণবদের যে ধারণা, তা অজ্ঞানপ্রসূত। কিন্তু আমরা যদি *ভগবদ্গীতায়* বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি, তা হলে আমরা দেখতে পাই যে, মায়াবাদীরা হচ্ছে *মায়য়াপহৃতজ্ঞানাঃ*, কারণ তারা পরমেশ্বর ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না, অথবা তারা মনে করে যে, ভগবান হচ্ছেন মায়ার বিকার। এইগুলি আসুরিক ভাবের বৈশিষ্ট্য। সার্বভৌম ভট্টাচার্যের সঙ্গে আলোচনায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন—

জীবের নিস্তার লাগি' সূত্র কৈল ব্যাস।
মায়াবাদী-ভাষ্য শুনিলে হয় সর্বনাশ ॥

(*চৈঃ চঃ মধ্য* ৬/১৬৯)

এই জড় জগতের বন্ধন থেকে বদ্ধ জীবদের মুক্ত করার জন্য ব্যাসদেব *বেদান্ত-সূত্র* প্রণয়ন করেছিলেন, কিন্তু শঙ্করাচার্য সেই *বেদান্ত-সূত্রের* মনগড়া ভাষ্য রচনা করে মানব-সমাজের প্রভূত ক্ষতি সাধন করেছেন, কারণ তাঁর 'মায়াবাদ ভাষ্য' শুনলে সর্বনাশ হয়। *বেদান্ত-সূত্রে* স্পষ্টভাবে ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু মায়াবাদীরা মানতে চায় না যে, পরমেশ্বর ভগবানের চিন্ময় রূপ রয়েছে এবং তারা স্বীকার করতে চায় না যে, পরমেশ্বর ভগবান থেকে জীবের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রয়েছে। এইভাবে তারা নাস্তিক্যবাদ সৃষ্টি করে সমস্ত জগতের সর্বনাশ করছে, কারণ এই সিদ্ধান্ত শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির সম্পূর্ণ বিপরীত। পরমেশ্বর ভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকার করে মায়াবাদীরা যে পরম পদ প্রাপ্ত হওয়ার দুর্বাসনা করে, তার ফলে পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞান বীভৎসভাবে বিকৃত হয় এবং যে সেই দর্শন অনুসরণ করে, সে চিরতরে এই জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকে। তাই তাদের বলা হয় *অবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ*। যেহেতু তাদের বুদ্ধি কলুষিত তাই তাদের তপশ্চর্যা এবং কৃচ্ছ্রসাধনা নৈরাশ্যে পর্যবসিত হয়। এইভাবে যদিও তারা বড় পণ্ডিত বলে সম্মানিত হতে পারে, কিন্তু চরমে তারা রাজনীতি, সমাজসেবা ইত্যাদি জাগতিক

কার্যকলাপের স্তরে নেমে আসতে বাধ্য হয়। পরমেশ্বরের সঙ্গে এক হওয়ার পরিবর্তে, তারা আবার এই সমস্ত জাগতিক কার্যকলাপের সঙ্গে এক হয়ে যায়। তার বিশ্লেষণ করে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১০/২/৩২) বলা হয়েছে—*আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ॥*—মায়াবাদীরা কঠোরভাবে তপশ্চর্যা ও কৃচ্ছ্রসাধন করে এবং তার ফলে তারা নির্বিশেষ ব্রহ্মস্তরে উন্নীত হয়, কিন্তু ভগবানের চরণারবিন্দের প্রতি অবহেলা করার জন্য, তারা আবার এই জড় জগতের স্তরে অধঃপতিত হয়।

শ্লোক ১১৫

প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু-কলেবর।
বিষ্ণুনিন্দা আর নাহি ইহার উপর ॥ ১১৫ ॥

শ্লোকার্থ

"যে সমস্ত মানুষ শ্রীবিষ্ণুর সচ্চিদানন্দঘন রূপকে জড় রূপ বলে মনে করে, তারা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে সব চাইতে বড় অপরাধী। ভগবানের প্রতি এর থেকে গর্হিত অপরাধ আর নেই।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী বিশ্লেষণ করেছেন যে, পরমতত্ত্বের সবিশেষ রূপই বিষ্ণুতত্ত্ব এবং যে জড়া প্রকৃতি এই বিশ্বকে প্রকাশ করে, তা হচ্ছে শ্রীবিষ্ণুর শক্তি। জড়া প্রকৃতি বা মায়া হচ্ছে ভগবানের শক্তিমাত্র, কিন্তু মূর্খ মানুষেরা সিদ্ধান্ত করে যে, ভগবানের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই, কারণ তিনি নির্বিশেষরূপে নিজেকে বিস্তার করেছেন। পক্ষান্তরে, নির্বিশেষ ব্রহ্ম কিন্তু শক্তিমান হতে পারে না, আর তা ছাড়া বৈদিক শাস্ত্রে বর্ণনা করা হয়নি যে, মায়া আর একটি মায়ার দ্বারা আচ্ছাদিত। শাস্ত্রে বিষ্ণুমায়া (*পরাস্য শক্তিঃ*) বা শ্রীবিষ্ণুর শক্তি সম্বন্ধে শত সহস্র বর্ণনা রয়েছে। *ভগবদ্গীতায়* (৭/১৪) শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, *মম মায়া* (আমার শক্তি)। ভগবান মায়ার দ্বারা আচ্ছাদিত নন, পক্ষান্তরে মায়া পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিতা। তাই শ্রীবিষ্ণু জড়া প্রকৃতিজাত নন। *বেদান্ত-সূত্রের* প্রথমেই *জন্মাদ্যস্য যতঃ* শ্লোকে নিরূপিত হয়েছে যে, জড়া প্রকৃতিও পরব্রহ্মের প্রকাশ। তা হলে তিনি মায়াশক্তির দ্বারা আচ্ছাদিত হন কি করে? তা যদি হত, তা হলে জড়া প্রকৃতি পরব্রহ্মের থেকে অধিক শক্তিসম্পন্না হতেন। কিন্তু, এই সমস্ত সরল যুক্তিগুলি

পর্যন্ত মায়াবাদীরা বুঝতে পারে না, এবং তাই *ভগবদ্গীতায়* উক্ত *মায়য়াপহৃতজ্ঞানা* সংজ্ঞাটি তাদের ক্ষেত্রে যথাযথভাবে প্রযোজ্য। যে মনে করে শ্রীবিষ্ণু হচ্ছেন জড়া প্রকৃতিজাত, যেমন সদানন্দ যোগীন্দ্র ব্যাখ্যা করেছেন, তৎক্ষণাৎ বুঝতে হবে যে, সেই মানুষটি একটি পাগল, কারণ তার জ্ঞান মায়ার দ্বারা অপহৃত হয়েছে।

শ্রীবিষ্ণুকে দেবতার পর্যায়ভুক্ত করা যায় না। যে সমস্ত মানুষ মায়াবাদের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে অজ্ঞানের অন্ধকারে নিমজ্জিত, তারাই শ্রীবিষ্ণুকে একজন দেবতা বলে মনে করে। অথচ *ঋগ্বেদে* স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, *ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ*—"তত্ত্বজ্ঞানীরা সর্বদাই পরমেশ্বর শ্রীবিষ্ণুর পরম পদ দর্শন করেন।" এই মন্ত্র *শ্রীমদ্ভাগবতেও* প্রতিপন্ন হয়েছে। *মত্তঃ পরতরং নান্যৎ*—শ্রীকৃষ্ণ বা বিষ্ণু থেকে পরতর আর কোন তত্ত্ব নেই। তাই যাদের জ্ঞান আচ্ছন্ন হয়েছে, তারাই কেবল শ্রীবিষ্ণুকে একজন দেবতা বলে মনে করে, এবং তাই প্রস্তাব করে যে, শ্রীবিষ্ণু, কালী, দুর্গা অথবা যে কোন একজনের পূজা করা যেতে পারে এবং তাতে একই ফল লাভ হয়। এই মূঢ় সিদ্ধান্ত *ভগবদ্গীতায়* স্বীকৃত হয়নি, সেখানে (৯/২৫) সুষ্ঠুভাবে বলা হয়েছে—

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্যাজিনোঽপি মাম্ ॥

"দেবতাদের উপাসকেরা তাদের উপাস্য দেবতার অনিত্য লোক প্রাপ্ত হবে, কিন্তু ভগবানের সচ্চিদানন্দ স্বরূপের উপাসকেরা ভগবদ্ধামে ভগবানের কাছে ফিরে যাবে।" *ভগবদ্গীতায়* শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করেছেন যে, তাঁর জড় শক্তি বা মায়াকে অতিক্রম করা অত্যন্ত দুষ্কর (*দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া*)। মায়ার প্রভাব এতই প্রবল যে, বিদগ্ধ পণ্ডিত এবং পরমার্থবাদীরা পর্যন্ত মায়ার প্রভাবে আচ্ছন্ন হয়ে নিজেদের পরমেশ্বর ভগবানের সমপর্যায়ভুক্ত বলে মনে করেন। মায়ার প্রভাব থেকে মুক্ত হতে হলে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হওয়াই হচ্ছে একমাত্র উপায়। সেই কথাও *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে (*মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে*)। তাই বুঝতে হবে যে, শ্রীবিষ্ণু জড়া প্রকৃতিজাত নন, পক্ষান্তরে তিনি হচ্ছেন চিৎ-জগতের মধ্যমণি। শ্রীবিষ্ণুর কলেবর প্রাকৃত বলে মনে করা অথবা তাঁকে দেবতাদের সমপর্যায়ভুক্ত করা সব চাইতে অপরাধজনক বিষ্ণুনিন্দা, এবং শ্রীবিষ্ণুর শ্রীপাদপদ্মের প্রতি অপরাধীজনেরা কখনই পারমার্থিক জীবনে উন্নতি সাধন করতে পারে না। তাদের বলা হয় *মায়য়াপহৃতজ্ঞানা* অর্থাৎ যাদের জ্ঞান মায়ার দ্বারা অপহৃত হয়েছে।

যে মনে করে যে, শ্রীবিষ্ণুর কলেবর এবং তাঁর আত্মার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে, তা হলে বুঝতে হবে যে, সে অজ্ঞানের গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত রয়েছে। শ্রীবিষ্ণুর দেহ এবং শ্রীবিষ্ণুর আত্মার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, কারণ তাঁরা হচ্ছেন অদ্বয়জ্ঞান। এই জড় জগতে জড় দেহ এবং চেতন আত্মার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে, কিন্তু চিৎ-জগতে সব কিছুই চিন্ময়, এবং সেখানে এই রকম কোন পার্থক্য নেই। মায়াবাদীদের সব থেকে গর্হিত অপরাধ হচ্ছে, শ্রীবিষ্ণু এবং জীবকে এক বলে মনে করা। এই সম্পর্কে *পদ্ম পুরাণে* বর্ণনা করা হয়েছে—

অর্চে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিঃ ।

"যে অর্চামূর্তি বা শ্রীবিষ্ণুর আরাধ্য বিগ্রহকে পাথর বলে মনে করে, শ্রীগুরুদেবকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে এবং বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি করে, সে নারকী।" তাই মায়াবাদী সিদ্ধান্ত যে অনুসরণ করে, তার সর্বনাশ হয়।

শ্লোক ১১৬

ঈশ্বরের তত্ত্ব—যেন জ্বলিত জ্বলন ।
জীবের স্বরূপ—যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ ॥ ১১৬ ॥

শ্লোকার্থ

"ভগবান হচ্ছেন যেন এক বিশাল জ্বলন্ত অগ্নির মতো, এবং জীবের স্বরূপ হচ্ছে সেই অগ্নির স্ফুলিঙ্গের কণার মতো।

তাৎপর্য

যদিও স্ফুলিঙ্গ এবং একটি বিরাট আগুন, উভয়েরই দহন করার শক্তি রয়েছে, কিন্তু অগ্নির দহনশক্তি এবং স্ফুলিঙ্গের দহনশক্তি এক নয়। কেউ যদি তার স্বরূপগতভাবে একটি ছোট্ট স্ফুলিঙ্গের মতো হয়, তবে কেন সে কৃত্রিমভাবে একটি বিরাট আগুন হওয়ার চেষ্টা করবে? সেটি হচ্ছে অজ্ঞান। পক্ষান্তরে বুঝতে হবে যে, পরমেশ্বর ভগবান এবং অণুসদৃশ জীব, উভয়েরই জড়ের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই, কিন্তু চিৎ-স্ফুলিঙ্গসদৃশ জীব যখন জড় জগতের সংস্পর্শে আসে, তখন তার অগ্নিসদৃশ গুণগুলি নিভে যায়। সেটিই হচ্ছে বদ্ধ জীবের অবস্থা। যেহেতু তারা জড়া প্রকৃতির সংস্পর্শে এসেছে, তাই তাদের চিন্ময় গুণগুলি প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু যেহেতু এই সমস্ত চিৎ-স্ফুলিঙ্গগুলি হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন অংশ, যে কথা

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* বলেছেন (*মমৈবাংশঃ*), তাই তারা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে, তাদের চিন্ময় স্বরূপে আবার অধিষ্ঠিত হতে পারে। এটি বিশুদ্ধ দার্শনিক উপলব্ধি। *ভগবদ্গীতায়* চিৎ-স্ফুলিঙ্গকে সনাতন (নিত্য) বলে বর্ণনা করা হয়েছে; তাই জড়া প্রকৃতি বা মায়া তাদের স্বরূপকে নষ্ট করতে পারে না।

কেউ যদি বলে, "এই চিৎকণা সৃষ্টি করার কি প্রয়োজন ছিল?" তার উত্তরে বলা যায়, যেহেতু পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সর্বশক্তিমান, তাই তাঁর সসীম ক্রিয়াপ্রবৃত্তি এবং অণুক্রিয়াপ্রবৃত্তি রয়েছে। এটি হচ্ছে সর্বশক্তিমান কথাটির অর্থ। সর্বশক্তিমান হতে হলে তাঁর যে কেবল অসীম শক্তিই থাকবে তা নয়, তাঁর অসীম শক্তিও থাকবে। এইভাবে তাঁর সর্বশক্তিমত্তা প্রদর্শন করার জন্য ভগবান উভয় শক্তিই প্রদর্শন করেন। জীব যদিও ভগবানের অংশ, তবুও সে অণুশক্তিসম্পন্ন। অসীম ক্রিয়াপ্রবৃত্তি থেকে ভগবান ঈশ্বরস্বরূপ ও চিৎ-জগতে বৈকুণ্ঠতত্ত্ব প্রকাশ করেন, আর তার অণুক্রিয়া-প্রবৃত্তি থেকে অণুচৈতন্য-রূপ অনন্ত জীব প্রকাশ করেন; এই প্রবৃত্তিকে 'জীবশক্তি' বলা হয়। *ভগবদ্গীতায়* ভগবান বলেছেন—

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্ ।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ ॥

"হে মহাবাহো অর্জুন! এই অপরা প্রকৃতির অতীত আমার আর একটি পরা প্রকৃতি আছে। সেই প্রকৃতি চৈতন্য-স্বরূপা ও জীবভূতা; সেই শক্তি থেকে জীবসমূহ নিঃসৃত হয়ে জড় জগৎকে ভোগ করার জন্য সংগ্রাম করছে এবং এই জগৎকে ধারণ করে আছে" (*ভগবদ্গীতা* ৭/৫)। *জীবভূত* বা জীবেরা তাদের অণুসদৃশ শক্তির দ্বারা এই জড় জগৎকে নিয়ন্ত্রণ করছে। সাধারণত মানুষ বৈজ্ঞানিক এবং যন্ত্রবিৎদের কার্যকলাপ দেখে বিস্ময়াভিভূত হয়। মায়ার প্রভাবে তারা মনে করে যে, ভগবানের কোন প্রয়োজন নেই, এবং তারাই সব কিছু করতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা তা পারে না। যেহেতু এই জগৎ সীমিত, তাই তাদের অস্তিত্বও সীমিত। এই জগতে সব কিছুই সসীম, তাই এখানে সৃষ্টি, স্থিতি এবং বিনাশ রয়েছে। কিন্তু অসীম শক্তির জগৎ—চিৎ-জগতে সৃষ্টিও নেই, ধ্বংসও নেই।

পরমেশ্বর ভগবানের যদি অসীম শক্তি ও সসীম শক্তি, এই উভয় শক্তি না থাকত, তা হলে তাঁকে সর্বশক্তিমান বলা যেত না। *অণোরণীয়ান্মহতো মহীয়ান্*—তিনি মহত্তম থেকেও মহত্তর এবং ক্ষুদ্রতম থেকেও ক্ষুদ্রতর। তিনি জীবরূপে ক্ষুদ্রতম থেকেও ক্ষুদ্রতর এবং কৃষ্ণরূপে মহত্তম থেকেও মহত্তর। যদি কাউকে নিয়ন্ত্রণ করার না থাকে, তা হলে ভগবানের ঈশ্বরত্ব প্রতিপন্ন হয় না, ঠিক যেমন

প্রজা না থাকলে রাজা হওয়ার কোন অর্থই হয় না। সমস্ত প্রজারাই যদি রাজা হয়ে যায় তা হলে রাজা আর সাধারণ নাগরিকের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। সুতরাং ভগবান যেহেতু পরম ঈশ্বর, তাই তাঁর নিয়ন্ত্রণ করার জগৎ থাকতেই হবে। জীবের অস্তিত্বের মৌলিক তত্ত্বকে বলা হয় *চিদ্বিলাস*। সর্বশক্তিমান ভগবান জীবরূপে আনন্দদায়িনী শক্তিকে প্রকাশ করেন। *বেদান্ত-সূত্রে* ভগবানকে *আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি হচ্ছেন আনন্দের উৎস, এবং যেহেতু তিনি আনন্দ উপভোগ করতে চান, তাই তাঁকে আনন্দ দেওয়ার বা আনন্দ উপভোগ করার প্রবণতা উদ্রেক করার শক্তি অপরিহার্য। পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে এটিই হচ্ছে পূর্ণ দার্শনিক সিদ্ধান্ত।

শ্লোক ১১৭

জীবতত্ত্ব—শক্তি, কৃষ্ণতত্ত্ব—শক্তিমান্ ।
গীতা-বিষ্ণুপুরাণাদি তাহাতে প্রমাণ ॥ ১১৭ ॥

শ্লোকার্থ

"জীবতত্ত্ব হচ্ছে শক্তি, শক্তিমান নয়। শক্তিমান হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। ভগবদ্গীতা, বিষ্ণুপুরাণ আদি বৈদিক শাস্ত্রে তা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

তাৎপর্য

পূর্বেই বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, পারমার্থিক পথে উন্নতি সাধন করার জন্য তিনটি প্রস্থান রয়েছে—*ন্যায়-প্রস্থান* (*বেদান্ত-দর্শন*), *শ্রুতি-প্রস্থান* (*উপনিষদ* ও বৈদিক মন্ত্রসমূহ) এবং *স্মৃতি-প্রস্থান* (*ভগবদ্গীতা, মহাভারত, পুরাণ* ইত্যাদি)। দুর্ভাগ্যবশত মায়াবাদীরা *স্মৃতি-প্রস্থান* স্বীকার করে না। *স্মৃতি* বলতে বৈদিক প্রমাণভিত্তিক সিদ্ধান্তকে বোঝায়। কখনও কখনও মায়াবাদীরা *ভগবদ্গীতা* এবং *পুরাণের* প্রামাণিকতা স্বীকার করে না। একে বলা হয় *অর্ধকুক্কুটী-ন্যায়*। কেউ যদি বৈদিক শাস্ত্র বিশ্বাস করে, তা হলে তাকে মহান আচার্যদের স্বীকৃত সমস্ত বৈদিক শাস্ত্র স্বীকার করতে হবে, কিন্তু এই সমস্ত মায়াবাদী দার্শনিকরা কেবল *ন্যায়-প্রস্থান* এবং *শ্রুতি-প্রস্থান* স্বীকার করে, কিন্তু *স্মৃতি-প্রস্থান* বর্জন করে। এখানে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কিন্তু *ভগবদ্গীতা, বিষ্ণুপুরাণ* ইত্যাদি *স্মৃতি-প্রস্থানের* প্রমাণ প্রদর্শন করেছেন। *ভগবদ্গীতা, মহাভারত* এবং *পুরাণ* আদি বৈদিক শাস্ত্রের বর্ণনা স্বীকার করলে, পরমেশ্বর ভগবানকে না মেনে পারা যায় না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাই *ভগবদ্গীতার* (৭/৫) একটি শ্লোকের উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

শ্লোক ১১৮

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্ ।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ ॥ ১১৮ ॥

শব্দার্থ

অপরা—নিকৃষ্টা শক্তি; **ইয়ম্**—এই জড় জগৎ; **ইতঃ**—এর অতীত; **তু**—কিন্তু; **অন্যাম্**—আর একটি; **প্রকৃতিম্**—শক্তি; **বিদ্ধি**—জেনে রাখ; **মে**—আমার; **পরাম্**—উৎকৃষ্ট শক্তি; **জীব-ভূতাম্**—তারা হচ্ছে জীব; **মহা-বাহো**—হে পরাক্রমশালী; **যয়া**—যার দ্বারা; **ইদং**—এই; **ধার্যতে**—ধারণ করে আছে; **জগৎ**—জড় জগৎ।

অনুবাদ

" 'হে মহাবাহো অর্জুন, এই অপরা প্রকৃতির অতীত আমার আর একটি পরা প্রকৃতি রয়েছে। সেই প্রকৃতি চৈতন্য-স্বরূপা ও জীবভূতা; সেই শক্তি থেকে জীবসমূহ নিঃসৃত হয়ে জড় জগৎকে ধারণ করে আছে।'

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় বর্ণনা করা হয়েছে যে, মাটি, জল, আগুন, বায়ু এবং আকাশ, এই পঞ্চভূতরূপ স্থূল জগৎ, এবং মন বুদ্ধি ও অহংকাররূপ সূক্ষ্ম জগৎ—এই অষ্ট প্রকারে বিভক্ত প্রকৃতি—'অপরা' বা 'জড়া'; এর নাম 'মায়া প্রকৃতি'। *ভগবদ্গীতায়* বর্ণনা করা হয়েছে, *মম মায়া দুরত্যয়া*—মায়া নামক ভগবানের এই নিকৃষ্টা শক্তি এতই প্রবল যে, যদিও এই শক্তিসম্ভূত নয়, তবুও এই নিকৃষ্টা প্রকৃতির মহতী শক্তির প্রভাবে জীব তার স্বরূপ বিস্মৃত হয়ে, এই মায়ার দ্বারা আবদ্ধ হয়ে পড়ে। শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, এই জড়া প্রকৃতির অতীত *জীবভূত* নামে আর একটি উৎকৃষ্টা প্রকৃতি রয়েছে। সমস্ত জীব সেই উৎকৃষ্টা প্রকৃতিজাত। কিন্তু সেই উৎকৃষ্টা প্রকৃতিজাত জীব যখন জড়া প্রকৃতির সংস্পর্শে আসে, তখন তার সমস্ত কার্যকলাপ সেই জড়া প্রকৃতিতেই সম্পাদিত হয়।

পরম কারণ হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ (*জন্মাদ্যস্য যতঃ*), যিনি বিভিন্নভাবে ক্রিয়াশীল সমস্ত শক্তির উৎস। ভগবানের উৎকৃষ্টা এবং নিকৃষ্টা, উভয় শক্তিই রয়েছে, এবং তাদের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে যে, উৎকৃষ্টা প্রকৃতি বাস্তব, কিন্তু নিকৃষ্টা প্রকৃতি সেই উৎকৃষ্টা প্রকৃতির প্রতিফলন। দর্পণে অথবা জলে সূর্যের প্রতিবিম্বকে সূর্য বলেই মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা সূর্য নয়। তেমনই, জড় জগৎ হচ্ছে চিজ্জগতের প্রতিফলন।

আপাতদৃষ্টিতে যদিও তা বাস্তব বলে মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়; তা কেবল অনিত্য প্রতিবিম্ব মাত্র, কিন্তু চিৎ-জগৎ হচ্ছে বাস্তব। স্থূল এবং সূক্ষ্মরূপ জড় জগৎ কেবল চিৎ-জগতের প্রতিবিম্ব মাত্র।

জীব জড় জগৎ-সম্ভূত নয়; সে হচ্ছে চিন্ময় শক্তি, কিন্তু জড় জগতের সংস্পর্শে আসার ফলে সে তার পরিচয় বিস্মৃত হয়েছে। তার ফলে জীব নিজেকে জড় বলে মনে করে যন্ত্রবিৎ, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ইত্যাদি রূপে প্রবল উদ্যমে জড় কার্যকলাপে লিপ্ত হয়েছে। সে জানে না যে, তার জড় দেহটি তার স্বরূপ নয়, তার স্বরূপে সে হচ্ছে চিন্ময় আত্মা। এইভাবে তার প্রকৃত স্বরূপ বিস্মৃত হওয়ার ফলে, সে এই জড় জগতে বেঁচে থাকার জন্য কঠোর জীবন সংগ্রামে লিপ্ত হয়। এই আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন জীবের সেই স্বরূপগত চেতনার পুনর্জাগরণের চেষ্টা করছে। বিশাল গগনচুম্বী অট্টালিকা তৈরি, মহাশূন্যে উপগ্রহ ক্ষেপণ ইত্যাদি কার্যকলাপের মাধ্যমে তার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু এই ধরনের বুদ্ধিমত্তা উন্নতির পরিচায়ক নয়। তার একমাত্র কর্তব্য এই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া। সেটি সকলেরই জানা আবশ্যক। জড় কার্যকলাপে চিত্ত মগ্ন থাকার ফলে, তাকে বারংবার এই জড় জগতে জড় দেহ ধারণ করতে হয়। যদিও সে ভ্রান্তভাবে নিজেকে অত্যন্ত বুদ্ধিমান বলে দাবি করছে, কিন্তু জড় জগতের পরিপ্রেক্ষিতে সে মোটেই বুদ্ধিমান নয়। যখন আমরা কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের কথা বলি যা মানুষের যথার্থ বুদ্ধিমত্তার বিকাশ করার পথ প্রদর্শন করছে, তখন বদ্ধ জীব এই আন্দোলনকে ভুল বোঝে। জড়-জাগতিক কার্যকলাপে সে এতই মগ্ন যে, সে বুঝতে পারে না বড় বড় বাড়ি করা, চওড়া রাস্তা তৈরি করা, আর গাড়ি তৈরি করার ঊর্ধ্বে তার আর কোন প্রয়োজনীয় কার্য থাকতে পারে। এটিই হচ্ছে *মায়য়াপহৃতজ্ঞানা* বা মায়ার প্রভাবে বুদ্ধিভ্রষ্ট হওয়ার প্রমাণ। জীব যখন এই ভ্রান্ত ধারণা থেকে মুক্ত হয়, তখন তাকে বলা হয় মুক্ত জীব। এইভাবে যথার্থ মুক্তিলাভ করলে, তখন আর সে এই জড় জগতের পরিপ্রেক্ষিতে নিজের পরিচয় প্রদান করে না। মুক্তির লক্ষণ হচ্ছে, জড়-জাগতিক কার্যকলাপে ভ্রান্তভাবে লিপ্ত থাকার পরিবর্তে চিন্ময় কার্যকলাপে মগ্ন হওয়া।

ভগবদ্ভক্তি হচ্ছে চিন্ময় জীবাত্মার চিন্ময় ক্রিয়া। মায়াবাদীরা চিন্ময় ক্রিয়ার সঙ্গে জড় ক্রিয়ার পার্থক্য বুঝতে পারে না। কিন্তু *ভগবদ্গীতায়* (১৪/২৬) প্রতিপন্ন হয়েছে—

মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে ।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥

যিনি অব্যভিচারিণী ভক্তিযোগে যুক্ত হয়েছেন, তিনি তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মভূত স্তরে উন্নীত হন, তখন আর তিনি এই জড় জগতে থাকেন না, তিনি চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত হন। ভগবদ্ভক্তি হচ্ছে চেতনার পূর্ণ বিকাশ বা পুনর্জাগরণ। জীব যখন সদ্‌গুরুর নির্দেশনায় চিন্ময় ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করে, তখন সে পূর্ণজ্ঞান প্রাপ্ত হয়, এবং হৃদয়ঙ্গম করতে পারে যে, সে ভগবান নয়, পক্ষান্তরে সে হচ্ছে ভগবানের নিত্য দাস। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেই সম্বন্ধে বলেছেন, *জীবের 'স্বরূপ' হয়— কৃষ্ণের 'নিত্যদাস'* (*শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মধ্য* ২০/১০৮)। যতক্ষণ পর্যন্ত না জীব এই সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছে, ততক্ষণ তাকে অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকতে হয়। *ভগবদ্‌গীতাতেও* (৭/১৯) সেই তত্ত্ব প্রতিপন্ন করে ভগবান বলেছেন, *বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্মাং প্রপদ্যতে*—"বহু বহু জন্ম-জন্মান্তরে জীবন সংগ্রামে লিপ্ত থেকে এবং জ্ঞানের অন্বেষণ করে জীব যখন পূর্ণজ্ঞানে অধিষ্ঠিত হয়, তখন সে আমার শরণাগত হয়।" এই ধরনের মহাত্মা অত্যন্ত দুর্লভ। অতএব মায়াবাদীদের যদিও অত্যন্ত জ্ঞানী বলে মনে হয়, কিন্তু তারা এখনও পূর্ণজ্ঞান লাভ করতে পারেনি। সেই পূর্ণজ্ঞানে উপনীত হতে হলে, তাদের অবশ্যই স্বতঃস্ফূর্তভাবে শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হতে হবে।

শ্লোক ১১৯

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা ।
অবিদ্যাকর্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥ ১১৯ ॥

শব্দার্থ

বিষ্ণু-শক্তিঃ—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শক্তি; পরা—চিন্ময়; প্রোক্তা—উক্ত হয়; ক্ষেত্রজ্ঞ-আখ্যা—ক্ষেত্রজ্ঞ নামক শক্তি; তথা—তেমনই; পরা—চিন্ময়; অবিদ্যা—অজ্ঞান; কর্ম—সকাম কর্ম; সংজ্ঞা—পরিচিত; অন্যা—অন্য; তৃতীয়া—তৃতীয়; শক্তিঃ—শক্তি; ইষ্যতে—এইভাবে পরিচিত।

অনুবাদ

" 'বিষ্ণুশক্তি তিন প্রকার—পরা, ক্ষেত্রজ্ঞা ও অবিদ্যা। পরাশক্তি হচ্ছে চিৎ-শক্তি; ক্ষেত্রজ্ঞাশক্তি হচ্ছে জীবশক্তি, যা পরাশক্তি সম্ভূত হলেও অবিদ্যার দ্বারা আচ্ছন্ন হতে পারে; এবং তৃতীয় শক্তিটি হচ্ছে কর্মসংজ্ঞারূপা অবিদ্যা শক্তি অর্থাৎ মায়াশক্তি।'

তাৎপর্য

ভগবদ্‌গীতা থেকে উদ্ধৃত পূর্ববর্তী শ্লোকে প্রতিপন্ন হয়েছে যে, জীব ভগবানের শক্তি। ভগবান শক্তিমান এবং তাঁর বহুবিধ শক্তি রয়েছে (*পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে*)। *বিষ্ণুপুরাণ* থেকে উদ্ধৃত এই শ্লোকটিতেও তা প্রতিপন্ন হয়েছে। বিভিন্ন প্রকারের শক্তি রয়েছে, এবং তাদের তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে—চিন্ময় শক্তি, তটস্থা শক্তি এবং বহিরঙ্গা শক্তি।

চিৎ-শক্তি চিৎ-জগতে প্রকাশিত। শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলা, পরিকর আদি সব কিছুই চিন্ময়। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্‌গীতাতেও* বলা হয়েছে—

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্ ।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥

"যদিও আমি জন্মরহিত এবং আমার চিন্ময় দেহ অব্যয় এবং যদিও আমি সব কিছুর অধীশ্বর, তবুও আমি আমার স্বীয় প্রকৃতিকে আশ্রয় করে আত্মমায়ায় জন্মগ্রহণ করি" (*ভগবদ্‌গীতা* ৪/৬)। *আত্মমায়া* বলতে চিচ্ছক্তিকে বোঝায়। এই ব্রহ্মাণ্ডে বা অন্য কোন ব্রহ্মাণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হন তাঁর চিৎ-শক্তির প্রভাবে। আমরা জন্মগ্রহণ করি জড়া প্রকৃতির নিয়মে কর্মফলের বন্ধন অনুসারে, কিন্তু *বিষ্ণুপুরাণের* বর্ণনা অনুসারে, ক্ষেত্রজ্ঞ বা জীব পরা প্রকৃতি সম্ভূত; তাই আমরা যখন জড়া প্রকৃতির বন্ধন থেকে মুক্ত হই, তখন আমরাও চিৎ-জগতে প্রবেশ করতে পারি।

জড়া প্রকৃতি হচ্ছে অবিদ্যা শক্তি বা চিৎ-জগৎ সম্বন্ধে পূর্ণ অজ্ঞান। জড় জগতে জীব জড়সুখ ভোগের আশায় নানা রকম সকাম কর্মে লিপ্ত হয়। এই কলিযুগে তা অত্যন্ত প্রবলভাবে প্রকাশিত, কারণ মানব-সমাজ চিন্ময় প্রকৃতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে অজ্ঞ থেকে জড়-জাগতিক কার্যকলাপের মহতী আয়োজনে ব্যস্ত। এই যুগের মানুষ তাদের চিন্ময় স্বরূপ সম্বন্ধে প্রায় সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ। তারা মনে করে যে, জড় উপাদানগুলি থেকে তাদের সৃষ্টি হয়েছে এবং সেই জড় দেহটির বিনাশে সব কিছুই শেষ হয়ে যাবে। তাই তারা স্থির করেছে যে, জড় ইন্দ্রিয় সমন্বিত এই জড় দেহটি যতক্ষণ রয়েছে, ততক্ষণ পূর্ণমাত্রায় ইন্দ্রিয়সুখ উপভোগ করে যেতে হবে। যেহেতু তারা নাস্তিক, তাই তারা পুনর্জন্ম বিশ্বাস করে না। এই শ্লোকে এই সমস্ত কার্যকলাপকে *অবিদ্যাকর্মসংজ্ঞান্যা* বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

অবিদ্যা বা জড়শক্তি ভগবানের চিৎ-শক্তি থেকে ভিন্ন। তাই যদিও তা ভগবানেরই শক্তি, তবুও ভগবান তাতে উপস্থিত থাকেন না। *ভগবদ্‌গীতাতেও* ভগবান বলেছেন, *মৎস্থানি সর্বভূতানি*— "সব কিছুই আমাকে আশ্রয় করে বিরাজ

করছে।" (*ভগবদ্গীতা* ৯/৪) এই উক্তি থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, সব কিছুই ভগবানের শক্তিকে আশ্রয় করে রয়েছে। যেমন, গ্রহ-নক্ষত্রগুলি মহাশূন্যের আশ্রয়ে রয়েছে, যা হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের বহিরঙ্গা শক্তি। *ভগবদ্গীতায়* শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥

"ভূমি, জল, আগুন, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি এবং অহংকার—এই আটটি উপাদান দিয়ে আমার ভিন্না প্রকৃতি গঠিত হয়েছে" (*ভগবদ্গীতা* ৭/৪)। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যেন ভগবানের ভিন্না প্রকৃতি স্বতন্ত্রভাবে ক্রিয়া করছে, কিন্তু এখানে বলা হয়েছে যে, সেই শক্তিগুলি অবশ্যই বাস্তব, কিন্তু সেইগুলি ভিন্না মাত্র—স্বতন্ত্র নয়।

একটি ব্যবহারিক দৃষ্টান্তের মাধ্যমে এই ভিন্না প্রকৃতিকে উপলব্ধি করা যায়। আমি dictaphone (কথা রেকর্ড করার এক প্রকার যন্ত্র বিশেষ)-এ কথা বলে গ্রন্থ রচনা করি, আর dictaphone-এর টেপটি যখন বাজানো হয়, তখন মনে হয় যেন আমিই কথা বলছি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমি কথা বলছি না। আমি কথা বলেছি, এবং dictaphone যন্ত্রে আমার সেই কথাগুলি বাণীবদ্ধ করা হয়েছে, যা আমার থেকে ভিন্ন, কিন্তু তা আমারই মতো ক্রিয়া করে। তেমনই, জড়া প্রকৃতি মূলত পরমেশ্বর ভগবান থেকেই উদ্ভূত, কিন্তু তা ভিন্নভাবে ক্রিয়া করে, যদিও ভগবানই সেই শক্তি সরবরাহ করেছেন। *ভগবদ্গীতাতেও* তার বিশ্লেষণ হয়েছে। *ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্*—"এই জড়া প্রকৃতি আমার পরিচালনায় পরিচালিত হচ্ছে, এবং হে কুন্তীপুত্র। তা চরাচর জগৎ প্রসব করে।" (*ভগবদ্গীতা* ৯/১০) পরমেশ্বর ভগবানের অধ্যক্ষতায় জড়া প্রকৃতি ক্রিয়া করে, এবং আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যেন তা স্বতন্ত্রভাবে ক্রিয়া করছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা স্বতন্ত্র নয়।

বিষ্ণু পুরাণ থেকে উদ্ধৃত এই শ্লোকটিতে পরমেশ্বর ভগবানের শক্তিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে—যথা, চিৎ-শক্তি বা ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি, তটস্থা বা ক্ষেত্রজ্ঞ (জীব) শক্তি এবং পরমেশ্বর ভগবান থেকে ভিন্না বহিরঙ্গা শক্তি বা জড় শক্তি। শ্রীল ব্যাসদেব যখন ধ্যানের মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করেন, তখন তিনি ভগবানের পশ্চাতে দণ্ডায়মানা মায়াশক্তিকেও দর্শন করেছিলেন (*অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়ম্*)। ব্যাসদেব বুঝতে পেরেছিলেন যে, এটি হচ্ছে ভগবানের ভিন্না শক্তি বা মায়াশক্তি, যা জীবের জ্ঞান আচ্ছন্ন করে (*যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্*)। ভিন্না, জড়া প্রকৃতি জীবকে মোহাচ্ছন্ন করে এবং

তার প্রভাবে জীব জীবনের উদ্দেশ্য বিস্মৃত হয়ে কঠোর পরিশ্রম করে। দুর্ভাগ্যবশত তাদের প্রায় সকলেই মনে করে যে, তাদের দেহটিই হচ্ছে তাদের স্বরূপ এবং জড় ইন্দ্রিয়গুলি উপভোগ করাই হচ্ছে তাদের জীবনের চরম লক্ষ্য, কারণ মৃত্যুর পর সব কিছু শেষ হয়ে যাবে। এই নাস্তিক দর্শন বহুকাল পূর্বে ভারতবর্ষে চার্বাক মুনি কর্তৃক প্রবর্তিত হয়ে প্রসার লাভ করেছিল। তাঁর মতে—

ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ।
ভস্মীভূতস্য দেহস্য কুতঃ পুনরাগমনো ভবেৎ ॥

তাঁর মতে যতদিন পর্যন্ত জীবন আছে, ততদিন যত পারা যায় ঘি খেতে হবে। ভারতবর্ষে ঘি থেকে নানা রকম উপাদেয় খাবার তৈরি করা হয়। যেহেতু সকলেই ভাল খাবার খেতে চায়, তাই যত সম্ভব ঘি খাওয়ার জন্য চার্বাক মুনি উপদেশ দিয়েছেন। কেউ বলতে পারে, "আমার টাকা নেই। তা হলে আমি ঘি খাব কি করে?" তাই চার্বাক মুনি বলেছেন, "তোমার যদি টাকা না থাকে, তা হলে ভিক্ষা করে হোক, ধার করে হোক, চুরি করে হোক, যেভাবেই হোক না কেন ঘি সংগ্রহ করে জীবনটাকে উপভোগ কর।" যদি কেউ বলে যে, ঋণ করা অথবা চুরি করার মতো অবৈধ কর্ম করলে, পরবর্তী জীবনে তার ফল ভোগ করতে হবে। তার উত্তরে চার্বাক মুনি বলেছেন, "ফলভোগ করার দায়িত্ব নেই, কারণ মৃত্যুর পর দেহ যখন ভস্মীভূত হয়ে যাবে, তখন সব কিছু শেষ হয়ে যাবে।" একে বলা হয় অজ্ঞান। *ভগবদ্গীতা* থেকে জানা যায় যে, দেহের বিনাশ হলেও আত্মার বিনাশ হয় না (*ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে*)। দেহের বিনাশ মানে হচ্ছে অপর আর একটি দেহ লাভ করা (*তথা দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ*)। তাই অবৈধ কর্ম করা বা পাপ করা অত্যন্ত বিপজ্জনক। আত্মা এবং তার দেহান্তর সম্বন্ধে কোন জ্ঞান না থাকার ফলে, মানুষ মায়ার প্ররোচনায় নানা রকম পাপকর্মে লিপ্ত হয়। তারা মনে করে যে, চিন্ময় অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন জ্ঞান ছাড়াই, কেবল জড় জ্ঞানের প্রভাবে তারা সুখী হতে পারবে। তাই জড় জগৎ এবং তার ক্রিয়াকে এখানে *অবিদ্যাকর্ম সংজ্ঞান্যা* বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

জড়া প্রকৃতির প্রভাবে আচ্ছন্ন মানুষের অজ্ঞানান্ধকার দূর করার জন্য ভগবান এই জড় জগতে অবতরণ করেন (*যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত*)। জীব যখন তার স্বরূপ ভ্রষ্ট হয়, তখন ভগবান এসে তাদের শিক্ষা দেন, *সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*—"হে জীবগণ! তোমাদের সব রকম জড় কার্যাদি পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও, তা হলে আমি তোমাদের রক্ষা করব।" (*ভগবদ্গীতা* ১৮/৬৬)

চার্বাক মুনির নির্দেশ হচ্ছে *ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ*। এইভাবে দেখা যায় যে, ভারতবর্ষের সব থেকে বড় নাস্তিকও নির্দেশ দিচ্ছেন ঘি খাওয়ার জন্য, মাংস খাওয়ার জন্য নয়। মানুষ যে বাঘ অথবা কুকুরের মতো মাংস খাবে, তা কেউ কখনও কল্পনাও করতে পারত না, কিন্তু আজকের মানুষ এতই অধঃপতিত হয়েছে যে, তারা পশুর মতো হয়ে গেছে। সুতরাং আধুনিক সভ্যতাকে মানব-সভ্যতা বলা যায় না।

শ্লোক ১২০

হেন জীবতত্ত্ব লঞা লিখি' পরতত্ত্ব ।
আচ্ছন্ন করিল শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর-মহত্ত্ব ॥ ১২০ ॥

শ্লোকার্থ

"মায়াবাদ দর্শন এতই নীচ যে, জীবকে ভগবান বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তার ফলে পরতত্ত্ব পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা এবং শ্রেষ্ঠত্ব আচ্ছাদিত হয়েছে।

তাৎপর্য

এই সম্পর্কে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন যে, সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে জীবতত্ত্বকে ভগবানের শক্তি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কেউ যদি অণুসদৃশ ভগবৎ-শক্তি জীবকে পরমব্রহ্ম পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে সমান বলে মনে করে, তা হলে বুঝতে হবে যে, তার সেই দর্শন সম্পূর্ণভাবে ভ্রান্ত। দুর্ভাগ্যবশত, শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য জেনে শুনেই এই ভ্রান্ত দর্শন প্রচার করেছেন। তাই তাঁর সমস্ত দর্শন ভুলের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এবং তা বিপথে পরিচালিত করে মানুষকে নাস্তিকে পরিণত করে, এবং তাদের জীবনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। *ভগবদ্গীতার* বর্ণনা অনুসারে মানব-জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে, পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হওয়ার মাধ্যমে ভগবদ্ভক্তে পরিণত হওয়া। কিন্তু মায়াবাদ দর্শন ভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকার করে জীবকে ভ্রান্ত পথে পরিচালনা করে এবং তার ফলে জীব মনে করে যে, সে-ই হচ্ছে পরম ঈশ্বর। এইভাবে তা শত সহস্র নিরীহ মানুষকে বিপথে পরিচালিত করে।

বেদান্ত-সূত্রে ব্যাসদেব বর্ণনা করেছেন যে, পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সর্বশক্তিমান এবং চিৎ ও অচিৎ সব কিছুই তাঁর শক্তি থেকে প্রকাশিত হয়েছে। পরমব্রহ্ম পরমেশ্বর ভগবান সব কিছুরই উৎস (*জন্মাদ্যস্য যতঃ*), এবং সব কিছুই ভগবানের বিভিন্ন শক্তির প্রকাশ। সেই কথা *বিষ্ণু পুরাণেও* বর্ণিত হয়েছে—

একদেশস্থিতস্যাগ্নের্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা ।
পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথেদমখিলং জগৎ ॥

"অগ্নি যেমন এক স্থানে অবস্থিত থেকেও সর্বত্র তার কিরণ বিস্তার করে, তেমনই, পরমেশ্বর ভগবানের শক্তির প্রভাবে সমস্ত জগতের প্রকাশ হয়েছে।" এই দৃষ্টান্তটি অত্যন্ত উজ্জ্বল। তেমনই, আবার বর্ণনা করা হয়েছে যে, এই জড় জগতের সব কিছুই যেমন সূর্যের শক্তি সূর্যকিরণের উপর নির্ভর করে বিরাজ করে, তেমনই সব কিছুই পরমেশ্বর ভগবানের চিৎ-শক্তি এবং জড় শক্তিকে নির্ভর করে বিরাজ করে। শ্রীকৃষ্ণ যদিও তাঁর নিত্যধাম গোলোক-বৃন্দাবনে থাকেন (*গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো*), যেখানে নিরন্তর তাঁর গোপসখা এবং ব্রজগোপিকাদের সঙ্গে অপ্রাকৃত লীলাবিলাস করা সত্ত্বেও, তিনি সর্বত্রই বিরাজমান, এমন কি ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি অণুপরমাণুতেও (*অণ্ডান্তরস্থপরমাণুচয়ান্তরস্থম্*)। এটি হচ্ছে বেদের তথ্য।

দুর্ভাগ্যবশত, মায়াবাদ দর্শন জীবকে পরমেশ্বর বলে দাবি করে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে এবং সমস্ত জগৎ জুড়ে ব্যাপকভাবে নাস্তিক্যবাদ প্রচার করে জগতের সর্বনাশ করছে। পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা এবং শ্রেষ্ঠত্ব আচ্ছাদিত করে, মায়াবাদ দর্শন মানব-সমাজের সব-চাইতে বড় ক্ষতি সাধন করেছে। এই জঘন্য মায়াবাদ দর্শন প্রতিহত করার জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু *হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রের* প্রচার করেছেন।

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্ ।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

"কলহ এবং প্রবঞ্চনার যুগ, এই কলিযুগে ভববন্ধন মোচনের একমাত্র উপায় হচ্ছে ভগবানের দিব্যনাম কীর্তন করা। এ ছাড়া আর কোন উপায় নেই, আর কোন উপায় নেই, আর কোন উপায় নেই।" মানুষকে কেবল *হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র* কীর্তন করতে হবে এবং তার ফলে তারা ধীরে ধীরে বুঝতে পারবে যে, তারা পরমেশ্বর ভগবান নয়, তারা হচ্ছে ভগবানের নিত্য সেবক। এইভাবে মায়াবাদ দর্শনের প্রভাব থেকে তারা মুক্ত হবে। জীব যখন পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়, তখন সে ভববন্ধন থেকে মুক্ত হয়।

মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে ।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥

"কেউ যখন পূর্ণরূপে ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হয়, তখন আর কোন অবস্থাতেই তার অধঃপতন হয় না, তখন সে ত্রিগুণাত্মিকা জড় জগতের স্তর অতিক্রম করে ব্রহ্মভূত স্তরে অধিষ্ঠিত হয়।" (*ভগবদ্গীতা* ১৪/২৬) তাই যে সমস্ত মূর্খ জীব মনে

করে যে ভগবান নেই, অথবা যদি তিনি থেকেও থাকেন তবে তিনি নিরাকার এবং নির্বিশেষ, আর মনে করে তারাই হচ্ছে এক-একটি ভগবান, তাহলে তাদের সেই ভয়ঙ্কর অধঃপতিত অবস্থা থেকে রক্ষা করার একমাত্র আশার আলোক হচ্ছে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন।

শ্লোক ১২১

ব্যাসের সূত্রেতে কহে 'পরিণাম'-বাদ ।
'ব্যাস ভ্রান্ত'—বলি' তার উঠাইল বিবাদ ॥ ১২১ ॥

শ্লোকার্থ

"বেদান্ত-সূত্রে শ্রীল ব্যাসদেব বর্ণনা করেছেন যে, সব কিছুই হচ্ছে ভগবানের শক্তির রূপান্তর। কিন্তু শঙ্করাচার্য সমস্ত জগৎকে বিভ্রান্ত করে মন্তব্য করলেন যে, ব্যাসদেবের সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত। এইভাবে তিনি আস্তিক্যবাদের মহাবিরোধের সৃষ্টি করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিশ্লেষণ করেছেন, "শ্রীল ব্যাসদেব তাঁর *বেদান্ত-সূত্রে* স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করেছেন যে, সমস্ত জড় সৃষ্টি হচ্ছে ভগবানের শক্তির পরিণাম। কিন্তু শঙ্করাচার্য ভগবানের শক্তিকে স্বীকার না করে সিদ্ধান্ত করলেন যে, ভগবানই বিকারগ্রস্ত হন। তিনি *বেদের* বহু উক্তির বিকৃত অর্থ করে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, পরমতত্ত্ব বা ভগবান যদি রূপান্তরিত হন, তা হলে তাঁর অদ্বয়ত্ব ব্যাহত হবে। এইভাবে তিনি প্রচার করলেন যে ব্যাসদেবের সিদ্ধান্ত ভুল। তাই অদ্বৈতবাদের মাধ্যমে তিনি বিবর্তবাদ বা মায়াবাদের প্রতিষ্ঠা করেছেন।"

ব্রহ্ম-সূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম সূত্রটি হচ্ছে—*তদনন্যত্বম্ আরম্ভণ-শব্দাদিভ্যঃ* । শঙ্করাচার্য তাঁর শারীরক-ভাষ্যে এই সূত্রের ব্যাখ্যায় *ছান্দোগ্য উপনিষদ* থেকে *বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্* ইত্যাদি বেদবাক্যের উদাহরণ দিয়ে পরিণামবাদকে দোষযুক্ত বিকারবাদ বলে বিতর্ক করেছেন। ভগবানের শক্তির এই পরিবর্তন বা পরিণামকে তিনি ভ্রান্তভাবে অস্বীকার করার চেষ্টা করেছেন, যা পরে বিশ্লেষণ করা হবে। যেহেতু তাঁর মতে ভগবান নির্বিশেষ, তাই তিনি বিশ্বাস করেন না যে, সমস্ত জড় সৃষ্টিই হচ্ছে ভগবানের শক্তির পরিণাম, কারণ পরমতত্ত্বের শক্তি যদি স্বীকার করা হয়, তখন অবশ্যই পরমতত্ত্বকে সবিশেষরূপে বা একজন

ব্যক্তিরূপে স্বীকার করতে হবে। কোন ব্যক্তি তাঁর বিভিন্ন শক্তির দ্বারা অনেক কিছুই তৈরি করতে পারেন। যেমন, একজন ব্যবসায়ী তাঁর শক্তির মাধ্যমে অনেক বড় বড় কলকারখানা এবং ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান তৈরি করেন, কিন্তু তবুও তিনি সেই মানুষটিই থাকেন। মায়াবাদীরা এই সরল তত্ত্বটি বুঝতে পারে না। তাদের ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক এবং অল্প জ্ঞানের প্রভাবে তারা বুঝতে পারে না যে, একজন মানুষের শক্তি রূপান্তরিত হলেও সেই মানুষটির কোন পরিবর্তন হয় না—সেই মানুষটি একই রকম থাকেন।

পরমতত্ত্বের শক্তির যে রূপান্তর হতে পারে, সে কথা বিশ্বাস না করে শঙ্করাচার্য তাঁর মায়াবাদ সৃষ্টি করেছেন। সেই মায়াবাদ দর্শন অনুসারে যদিও পরমতত্ত্বের কখনও রূপান্তর হয় না, তবুও আমাদের মনে হয় যে রূপান্তর হয়েছে, এবং সেটি হচ্ছে মায়া। শঙ্করাচার্য পরমতত্ত্বের শক্তির রূপান্তরে বিশ্বাস করেন না, তাই তিনি দাবি করেছেন যে, সব কিছুই এক এবং সেই সূত্রে জীবও ঈশ্বর। এই মতবাদকে বলা হয় মায়াবাদ।

শ্রীল ব্যাসদেব বিশ্লেষণ করেছেন যে, পরমতত্ত্ব হচ্ছেন একজন পুরুষ, যাঁর বিভিন্ন শক্তি হয়েছে। তাঁর ইচ্ছার প্রভাবে তিনি সৃষ্টি করতে পারেন এবং তাঁর দৃষ্টিপাতের প্রভাবেও (*স ঐক্ষত*), তিনি সৃষ্টি করতে পারেন। তিনি এই জড় জগৎ সৃষ্টি করেছেন (*স অসৃজত*)। সৃষ্টির পরেও তিনি সেই একই পুরুষ থাকেন; তিনি সব কিছুতে তাঁর অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলেন না। ভগবানের শক্তি যে অচিন্ত্য এবং তাঁর আদেশে ও তাঁর ইচ্ছার প্রভাবে যে এই বৈচিত্র্যময় জগতের সৃষ্টি হয়েছে, তা স্বীকার করতেই হবে। *বেদান্ত-সূত্রে* বলা হয়েছে, *সতত্ত্বতোঽন্যথাবুদ্ধির্বিকার ইত্যুদাহৃতঃ* । অর্থাৎ একটি সত্য তত্ত্ব থেকে অন্য একটি সত্য তত্ত্বের উদয় হলে তাকে অন্য বস্তু বলে যে ধারণা, সেটি বিকার অর্থাৎ পরিণাম। পরমব্রহ্ম হচ্ছেন পরমতত্ত্ব, এবং অন্য সমস্ত শক্তি তার থেকে উদ্ভূত হয়েছে এবং স্বতন্ত্রভাবে বিরাজ করছে, যেমন জীব এবং প্রকৃতি, এরাও সত্য। এটি হচ্ছে বিকারের বা পরিণামের একটি দৃষ্টান্ত। বিকারের আর একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে, একটি সত্য বস্তু দুগ্ধের আর একটি সত্যবস্তু দধিতে পরিণত হওয়া। দধি হচ্ছে দুগ্ধের পরিণাম, যদিও দধি এবং দুগ্ধের উপাদান এক।

ছান্দোগ্য উপনিষদে বর্ণিত হয়েছে, *ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বম্* এইরূপ বেদবাক্য থেকে ব্রহ্মই যে জগৎ, সেই সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহই থাকে না। পরতত্ত্বে অচিন্ত্য শক্তিসমূহ রয়েছে, সেই কথা *শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও* প্রতিপন্ন হয়েছে (*পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে*) এবং সমস্ত জড় সৃষ্টি ভগবানের সেই বিভিন্ন শক্তির প্রমাণ। পরমেশ্বর ভগবান সত্যবস্তু, তাই তিনি যা কিছু সৃষ্টি করেন তাও সত্য। সব কিছুই

সত্য এবং পূর্ণ (*পূর্ণম্*), কিন্তু পরম *পূর্ণম্* পরম ঈশ্বর সর্ব অবস্থাতেই একই থাকেন। *পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে পূর্ণস্য পূর্ণমাদায়*—পরতত্ত্ব এমনই পূর্ণ যে, যদিও তাঁর থেকে অসংখ্য পূর্ণ বস্তুর প্রকাশ হয়, তবুও তাঁর পূর্ণত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে। কোন অবস্থাতেই তাঁর ক্ষয় হয় না।

অতএব যথার্থ সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, সমস্ত জগৎ পরমেশ্বর ভগবানের শক্তির বিকার। এমন নয় যে, পরমেশ্বর ভগবান বা পরব্রহ্ম স্বয়ং বিকৃত হন। তিনি সর্ব অবস্থাতে একই থাকেন। জড় জগৎ এবং জীব ভগবানের শক্তি পরতত্ত্ব বা ব্রহ্মের বিকার। অর্থাৎ, ব্রহ্ম হচ্ছেন মূল উপাদান এবং অন্য সমস্ত সৃষ্টি হচ্ছে সেই উপাদানের বিকার। সেই কথা *তৈত্তিরীয় উপনিষদেও* বর্ণিত হয়েছে। *যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে*—"সমস্ত জড় জগৎ উদ্ভূত হয়েছে পরমতত্ত্ব পরমেশ্বর ভগবান থেকে।" এই শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ব্রহ্ম হচ্ছেন আদি কারণ এবং জীব ও জড় জগৎ হচ্ছে সেই কারণের কার্য। কারণটি যেহেতু সত্য, তাই তার কার্যটিও সত্য। তা মায়া নয়। শঙ্করাচার্য সামঞ্জস্যহীনভাবে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, ব্রহ্মের বিকার জীব এবং জগৎ মায়া, কারণ তাঁর মতে জীব এবং জগতের অস্তিত্ব ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন এবং পৃথক। এইভাবে কদর্থ করে মায়াবাদীরা প্রচার করেছে, *ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা*, অর্থাৎ পরতত্ত্ব বা ব্রহ্ম হচ্ছেন সত্য, কিন্তু জগৎ এবং জীব মিথ্যা, বা তা সবই প্রকৃতপক্ষে পরতত্ত্ব এবং জড় জগৎ ও জীবের ভিন্ন অস্তিত্ব নেই।

পরমেশ্বর ভগবান, জীব এবং জড় জগৎকে অবিচ্ছেদ্য ও অজ্ঞান বলে প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে, শঙ্করাচার্য পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা আচ্ছাদন করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে জড় জগৎ মিথ্যা, কিন্তু সেটি একটি মস্ত বড় ভুল। পরমেশ্বর ভগবান যদি সত্য হন, তা হলে তাঁর সৃষ্টি মিথ্যা হয় কিভাবে? আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা দেখতে পাই যে, এই জগৎকে আমরা মিথ্যা বলে মনে করতে পারি না। তাই বৈষ্ণব দর্শনে বলা হয় যে, জড় সৃষ্টি মিথ্যা নয় তবে অনিত্য, তা পরমেশ্বর ভগবান থেকে ভিন্ন, কিন্তু যেহেতু তা ভগবানের শক্তির দ্বারা অদ্ভুতভাবে সৃষ্টি হয়েছে, তাই তাকে মিথ্যা বলা অন্যায়।

অভক্তরাও বিস্ময়কর জড় সৃষ্টির মহিমা উপলব্ধি করতে পারে, কিন্তু এই জড় সৃষ্টির আড়ালে রয়েছেন যে পরমেশ্বর ভগবান তাঁর বুদ্ধিমত্তা এবং শক্তির মর্ম তারা উপলব্ধি করতে পারে না। শ্রীপাদ রামানুজাচার্য *আত্মা বা ইদমগ্র আসীৎ*, এই বৈদিক সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, যাতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পরম আত্মা বা পরতত্ত্ব সৃষ্টির পূর্বে বিরাজমান ছিল। কেউ বলতে পারে, "পরমেশ্বর ভগবান যদি পূর্ণরূপে চিন্ময় হন, তা হলে তাঁর মধ্যে জড় এবং চেতন উভয়

শক্তিই বিরাজ করে কি করে এবং তিনি জড় সৃষ্টির উৎস হন কি করে?" তার উত্তরে শ্রীপাদ রামানুজাচার্য *তৈত্তিরীয় উপনিষদের* একটি মন্ত্রের উল্লেখ করেছেন—

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে
যেন জাতানি জীবন্তি
যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি ।

এই মন্ত্রে প্রতিপন্ন হয়েছে যে, সমস্ত জগৎ পরমেশ্বর ভগবান থেকে প্রকাশিত হয়েছে, তাঁকে আশ্রয় করেই বিরাজ করছে এবং প্রলয়ের পর তাঁরই শরীরে লীন হয়ে যাবে। প্রকৃতপক্ষে জীব চিন্ময় বস্তু এবং সে যখন চিৎ-জগতে প্রবেশ করে বা পরমেশ্বর ভগবানের শরীরে প্রবেশ করে, তখনও স্বতন্ত্র আত্মারূপে তার অস্তিত্ব বজায় থাকে। এই সম্পর্কে শ্রীপাদ রামানুজাচার্য একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন যে, একটি সবুজ পাখি যখন একটি সবুজ গাছে গিয়ে বসে, তখন সে গাছ হয়ে যায় না; যদিও মনে হয় যে সে গাছের সবুজে লীন হয়ে গেছে, তবুও একটি পক্ষীরূপে তার অস্তিত্ব বজায় থাকে। এই রকমই আর একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে, একটি পশু যখন বনের মধ্যে প্রবেশ করে, তখন যদিও মনে হয় যে, সেই পশুটি বনের মধ্যে লীন হয়ে গেছে, তবুও তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় থাকে। তেমনই, জড় জগতে মায়াশক্তি এবং তটস্থা শক্তি জীব তাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে। যদিও জড় জগতে পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন শক্তি পরস্পরের সঙ্গে ক্রিয়া করে, তবুও তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় থাকে। তাই জড় অথবা চেতন শক্তিতে লীন হয়ে যাওয়ার অর্থ এই নয় যে, তাদের স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হয়ে যায়। রামানুজাচার্যের *বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ* অনুসারে, ভগবানের বিভিন্ন সমস্ত শক্তি যদিও এক, কিন্তু তবুও প্রতিটি শক্তি তাদের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখে।

আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ শব্দটির কদর্থ করে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য *বেদান্ত-সূত্রের* পাঠকদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছেন, এমন কি তিনি *বেদান্ত-সূত্রের* প্রণেতা ব্যাসদেবের ভুল ধরারও চেষ্টা করেছেন। *বেদান্ত-সূত্রের* সব কয়টি সূত্রের এখানে পরীক্ষা করে দেখার প্রয়োজন নেই, তবে একটি আলাদা গ্রন্থে *বেদান্ত-সূত্র* উপস্থাপন করার পরিকল্পনা আমাদের রয়েছে।

শ্লোক ১২২

পরিণাম-বাদে ঈশ্বর হয়েন বিকারী ।
এত কহি' 'বিবর্ত'-বাদ স্থাপনা যে করি ॥ ১২২ ॥

শ্লোকার্থ

"শঙ্করাচার্যের মতে পরিণামবাদে ঈশ্বর বিকার প্রাপ্ত হন, এই বলে তিনি বিবর্তবাদ স্থাপন করেছেন।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁর ভাষ্যে বলেছেন যে, কেউ যদি স্পষ্টভাবে পরিণামবাদের অর্থ না বোঝে, তা হলে সে অবশ্যই জড়া প্রকৃতি এবং জীবের তত্ত্ব বুঝতে পারবে না। *ছান্দোগ্য উপনিষদে* বলা হয়েছে, *সন্মূলাঃ সৌম্যেমাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ* "জড় জগৎ এবং জীব ভিন্ন বস্তু এবং তারা নিত্যসত্য, মিথ্যা নয়।" (*ছান্দোগ্য উপনিষদ* ৬/৮/৪)। কিন্তু শঙ্করাচার্য অর্থহীনভাবে আশঙ্কা করেছেন যে, পরিণামবাদে ঈশ্বর বিকার প্রাপ্ত হন বলে ধারণা করা হয়, তাই তিনি কল্পনা করেছেন যে, জড় জগৎ এবং জীব উভয়েই মিথ্যা এবং তাদের কোন বৈশিষ্ট্য নেই। বাক্‌চাতুরি দিয়ে তিনি প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে, জীব এবং জড় জগতে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অলীক, এবং সেই সম্পর্কে রজ্জুতে যেমন সর্প ভ্রম হয়, অথবা শুক্তিতে যেমন রজত ভ্রম হয়, সেই দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। এইভাবে তিনি জীবকে প্রতারণা করেছেন।

রজ্জুতে সর্প ভ্রমের দৃষ্টান্ত *মাণ্ডুক্য উপনিষদে* রয়েছে, কিন্তু তার মাধ্যমে দেহকে আত্মা বলে মনে করার ভ্রান্তি বর্ণনা করা হয়েছে। যেহেতু আত্মা হচ্ছে চিৎকণা, যা *ভগবদ্গীতায়* বর্ণিত হয়েছে (*মমৈবাংশো জীবলোকে*), তাই মোহবশত (বিবর্তবাদ) মানুষ তার দেহকে তার স্বরূপ বলে মনে করে। এটিই হচ্ছে বিবর্ত বা মায়ার যথার্থ দৃষ্টান্ত। *অতত্ত্বতোঽন্যথাবুদ্ধির্বিবর্ত ইত্যুদাহৃতঃ* শ্লোকটি এই বিবর্তের বর্ণনা করছে। প্রকৃত সত্য না জেনে একটি বস্তুকে অন্য বস্তু বলে ভুল করা (যেমন, দেহকে আত্মা বলে মনে করা) মানেই হল বিবর্তবাদ। দেহকে আত্মা বলে মনে করছে যে সমস্ত বদ্ধ জীব, তারা সকলেই এই বিবর্তবাদের দ্বারা বিভ্রান্ত। কেউ যখন সর্বশক্তিমান ভগবানের অচিন্ত্য শক্তির কথা ভুলে যায়, তখনই সে বিবর্তবাদের দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে।

পরমেশ্বর ভগবান যে কখনও পরিবর্তিত না হয়ে একই সত্তায় চিরকাল বিরাজ করেন, সেই তত্ত্ব *ঈশোপনিষদে* বর্ণিত হয়েছে—*পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।* ভগবান পূর্ণ। তাঁর থেকে পূর্ণ নিয়ে নেওয়া হলেও তিনি পূর্ণই থাকেন। জড় জগৎ ভগবানের শক্তির প্রভাবে প্রকাশিত, কিন্তু তবুও তিনি হচ্ছেন সেই একই আদি পুরুষ। তাঁর রূপ, তাঁর গুণ, তাঁর পরিকর আদি কখনই ক্ষয় হয় না। শ্রীল

জীব গোস্বামী তাঁর *পরমাত্মা-সন্দর্ভে* বিবর্তবাদ সম্বন্ধে বলেছেন, "বিবর্তবাদের প্রভাবে কল্পনা করা হয় যে, জীব এবং জগৎ ব্রহ্ম থেকে অভিন্ন। প্রকৃত তত্ত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞতার ফলে এই ধরনের ধারণার উদয় হয়। পরতত্ত্ব বা পরব্রহ্ম সব সময়ই এক এবং অভিন্ন। তিনি পূর্ণ চিন্ময়, তাই তিনি অন্য সমস্ত ধর্মরহিত, সর্ব বিলক্ষণ এবং অহংকারশূন্য। তাঁর পক্ষে অজ্ঞানের দ্বারা আচ্ছন্ন হওয়া এবং অজ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করা বা ভ্রান্ত হওয়া কখনই সম্ভব নয়। ব্রহ্মবস্তু—পরম অলৌকিক বস্তু, সুতরাং তাতে ক্ষুদ্র মানুষদের অচিন্তনীয় শক্তির সম্ভাবনা আছে। প্রাকৃত চিন্তামণি প্রভৃতি বস্তুতেও যখন অলৌকিক শক্তি দৃষ্ট হয়, তখন ব্রহ্মের অলৌকিক শক্তি নিশ্চয়ই স্বীকার্য। বাত, কফ ও পিত্ত, বিবিধ দোষ একাধারে রোগীকে আশ্রয় করলেও যেরূপ পরস্পর-বিরোধী ধাতুর শোধনের জন্য ঔষধের ব্যবস্থা হয়, সেই প্রকার পরস্পর-বিরোধী গুণত্রয়ের ধারিণী শক্তির দ্বারা ব্রহ্মের নিরাকারত্ব অনুমিত হলেও অবয়বাদি স্বীকৃত হয়। সেই বিষয়ে বস্তুতে যদি এই রকম অচিন্ত্য শক্তি থাকে, তা হলে পরমেশ্বর ভগবানের মধ্যে যে তার থেকে অনন্ত গুণবিশিষ্ট একটি অচিন্ত্য শক্তি রয়েছে, তাতে বিস্ময়ের কি আছে?"

শ্লোক ১২৩

বস্তুতঃ পরিণাম-বাদ—সেই সে প্রমাণ ।
দেহে আত্মবুদ্ধি—এই বিবর্তের স্থান ॥ ১২৩ ॥

শ্লোকার্থ

শক্তির বিকার একটি প্রামাণিক সত্য। দেহে আত্মবুদ্ধি করাই হচ্ছে বিবর্ত।

তাৎপর্য

জীব হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের অংশ চিৎ-স্ফুলিঙ্গ। দুর্ভাগ্যবশত সে তার দেহে আত্মবুদ্ধি করে, এবং সেই ভ্রান্ত ধারণাকে বলা হয় বিবর্ত বা অসত্যকে সত্য বলে মনে করা। দেহ আত্মা নয়, কিন্তু পশু এবং মূর্খ মানুষেরা দেহকেই আত্মা বলে মনে করে। বিবর্ত মানে আত্মার স্বরূপের পরিবর্তন নয়; দেহকে আত্মা বলে মনে করার ভ্রান্তিই হচ্ছে বিবর্ত। তেমনই *ভগবদ্গীতায়* বর্ণিত আটটি জড় উপাদান (*ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ* ইত্যাদি) সমন্বিত ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি যখন বিভিন্নভাবে ক্রিয়া করে, তখন পরমেশ্বর ভগবানের কোন পরিবর্তন বা বিকার হয় না।

শ্লোক ১২৪

অবিচিন্ত্য-শক্তিযুক্ত শ্রীভগবান্ ।
ইচ্ছায় জগদ্রূপে পায় পরিণাম ॥ ১২৪ ॥

শ্লোকার্থ

"পরমেশ্বর ভগবান অচিন্ত্য শক্তিযুক্ত। তাই তাঁর ইচ্ছায় তাঁর অচিন্ত্য শক্তি জগৎরূপে পরিণত হয়।

শ্লোক ১২৫

তথাপি অচিন্ত্যশক্ত্যে হয় অবিকারী ।
প্রাকৃত চিন্তামণি তাহে দৃষ্টান্ত যে ধরি ॥ ১২৫ ॥

শ্লোকার্থ

"চিন্তামণির স্পর্শে লৌহ স্বর্ণে পরিণত হয়, কিন্তু তবুও চিন্তামণির কোন পরিবর্তন হয় না। এই দৃষ্টান্ত থেকে বুঝতে পারা যায় যে, পরমেশ্বর ভগবান থেকে যদিও অসংখ্য শক্তির প্রকাশ হয়, তবুও তিনি অবিকৃতই থাকেন।

শ্লোক ১২৬

নানা রত্নরাশি হয় চিন্তামণি হৈতে ।
তথাপিহ মণি রহে স্বরূপে অবিকৃতে ॥ ১২৬ ॥

শ্লোকার্থ

"চিন্তামণি থেকে যদিও নানা রকম রত্নরাশি উৎপন্ন হয়, তবুও চিন্তামণি তাঁর স্বরূপে অবিকৃত থাকে।"

শ্লোক ১২৭

প্রাকৃত-বস্তুতে যদি অচিন্ত্যশক্তি হয় ।
ঈশ্বরের অচিন্ত্যশক্তি,—ইথে কি বিস্ময় ॥ ১২৭ ॥

শ্লোকার্থ

"চিন্তামণির মতো একটি প্রাকৃত বস্তুতে যদি অচিন্ত্য শক্তি থাকতে পারে, তা হলে পরমেশ্বর ভগবানের অচিন্ত্য শক্তিতে বিশ্বাস না করার কি আছে?

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই শ্লোকে যে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন, তা যে কোন মানুষই সূর্যের শক্তি বিবেচনা করার মাধ্যমে হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন। সূর্য অনাদিকাল ধরে সূর্য তাপ এবং আলোক প্রদান করে আসছে, কিন্তু তবুও তার শক্তি হ্রাস পায়নি। আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা বিশ্বাস করেন যে, সূর্যকিরণের প্রভাবে জড় জগতের পালন হয়। প্রকৃতপক্ষে সকলেই দেখতে পায়, কিভাবে সূর্যকিরণের ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের পালনকার্য সম্পাদিত হয়। খাদ্যশস্যের উৎপাদন এবং এমন কি কক্ষপথে গ্রহগুলির বিচরণও সম্পাদিত হয় সূর্যের শক্তির প্রভাবে। তাই বৈজ্ঞানিকেরা কখনও কখনও বিবেচনা করে যে, সূর্য হচ্ছে সৃষ্টির আদি কারণ। কিন্তু তারা জানে না যে, সূর্য হচ্ছে একটি মাধ্যম মাত্র, কারণ তারও সৃষ্টি হয়েছে পরমেশ্বর ভগবানের শক্তির দ্বারা। সূর্য এবং চিন্তামণি ছাড়াও বহু জড় পদার্থ রয়েছে, বিভিন্নভাবে যাদের শক্তির পরিবর্তন হলেও সেগুলি অপরিবর্তনীয় থাকে। সুতরাং, আদি কারণ পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন শক্তির পরিবর্তন হলেও, তাঁর কোন পরিবর্তন হয় না।

বিবর্তবাদ এবং পরিণামবাদ সম্বন্ধে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যের বিশ্লেষণের ভ্রান্তি জীব গোস্বামী প্রমুখ বৈষ্ণব আচার্যরা প্রদর্শন করে গেছেন। শ্রীপাদ জীব গোস্বামীর মতে, শঙ্করাচার্য *বেদান্ত-সূত্রের* অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারেননি। *আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ* সূত্রের ব্যাখ্যা করে শঙ্করাচার্য বাক্‌চাতুরি দিয়ে *ময়ট* এই প্রত্যয়টির এমন অর্থ বিশ্লেষণ করেছেন যে, সেই বিশ্লেষণ থেকে বোঝা যায়—*বেদান্ত-সূত্র* সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান ছিল খুবই কম, তিনি তাঁর নির্বিশেষবাদ প্রতিষ্ঠা করার জন্যই কেবল *বেদান্ত-সূত্রের* ব্যবহার করেছেন। কিন্তু তা করতেও তিনি সক্ষম হননি, কারণ তিনি উপযুক্ত দৃঢ় যুক্তি প্রদর্শন করতে পারেননি। এই সম্পর্কে শ্রীল জীব গোস্বামী *ব্রহ্মপুচ্ছং প্রতিষ্ঠা* বৈদিক শ্লোকটির উল্লেখ করেছেন, যার অর্থ হচ্ছে ব্রহ্মই সব কিছুর উৎস। কিন্তু এই শ্লোকটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য বিভিন্ন সংস্কৃত শব্দের এমন অর্থ করেছেন যে, সেইভাবে অর্থ করা হলে, জীব গোস্বামীর মতো ব্যাসদেবের শব্দজ্ঞান ছিল না বলে মনে হয়, কারণ তাঁর ব্যবহৃত শব্দের দ্বারা *বেদান্তের* সেই অর্থ হয় না। *বেদান্ত-সূত্রের* প্রকৃত অর্থ

এই রকম প্রবঞ্চনাপূর্ণভাবে বিকৃত করার ফলে এক শ্রেণীর মানুষের সৃষ্টি হয়েছে, যারা বাক্‌চাতুর্যের দ্বারা বৈদিক শাস্ত্রের, বিশেষ করে *ভগবদ্গীতার* বিভিন্ন মনগড়া অর্থ তৈরি করে। সেই সমস্ত মূর্খ পণ্ডিতদের একজন *কুরুক্ষেত্র* শব্দটির অর্থ-বিশ্লেষণ করে বলেছেন, "এই দেহটি হচ্ছে কুরুক্ষেত্র" এই ধরনের অর্থ-বিশ্লেষণ নির্ণয় করে যে, শ্রীকৃষ্ণ অথবা ব্যাসদেবের শব্দের ব্যবহার সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান ছিল না। তাদের হাবভাব দেখে মনে হয়, শ্রীকৃষ্ণ যা বলছিলেন তার অর্থ সম্বন্ধে তাঁর যথার্থ ধারণা ছিল না, আর ব্যাসদেব যা লিখেছিলেন, তার অর্থ সম্বন্ধে তাঁর যথেষ্ট জ্ঞান ছিল না, তাই শ্রীকৃষ্ণ সেই সমস্ত গ্রন্থগুলি রেখে গেছেন, যাতে পরবর্তীকালে মায়াবাদীরা সেগুলি বিশ্লেষণ করতে পারে।

বেদান্ত-সূত্র এবং অন্যান্য বৈদিক শাস্ত্রের কদর্থ করে সময় নষ্ট না করার পরিবর্তে যথাযথভাবে সেই সমস্ত গ্রন্থের অর্থ গ্রহণ করা উচিত। তাই, প্রকৃত অর্থের কোন রকম পরিবর্তন না করে, আমরা *ভগবদ্গীতা যথাযথ* প্রকাশ করেছি। তেমনই কেউ যদি *বেদান্ত-সূত্রের* অর্থ বিকৃত না করে যথাযথভাবে তা পাঠ করেন, তা হলে তিনি অতি সহজেই *বেদান্ত-সূত্র* হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন। তাই শ্রীল ব্যাসদেব তাঁর *শ্রীমদ্ভাগবতে বেদান্ত-সূত্রের* প্রথম সূত্র *জন্মাদাস্য যতঃ* থেকে *বেদান্ত-সূত্রের* বিশ্লেষণ করতে শুরু করেছেন—*জন্মাদাস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্*—"আমি বাস্তব বস্তুর (ভগবান শ্রীকৃষ্ণের) ধ্যান করি, যিনি সর্বকারণের পরম কারণ, যাঁর থেকে সমগ্র জগৎ প্রকাশিত হয়েছে, যাঁকে আশ্রয় করে সব কিছু বিরাজ করে এবং যাঁর দ্বারা সব কিছু বিনাশ প্রাপ্ত হয়। নিত্য জ্যোতির্ময় সেই পরমেশ্বর ভগবানের আমি ধ্যান করি, যিনি প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সব কিছু সম্বন্ধে অবগত এবং যিনি সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন।" পরমেশ্বর ভগবান সর্বাঙ্গসুন্দরভাবে সব কিছু সম্পাদিত করতে জানেন। তিনি *অভিজ্ঞঃ*, তিনি সর্বদাই পূর্ণ জ্ঞানময়। তাই *ভগবদ্গীতায়* (৭/২৬) ভগবান বলেছেন যে, তিনি অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সব কিছু জানেন, কিন্তু ভক্ত ছাড়া অন্য কেউ তাঁকে জানেন না। তাই ভগবদ্ভক্তরা অন্তত আংশিকভাবে ভগবানকে জানেন, কিন্তু পরমতত্ত্ব নিয়ে কেবল জল্পনা-কল্পনাকারী মায়াবাদীরা শুধুমাত্র অনর্থক তাদের সময়ের অপচয় করে।

শ্লোক ১২৮

'প্রণব' সে মহাবাক্য—বেদের নিদান।
ঈশ্বরস্বরূপ প্রণব সর্ববিশ্ব-ধাম ॥ ১২৮ ॥

শ্লোকার্থ

"শব্দব্রহ্ম ওঁকার হচ্ছে বেদের মহাবাক্য—তা হচ্ছে সমস্ত বৈদিক মন্ত্রের আধার। তাই শব্দব্রহ্মরূপে পরমেশ্বর ভগবানের প্রকাশ এবং সমস্ত সৃষ্টির আধার ওঁকারকে স্বীকার করা উচিত।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৮/১৩) ওঁকার-এর মহিমা বর্ণনা করে বলা হয়েছে—

ওঁ ইত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্মামনুস্মরন্।
য প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্ ॥

ওঁকার বা প্রণব হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের শব্দব্রহ্মরূপ প্রকাশ। তাই মৃত্যুর সময় কেউ যদি 'ওঁ' এই একটি অক্ষর স্মরণ করেন, তা হলে তিনি পরমেশ্বর ভগবানকে স্মরণ করেন এবং তার ফলে তিনি তৎক্ষণাৎ পরম গতি লাভ করে চিৎ-জগতে প্রবিষ্ট হন। ওঁকার হচ্ছে সমস্ত বৈদিক মন্ত্রের ভিত্তি, কারণ তা হচ্ছে শব্দব্রহ্মরূপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ এবং তাঁকে জানাই হচ্ছে বেদের চরম লক্ষ্য। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে—*বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ। ভগবদ্গীতায়* বর্ণিত এই সমস্ত সরল তথ্যগুলি মায়াবাদীরা বুঝতে পারে না, অথচ তারা নিজেদের বড় বড় বৈদান্তিক বলে মনে করে গর্ববোধ করে। তাই কখনও কখনও আমরা বেদান্তী দার্শনিকদের দন্তহীন বলে বর্ণনা করি। শঙ্কর দর্শনের সমস্ত যুক্তি হচ্ছে মায়াবাদীদের দাঁত, আর রামানুজাচার্য আদি মহান বৈষ্ণব আচার্যদের সুদৃঢ় যুক্তির প্রভাবে সেই সমস্ত দাঁতগুলি ভগ্ন হয়। অর্থাৎ শ্রীপাদ রামানুজাচার্য এবং মধ্বাচার্য মায়াবাদীদের দাঁত ভেঙ্গে দিয়েছেন, তাই তাদের বেদান্তী বা 'দন্তহীন' বলে বর্ণনা করা যেতে পারে।

ভগবদ্গীতায় অষ্টম অধ্যায়ের ত্রয়োদশ শ্লোকে ওঁকার-এর অর্থ বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে—

ওঁ ইত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্মামনুস্মরন্।
য প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্ ॥

"সমাধিতে অবস্থানপূর্বক 'ওঁ' এই অক্ষর উচ্চারণ করার মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানের চিন্তা করতে করতে যিনি দেহত্যাগ করেন, তিনি অবশ্যই পরম গতি লাভ করেন অর্থাৎ ভগবদ্ধামে ফিরে যান।" কেউ যদি যথার্থই বুঝতে পারেন

যে, ওঁকার হচ্ছে শব্দব্রহ্মরূপে পরমেশ্বর ভগবানের প্রকাশ, তা হলে তিনি ওঁকার উচ্চারণ করুন অথবা *হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র* কীর্তন করুন, তাঁর ফল একই হয়। ওঁকার-এর অর্থ বিশ্লেষণ করে *ভগবদ্গীতায়* (৯/১৭) আরও বলা হয়েছে—

পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ ।
বেদ্যং পবিত্রম্ ওঙ্কার ঋক্ সাম যজুরেব চ ॥

"আমি এই জগতের পিতা, মাতা, বিধাতা ও পিতামহ। আমি বেদ্য ও পবিত্রকারী এবং আমি ওঁকার। আমি ঋক্, সাম ও যজুর্বেদ-স্বরূপ।"

ওঁকার সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* আরও বলা হয়েছে—

ওঁ তৎ সদিতি নির্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ ।
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা ॥

"সৃষ্টির আদিতে ওঁ, তৎ, সৎ—এই তিনটি পরমতত্ত্বের (ব্রহ্মের) উদ্দেশ্যে প্রয়োগ হত। যজ্ঞকর্তা ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞ অনুষ্ঠানের সময় পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য তা উচ্চারণ করতেন।"

সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে ওঁকার-এর মহিমা বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে। শ্রীল জীব গোস্বামী তাঁর *ভগবৎ-সন্দর্ভে* বলেছেন যে, বেদের ওঁকার হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের দিব্যনামের শব্দতরঙ্গ। এই অপ্রাকৃত শব্দতরঙ্গ উচ্চারণের ফলে ভববন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়। কখনও কখনও ওঁকারকে তারক বা পরিত্রাণকারীও বলা হয়। *শ্রীমদ্ভাগবতের* শুরু হয়েছে ওঁকার দিয়ে—*ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়*। তাই শ্রীপাদ শ্রীধর স্বামী ওঁকারকে *তারাঙ্কুর* বা জড় জগৎ থেকে মুক্তিলাভ করার বীজ বলে বর্ণনা করেছেন। যেহেতু পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন পরমতত্ত্ব, তাই তাঁর যে পবিত্র নাম এবং শব্দব্রহ্ম ওঁকার তা তাঁর থেকে অভিন্ন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন যে, পবিত্র নাম বা শব্দব্রহ্মরূপে ভগবানের প্রকাশ ওঁকার পরমেশ্বর ভগবানের সর্বশক্তি সমন্বিত।

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ ।

ভগবানের দিব্যনামে তাঁর সমস্ত শক্তি অর্পিত হয়েছে। ভগবানের নাম অথবা ওঁকার যে পরমেশ্বর ভগবান থেকে অভিন্ন, সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। অর্থাৎ, যিনি ওঁকার এবং ভগবানের নাম *হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র* উচ্চারণ করেন, তিনি তৎক্ষণাৎ শব্দব্রহ্মরূপে পরমেশ্বর ভগবানের সাক্ষাৎ লাভ করেন। *নারদ-পঞ্চরাত্রে* স্পষ্টভাবে

বলা হয়েছে যে, যিনি অষ্টাক্ষর সমন্বিত *ওঁ নমো নারায়ণায়* মন্ত্র উচ্চারণ করেন, পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ স্বয়ং তাঁর সামনে উপস্থিত হন। *মাণ্ডুক্য উপনিষদেও* বর্ণনা করা হয়েছে যে, চিৎ-জগতে যা কিছু দেখতে পাওয়া যায়, তা সবই হচ্ছে ওঁকার-এর চিৎ-শক্তির প্রকাশ।

সমস্ত *উপনিষদের* ভিত্তিতে শ্রীল জীব গোস্বামী বলেছেন যে, ওঁকার হচ্ছে পরমতত্ত্ব এবং সেই সত্য সমস্ত মহাজন এবং আচার্যরা স্বীকার করে গেছেন। ওঁকার অনাদি, অবিকারী, পরম এবং সব রকম জড় কলুষ ও বিকার থেকে মুক্ত। ওঁকার হচ্ছে সব কিছুরই আদি, মধ্য এবং অন্ত এবং যিনি এইভাবে ওঁকারের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করেছেন, তিনি ওঁকারের মাধ্যমে পারমার্থিক পূর্ণতা লাভ করেন। সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত ওঁকার হচ্ছেন ঈশ্বর, যে কথা *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে—*ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি*। ওঁকার বিষ্ণু থেকে অভিন্ন, কারণ ওঁকার বিষ্ণুরই মতো সর্বব্যাপ্ত। যিনি বুঝেছেন যে, ওঁকার এবং বিষ্ণু অভিন্ন, তিনি শোক এবং মোহ থেকে মুক্ত হয়েছেন। যিনি ওঁকার উচ্চারণ করেন, তিনি আর শূদ্র থাকেন না, তিনি তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণের স্তরে উন্নীত হন। কেবলমাত্র ওঁকার উচ্চারণ করার মাধ্যমে হৃদয়ঙ্গম করা যায় যে, সমস্ত সৃষ্টি হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের শক্তির প্রকাশ। *ইদং হি বিশ্বং ভগবানিবেতরো, যতো জগৎস্থাননিরোধসম্ভবাঃ*—"পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং এই জগৎরূপে প্রকাশিত হয়েছেন, কিন্তু তবুও তিনি তা থেকে ভিন্ন। তাঁর থেকেই এই জড় সৃষ্টি প্রকাশিত হয়েছে, তাঁকে আশ্রয় করে তা বিরাজ করছে এবং প্রলয়ের পর তাঁর মধ্যেই তা লীন হয়ে যাবে।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১/৫/২০) যারা অজ্ঞ, তারা তা বুঝতে পারে না, কিন্তু *শ্রীমদ্ভাগবতে* বর্ণনা করা হয়েছে যে, সমস্ত সৃষ্টি হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের শক্তির প্রকাশ। পরমেশ্বর ভগবানের পবিত্র নাম ওঁকার উচ্চারণ করার মাধ্যমে তা উপলব্ধি করা সম্ভব।

তা বলে মূর্খের মতো সিদ্ধান্ত করা উচিত নয় যে, পরমেশ্বর ভগবান যেহেতু সর্বশক্তিমান তাই অ, উ এবং ম—এই তিনটি অক্ষর তৈরি করে সেগুলির সমন্বয়ই কেবল তাঁর পরিচায়ক। প্রকৃতপক্ষে, অপ্রাকৃত শব্দব্রহ্ম ওঁকার যদিও অ, উ এবং ম এই তিনটি অক্ষরের সমন্বয়, তবুও তা চিন্ময় সমন্বিত, এবং যিনি এই ওঁকার উচ্চারণ করেন, তিনি অচিরেই বুঝতে পারেন যে, ওঁকার এবং শ্রীকৃষ্ণ অভিন্ন। শ্রীকৃষ্ণ ঘোষণা করেছেন, *প্রণবঃ সর্ববেদেষু*—"সমস্ত বৈদিক মন্ত্রের মধ্যে আমি হচ্ছি 'ওঁ'" (*ভগবদ্গীতা* ৭/৮) তাই বুঝতে হবে যে, ভগবানের বহু অবতারের মধ্যে, ওঁকার হচ্ছেন শব্দব্রহ্মরূপে তাঁর অবতার। সেই কথা সমস্ত *বেদে* স্বীকার করা হয়েছে। সর্বদাই মনে রাখতে হবে যে, ভগবানের নাম এবং ভগবান স্বয়ং

অভিন্ন (*অভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ*)। যেহেতু ওঁকার হচ্ছে সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের মূল তত্ত্ব, তাই বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করার পূর্বে ওঁকার উচ্চারণ করা হয়। ওঁকার ব্যতীত কোন বৈদিক মন্ত্র সফল হয় না। তাই গোস্বামীরা ঘোষণা করে গিয়েছেন যে, প্রণব (ওঁকার) হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের পূর্ণ প্রকাশ এবং তাঁরা আক্ষরিকভাবে ওঁকার-এর বিশ্লেষণ করেছেন—

অ-কারেণোচ্যতে কৃষ্ণঃ সর্বলোকৈকনায়কঃ ।
উকারেণোচ্যতে রাধা মকারো জীববাচকঃ ॥

ওঁকার হচ্ছে অ, উ এবং ম—এই তিনটি অক্ষরের সমন্বয়। *অ-কারেণোচ্যতে কৃষ্ণঃ* —অ-কার কৃষ্ণকে বোঝায়, যিনি হচ্ছেন *সর্বলোকৈকনায়কঃ* অর্থাৎ চিৎ এবং অচিৎ সমস্ত জগৎ ও সমস্ত জীবের ঈশ্বর। তিনি হচ্ছেন পরম নায়ক (*নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্*)। *উ-কার* শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি শ্রীমতী রাধারাণীকে ইঙ্গিত করে, এবং *ম-কার* জীবকে ইঙ্গিত করে। এইভাবে 'ওঁ' হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ, তাঁর শক্তি এবং তাঁর নিত্য সেবকদের পূর্ণ সমন্বয়। অর্থাৎ ওঁকার বললে শ্রীকৃষ্ণের নাম, যশ, লীলা, পরিকর, শক্তি, ভক্ত ইত্যাদি তাঁর সঙ্গে সম্পর্কিত সব কিছুকেই বোঝায়। সর্ববিশ্বধাম—ওঁকার হচ্ছেন সব কিছুরই আশ্রয় স্থল, ঠিক যেমন শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সব কিছুর আশ্রয়স্থল (*ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্*)।

মায়াবাদীরা অনেক বৈদিক মন্ত্রকে মহাবাক্য বা মুখ্য বৈদিক মন্ত্র বলে মনে করে, যেমন *তত্ত্বমসি* (*ছান্দোগ্য উপনিষদ* ৬/৮/৭), *ইদং সর্বং যদয়মাত্মা* এবং *ব্রহ্মেদং সর্বম্* (*বৃহদারণ্যক উপনিষদ* ২/৫/১), *আত্মৈবেদং সর্বম্* (*ছান্দোগ্য উপনিষদ* ৭/২৫/২) এবং *নেহ নানাস্তি কিঞ্চন* (*কঠোপনিষদ* ২/১/১১) ইত্যাদি বাক্যগুলিকে মহাবাক্য বলা একটি বিশেষ ভ্রম। ওঁকারই একমাত্র মহাবাক্য। অন্যান্য যে সমস্ত মন্ত্র মায়াবাদীরা মহাবাক্য বলে গ্রহণ করে, সেগুলি কেবল প্রাসঙ্গিক। সেগুলিকে মহাবাক্য বা মহামন্ত্র বলে গ্রহণ করা যায় না। *তত্ত্বমসি* বাক্যটি প্রাদেশিক মাত্র, কারণ *তত্ত্বমসি* বাক্যে যা উপদিষ্ট হয়, তা কেবল *বেদের* আংশিক উপলব্ধি। যে অপ্রাকৃত শব্দে সমস্ত বৈদিক জ্ঞান নিহিত রয়েছে, তাই হচ্ছে মহাবাক্য, যেমন ওঁকার (প্রণব)। সুতরাং প্রণব ছাড়া আর কোন মহাবাক্য হতে পারে না।

শঙ্করাচার্যের অনুগামীরা ওঁকারকে বাদ দিয়ে যে সমস্ত বৈদিক মন্ত্রকে মহাবাক্য বলে মনে করছে, তার কোনটিই মহাবাক্য নয়। তারা কেবল মন্তব্য করছে। শঙ্করাচার্য কিন্তু কখনও মহাবাক্য—ওঁকার-এর উচ্চারণ বা কীর্তনের ব্যাপারে কোন

রকম জোর দেননি। তিনি কেবল *তত্ত্বমসিকেই* মহাবাক্য বলে স্বীকার করেছেন। জীবকে ভগবান বলে কল্পনা করে তিনি *বেদান্ত-সূত্রের* সব কয়টি মন্ত্রের কদর্থ করে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, জীব এবং পরমেশ্বর ভগবানের পৃথক কোন অস্তিত্ব নেই। তাঁর এই প্রচেষ্টাকে জনৈক রাজনীতিবিদের *ভগবদ্গীতার* মাধ্যমে অহিংস নীতি প্রমাণ করার প্রচেষ্টার মতো। শ্রীকৃষ্ণ অসুরদের সংহারকারী, তাই শ্রীকৃষ্ণকে অহিংস বলে প্রমাণ করা শ্রীকৃষ্ণকে অস্বীকার করারই সামিল। *ভগবদ্গীতার* এই ধরনের বিশ্লেষণ যেমন অযৌক্তিক, তেমনই শঙ্করাচার্যের *বেদান্ত-সূত্রের* ব্যাখ্যাও সম্পূর্ণ অযৌক্তিক এবং কোন প্রকৃতিস্থ, বিচারবুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষ তা গ্রহণ করবেন না। বর্তমানে কেবল তথাকথিত বৈদান্তিকেরাই *বেদান্ত-সূত্রের* কদর্থ করছে না, এক ধরনের অবিবেকী লোকেরাও যারা এত অধঃপতিত যে, তারা প্রচার করছে সন্ন্যাসীরাও মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি অখাদ্য ভক্ষণ করতে পারে। তারাও *বেদান্ত-সূত্রের* কদর্থ করছে। এইভাবে শঙ্করাচার্যের তথাকথিত অনুগামী মায়াবাদীরা গভীর থেকে গভীরতর অন্ধকারে নিমজ্জিত হচ্ছে। এই ধরনের অধঃপতিত মানুষেরা কিভাবে সমস্ত বেদের সারাতিসার *বেদান্ত-সূত্রের* ব্যাখ্যা করবে?

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ঘোষণা করেছেন, 'মায়াবাদি-ভাষ্য শুনিলে হয় সর্বনাশ'। *ভগবদ্গীতায়* বর্ণনা করা হয়েছে, *বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ*—সমস্ত বেদের উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণকে জানা (*ভগবদ্গীতা* ১৫/১৫)। কিন্তু মায়াবাদীরা সকলকে কৃষ্ণবিমুখ করেছে। তাই এই অধঃপতন থেকে সমস্ত জগৎকে উদ্ধার করার জন্য কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রচারের প্রবল প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। প্রতিটি প্রকৃতিস্থ এবং বুদ্ধিমান মানুষের কর্তব্য হচ্ছে মায়াবাদ দর্শন বর্জন করে, বৈষ্ণব আচার্যদের ভাষ্য হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করা। *বেদের* যথার্থ অর্থ হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টায় *ভগবদ্গীতা যথাযথ* পাঠ করা উচিত।

শ্লোক ১২৯

সর্বাশ্রয় ঈশ্বরের করি প্রণব উদ্দেশ ।
'তত্ত্বমসি'-বাক্য হয় বেদের একদেশ ॥ ১২৯ ॥

শ্লোকার্থ

"প্রণব বা ওঁকার-এর দ্বারা সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের চরম লক্ষ্য পরমেশ্বর ভগবানকে বোঝানো হয়েছে। কিন্তু তত্ত্বমসি-বাক্যে বেদের আংশিক অর্থ প্রকাশিত হয়েছে।

তাৎপর্য

তত্ত্বমসি মানে হচ্ছে তুমিই সেই চিৎস্বরূপ।

শ্লোক ১৩০

'প্রণব, মহাবাক্য—তাহা করি' আচ্ছাদন ।
মহাবাক্যে করি 'তত্ত্বমসি'র স্থাপন ॥ ১৩০ ॥

শ্লোকার্থ

"প্রণব (ওঁকার) হচ্ছে বেদের মহাবাক্য (মহামন্ত্র)। সেই মহাবাক্যকে আচ্ছাদন করে শঙ্করাচার্যের অনুগামীরা কোন রকম যুক্তি-প্রমাণ ছাড়াই তত্ত্বমসিকে মহাবাক্যরূপে স্থাপন করে।

তাৎপর্য

মায়াবাদীরা *তত্ত্বমসি, সোঽহম্,* ইত্যাদি শ্রুতি মন্ত্রের উপর জোর দেয়, কিন্তু প্রকৃত মহামন্ত্র প্রণব (ওঁকার)-এর উল্লেখ করে না। তাই, যেহেতু তারা বৈদিক জ্ঞানের কদর্থ করে, সেই হেতু তারা হচ্ছে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে সব চাইতে বড় অপরাধী। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্পষ্টভাবে বলেছেন, 'মায়াবাদী কৃষ্ণে অপরাধী'—মায়াবাদীরা হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের চরণে সব চাইতে বড় অপরাধী। শ্রীকৃষ্ণ ঘোষণা করেছেন—

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্ ।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু ॥

"যারা এই রকম বিদ্বেষী, ক্রূর, নরাধম, নিত্য অশুভ কর্ম অনুষ্ঠানশীল, তাদের আমি এই সংসারে বার বার আসুরী যোনিতে নিক্ষেপ করি।" (*ভগবদ্গীতা* ১৬/১৯) মায়াবাদীরা কৃষ্ণবিদ্বেষী, তাই মৃত্যুর পরে তারা অসুরযোনি লাভ করবে। *ভগবদ্গীতায়* ৯/৩৪ শ্রীকৃষ্ণ যখন বলেছেন, *মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু*—"তোমার মন দিয়ে সর্বক্ষণ আমার কথা চিন্তা কর, আমাকে নমস্কার কর এবং আমার পূজা কর," তখন একদল আসুরিক পণ্ডিত কৃষ্ণের এই উক্তি বিশ্লেষণ করে বলেছে যে, কৃষ্ণের কথা চিন্তা করতে হবে না বা কৃষ্ণের শরণাগত হতে হবে না, সকলের মধ্যে যে অব্যক্ত বস্তু রয়েছে, তার কথা চিন্তা করতে হবে। এই পণ্ডিতটি এই জীবনে নানা রকম দুঃখকষ্ট ভোগ করছে এবং এই জীবনে যদি তার দুঃখকষ্টের মেয়াদ শেষ না হয়, তা হলে পরবর্তী জীবনে আবার তাকে

দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হবে। আমাদের সব সময় সচেতন থাকতে হবে, যাতে আমরা ভগবৎ-বিদ্বেষী না হয়ে পড়ি। তাই পরবর্তী শ্লোকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্পষ্টভাবে *বেদের* উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন।

শ্লোক ১৩১

সর্ববেদসূত্রে করে কৃষ্ণের অভিধান ।
মুখ্যবৃত্তি ছাড়ি' কৈল লক্ষণা-ব্যাখ্যান ॥ ১৩১ ॥

শ্লোকার্থ

"সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে এবং সূত্রে শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন বেদ্য, কিন্তু শঙ্করাচার্যের অনুগামীরা বিকৃতভাবে বেদের অর্থ বিশ্লেষণ করে মুখ্য অর্থ আচ্ছাদিত করেছেন।

তাৎপর্য

এখানে বলা হয়েছে—

বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভরতে তথা ।
আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্বত্র গীয়তে ॥

রামায়ণ, পুরাণ এবং *মহাভারত* আদি বৈদিক শাস্ত্রে, আদিতে, মধ্যে এবং অন্তে সর্বত্রই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির মহিমাই কীর্তিত হয়েছে।

শ্লোক ১৩২

স্বতঃপ্রমাণ বেদ প্রমাণ-শিরোমণি ।
লক্ষণা করিলে স্বতঃপ্রমাণতা-হানি ॥ ১৩২ ॥

শ্লোকার্থ

"স্বতঃপ্রমাণ বেদ হচ্ছে সমস্ত প্রমাণের শিরোমণি, কিন্তু সেই শাস্ত্রের যদি মনগড়া অর্থ বিশ্লেষণ করা হয়, তা হলে তার স্বতঃপ্রমাণতা নষ্ট হয়।

তাৎপর্য

আমাদের উক্তির যথার্থতা প্রমাণ করার জন্য আমরা বৈদিক প্রমাণের উদ্ধৃতি দিই, কিন্তু সেই বেদের যদি মনগড়া অর্থ করা হয়, তা হলে বৈদিক শাস্ত্র ভ্রান্ত এবং

অর্থহীন হয়ে পড়ে। অর্থাৎ বৈদিক উক্তির মনগড়া অর্থ করলে, বৈদিক প্রমাণের গুরুত্ব নষ্ট হয়ে যায়। কেউ যখন বৈদিক শাস্ত্র থেকে উদ্ধৃতি দেয়, তখন তা প্রামাণিক বলে স্বীকার করা যায়। সেই প্রামাণিকতা কিভাবে নিজের আয়ত্তাধীনে আনা যায়?

শ্লোক ১৩৩

এই মত প্রতিসূত্রে সহজার্থ ছাড়িয়া।
গৌণার্থ ব্যাখ্যা করে কল্পনা করিয়া ॥ ১৩৩ ॥

শ্লোকার্থ

"মায়াবাদীরা এইভাবে বৈদিক-সূত্রের অর্থ বর্জন করে, তাদের দর্শন প্রতিষ্ঠা করার জন্য কল্পনাপ্রসূত গৌণ অর্থ ব্যাখ্যা করেছে।"

তাৎপর্য

দুর্ভাগ্যবশত, শঙ্করাচার্যের মায়াবাদের দ্বারা পৃথিবী আচ্ছন্ন হয়ে আছে। তাই বৈদিক শাস্ত্রের সহজ, সরল এবং স্বাভাবিক অর্থ প্রচার করার প্রবল প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। এই কারণেই আমরা *ভগবদ্গীতা যথাযথ* রচনা করে সেই কাজ শুরু করেছি, এবং সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রের যথার্থ অর্থ প্রচার করার পরিকল্পনা করেছি।

শ্লোক ১৩৪

এই মতে প্রতিসূত্রে করেন দূষণ।
শুনি' চমৎকার হৈল সন্ন্যাসীর গণ ॥ ১৩৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন এইভাবে শঙ্করাচার্যের বেদান্ত-সূত্রের ভাষ্যের ভুলগুলি দেখিয়ে দিলেন, তখন সমস্ত সন্ন্যাসীরা চমৎকৃত হলেন।

শ্লোক ১৩৫

সকল সন্ন্যাসী কহে,—'শুনহ শ্রীপাদ।
তুমি যে খণ্ডিলে অর্থ, এ নহে বিবাদ ॥ ১৩৫ ॥

শ্লোকার্থ

তখন সমস্ত মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা বললেন, "শ্রীপাদ, আপনি যে এইভাবে সমস্ত অর্থ খণ্ডন করলেন, তা বিবাদ নয়, কারণ আপনি সূত্রগুলির প্রকৃত অর্থ বিশ্লেষণ করেছেন।

শ্লোক ১৩৬

আচার্য-কল্পিত অর্থ,—ইহা সভে জানি।
সম্প্রদায়-অনুরোধে তবু তাহা মানি ॥ ১৩৬ ॥

শ্লোকার্থ

"আমরা জানি যে, এই সমস্ত বাক্যবিন্যাস হচ্ছে শঙ্করাচার্যের কল্পিত অর্থ। কিন্তু যদিও তা আমাদের সন্তুষ্টি বিধান করে না, তবুও সম্প্রদায়ের অনুরোধে তা আমরা মানি।"

শ্লোক ১৩৭

মুখ্যার্থ ব্যাখ্যা কর, দেখি তোমার বল।'
মুখ্যার্থে লাগাল প্রভু সূত্রসকল ॥ ১৩৭ ॥

শ্লোকার্থ

মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা তখন বললেন, "আপনি কিভাবে মুখ্য অর্থ অনুসারে এই সমস্ত সূত্রের ব্যাখ্যা করেন, তা আমরা দেখতে চাই।" সে কথা শুনে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বেদান্ত-সূত্রের মুখ্য অর্থ ব্যাখ্যা করতে লাগলেন।

শ্লোক ১৩৮

বৃহদ্বস্তু 'ব্রহ্ম' কহি—'শ্রীভগবান্'।
ষড়্বিধৈশ্বর্যপূর্ণ, পরতত্ত্বধাম ॥ ১৩৮ ॥

শ্লোকার্থ

"বৃহত্তম থেকেও বৃহত্তর বস্তু হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। তাই, তিনি হচ্ছেন পরমতত্ত্ব এবং পূর্ণজ্ঞানের আশ্রয়।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে যে, তিনভাবে পরমতত্ত্বের উপলব্ধি হয়—নির্বিশেষ ব্রহ্ম, সর্বভূতস্থ পরমাত্মা এবং চরমে পরমেশ্বর ভগবান। নির্বিশেষ ব্রহ্ম এবং সর্বভূতে বিরাজমান পরমাত্মা হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের শক্তির প্রকাশ। ভগবান ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ এবং তাঁর সেই ছয়টি ঐশ্বর্য হচ্ছে—যথা, বৈভব, বীর্য, যশ, সৌন্দর্য, জ্ঞান এবং বৈরাগ্য। যেহেতু তিনি ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ, তাই ভগবান হচ্ছেন পরম জ্ঞানের চরম তত্ত্ব।

শ্লোক ১৩৯

স্বরূপ-ঐশ্বর্যে তাঁর নাহি মায়াগন্ধ।
সকল বেদের হয় ভগবান্ সে 'সম্বন্ধ' ॥ ১৩৯ ॥

শ্লোকার্থ

"তাঁর স্বরূপে পরমেশ্বর ভগবান মায়িক জগতে সব রকম কলুষ থেকে মুক্ত চিদৈশ্বর্যে পূর্ণ। তাই তিনিই হচ্ছেন সমস্ত বেদের চরম লক্ষ্য।

শ্লোক ১৪০

তাঁরে 'নির্বিশেষ' কহি, চিচ্ছক্তি না মানি।
অর্ধ স্বরূপ না মানিলে পূর্ণতা হয় হানি ॥ ১৪০ ॥

শ্লোকার্থ

"সেই পরমেশ্বরকে যখন নির্বিশেষ বলে বর্ণনা করা হয়, তখন তাঁর চিন্ময় শক্তিকে অস্বীকার করা হয়। ন্যায় শাস্ত্র অনুসারে, সত্যের অর্ধাংশ যদি স্বীকার করা না হয়, তা হলে পূর্ণ স্বরূপ জানা যায় না।

তাৎপর্য

উপনিষদে বলা হয়েছে,

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥

ঈশোপনিষদ, বৃহদারণ্যক উপনিষদ এবং অন্যান্য *উপনিষদে* উল্লিখিত এই শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ। তিনি অদ্বিতীয় তত্ত্ব, কারণ তিনি সমস্ত ঐশ্বর্য, বীর্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান এবং বৈরাগ্যের অধীশ্বর। ব্রহ্ম মানে হচ্ছে বৃহত্তম, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন বৃহত্তম থেকেও বৃহত্তর। ঠিক যেমন সূর্যমণ্ডল সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত সূর্যকিরণ থেকে মহত্তর। যদিও অল্পজ্ঞ মানুষদের কাছে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত সূর্যকিরণকে বিরাট বলে মনে হয়, কিন্তু সেই সূর্যকিরণ থেকেও বৃহত্তর হচ্ছে সূর্যমণ্ডল এবং সেই সূর্যমণ্ডল থেকেও মহত্তর হচ্ছেন সূর্যদেব। তেমনই নির্বিশেষ ব্রহ্মকে যদিও বিরাট বলে মনে হয়, কিন্তু তা বৃহত্তম নয়। নির্বিশেষ ব্রহ্ম হচ্ছে ভগবানের দেহবিচ্ছুরিত রশ্মিচ্ছটা মাত্র, কিন্তু ভগবানের চিন্ময় স্বরূপ এই নির্বিশেষ ব্রহ্ম এবং সর্বভূতস্থ পরমাত্মা থেকেও মহত্তর। তাই বৈদিক শাস্ত্রে যখনই ব্রহ্ম শব্দটির উল্লেখ করা হয়েছে, তখনই বুঝতে হবে যে, তা পরমেশ্বর ভগবানকে বোঝাচ্ছে।

ভগবদ্গীতায় ভগবানকে পরমব্রহ্ম বলেও সম্বোধন করা হয়েছে। মায়াবাদী এবং অল্পজ্ঞ মানুষেরা কখনও কখনও ব্রহ্মের অর্থ বুঝতে ভুল করে, কারণ জীবও হচ্ছে ব্রহ্ম। তাই শ্রীকৃষ্ণকে পরমব্রহ্ম বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বৈদিক শাস্ত্রে যখনই ব্রহ্ম বা পরমাত্মা শব্দ দুটির উল্লেখ করা হয়েছে, তখনই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকেই বোঝানো হয়েছে। সেটি হচ্ছে তাদের প্রকৃত অর্থ। যেহেতু সমস্ত বৈদিক সাহিত্যে ব্রহ্মের আলোচনা হয়েছে, তাই শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন বৈদিক জ্ঞানের চরম লক্ষ্য। নির্বিশেষ ব্রহ্ম সবিশেষ ভগবানকে আশ্রয় করে বিরাজ করে। যদিও প্রাথমিক উপলব্ধি হচ্ছে নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতি, তবুও সেখানে প্রবেশ করে পরম পুরুষ ভগবানকে প্রাপ্ত হতে হবে। *ঈশোপনিষদে* বর্ণনা করা হয়েছে যে, সেটিই হচ্ছে জ্ঞানের পূর্ণতা। *ভগবদ্গীতাতেও* (৭/১৯) সেই কথা বলা হয়েছে। *বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে*—বহু বহু জন্ম-জন্মান্তরে জ্ঞানের মাধ্যমে পরমতত্ত্বকে জানার প্রচেষ্টার পর কেউ যখন শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারেন এবং তাঁর শরণাগত হন, তখন তাঁর জ্ঞান অর্জনের সমস্ত প্রচেষ্টা সার্থক হয়।

নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপে পরমতত্ত্বের আংশিক উপলব্ধির দ্বারা ভগবানের পূর্ণ ঐশ্বর্য হৃদয়ঙ্গম হয় না। এটি পরমতত্ত্বের এক বিপজ্জনক উপলব্ধি। সর্বতোভাবে পরমতত্ত্ব স্বীকার না করা হলে—অর্থাৎ নির্বিশেষ ব্রহ্ম, সর্বভূতস্থ পরমাত্মা এবং পরমেশ্বর ভগবানরূপে তাঁকে না জানা হলে, সেই জ্ঞান পূর্ণ হয় না। শ্রীপাদ রামানুজাচার্য তাঁর *বেদান্ত-সংগ্রহে* বলেছেন—

জ্ঞানেন ধর্মেণ স্বরূপমপি নিরূপিতম্,
ন তু জ্ঞানমাত্রং ব্রহ্মেতি কথামিদম্
সংগমতে ইতি চেৎ?

তাঁর জ্ঞান এবং ধর্মের মাধ্যমে তাঁর স্বরূপ নিরূপণ করতে হবে। কেবল পূর্ণ জ্ঞানময় বলে পরমতত্ত্বকে জানা যথেষ্ট নয়। বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে, *য সর্বজ্ঞঃ সর্ববিৎ* অর্থাৎ, পরমতত্ত্ব সব কিছুই পূর্ণরূপে অবগত, কিন্তু *বেদের* বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পারি যে, *পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে*—তিনি কেবল সর্বজ্ঞই নন, তিনি তাঁর বিভিন্ন শক্তির প্রভাবে ক্রিয়াও করেন। তেমনই ব্রহ্মকে পূর্ণ চিন্ময়রূপে জানাও যথেষ্ট নয়। আমাদের এটিও জানতে হবে যে, তিনি তাঁর বিভিন্ন শক্তির মাধ্যমে চিন্ময় ক্রিয়া করেন। মায়াবাদ দর্শন অনুসারে পরমতত্ত্ব যে চিন্ময় কেবল সেটুকুই বর্ণনা রয়েছে, কিন্তু তিনি যে পূর্ণ চিন্ময়রূপে কিভাবে ক্রিয়া করেন, সেই সম্বন্ধে কোন বর্ণনা নেই। এটিই হচ্ছে সেই দর্শনের ত্রুটি।

শ্লোক ১৪১

ভগবান্-প্রাপ্তিহেতু যে করি উপায়।
শ্রবণাদি ভক্তি—কৃষ্ণ-প্রাপ্তির সহায় ॥ ১৪১ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রবণ, কীর্তন আদি নবধা ভক্তির মাধ্যমেই কেবল ভগবানকে পাওয়া যায়। তাঁকে পাওয়ার এটিই হচ্ছে একমাত্র উপায়।

তাৎপর্য

ব্রহ্মকে সমস্ত জ্ঞানের সমষ্টিরূপে জেনেই মায়াবাদীরা সন্তুষ্ট, কিন্তু বৈষ্ণব দার্শনিকেরা পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে কেবলমাত্র অবগতই নন,

কিভাবে তাঁকে পাওয়া যায়, সেই উপায়ও তাঁরা জানেন। শ্রবণ আদি নবধা ভক্তির পন্থাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বর্ণনা করেছেন।

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্ ॥

(*শ্রীমদ্ভাগবত* ৭/৫/২৩)

যে নবধা ভক্তির মাধ্যমে ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়া যায়, তার মধ্যে ভগবানের কথা শ্রবণ হচ্ছে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ। এই শ্রবণের পন্থা অনুসারে মানুষ যদি কেবল কৃষ্ণকথা শ্রবণ করার সুযোগ পায়, তা হলেই তাদের সুপ্ত ভগবৎ-প্রেম ধীরে ধীরে বিকশিত হবে। 'শ্রবণাদি-শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয়' (*চৈঃ চঃ মধ্য* ২২/১০৭)। ভগবৎ-প্রেম সকলের মধ্যেই সুপ্তভাবে রয়েছে, কিন্তু কেউ যদি ভগবানের কথা শ্রবণ করার সুযোগ পায়, তা হলে অবশ্যই সেই প্রেম বিকশিত হবে। এই তত্ত্বের ভিত্তিতে আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন প্রতিষ্ঠিত। আমরা কেবল জনসাধারণকে পরমেশ্বর ভগবানের কথা শ্রবণ করার সুযোগ দান করি, আর তাদের ভগবৎ-প্রসাদ সেবন করতে দিই এবং তার ফলে পৃথিবীর সর্বত্র মানুষ শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তে পরিণত হচ্ছে। আমরা সারা পৃথিবী জুড়ে শত শত কৃষ্ণমন্দির প্রতিষ্ঠা করেছি, যাতে মানুষ কৃষ্ণকথা শ্রবণ করতে পারে এবং কৃষ্ণপ্রসাদ সেবন করতে পারে। এই দুটি পন্থা যে কেউই গ্রহণ করতে পারে, এমন কি একটি শিশু পর্যন্ত। ধনী-দরিদ্র, পণ্ডিত-মূর্খ, শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গ, বৃদ্ধ-শিশু নির্বিশেষে সকলেই পরমেশ্বর ভগবানের কথা শ্রবণ করে এবং কৃষ্ণপ্রসাদ সেবন করে, ভগবদ্ভক্তির চিন্ময় স্তরে উন্নীত হতে পারে।

শ্লোক ১৪২

সেই সর্ববেদের 'অভিধেয়' নাম।
সাধনভক্তি হৈতে হয় প্রেমের উদ্গম ॥ ১৪২ ॥

শ্লোকার্থ

"সদ্গুরুর তত্ত্বাবধানে এই বৈধীভক্তি সাধন করার ফলে, অবশ্যই সুপ্ত ভগবৎ-প্রেমের উদ্গম হয়। এই পন্থাকে বলা হয় অভিধেয়।

তাৎপর্য

শ্রবণ, কীর্তন আদির মাধ্যমে ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করার ফলে, বদ্ধ জীবের কলুষিত হৃদয় নির্মল হয়, এবং তখন তিনি পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে তাঁর নিত্য সম্বন্ধ উপলব্ধি করতে পারেন। সেই নিত্য সম্পর্কের বর্ণনা করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, জীবের 'স্বরূপ' হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস—প্রতিটি জীবই তার স্বরূপে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস। কেউ যখন এই সম্পর্ক সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অবগত হন, তখন তিনি সেই সম্বন্ধ স্থাপনে তৎপর হন। তাকে বলা হয় *অভিধেয়*। তার পরবর্তী স্তর হচ্ছে *প্রয়োজনসিদ্ধি* বা জীবনের চরম উদ্দেশ্য সাধন করা। কেউ যখন পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন এবং সেই সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য তৎপর হন, তখন আপনা থেকেই তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য সফল হয়। মায়াবাদীরা আত্মজ্ঞান লাভের এই প্রাথমিক স্তরটি পর্যন্ত লাভ করতে পারে না, কারণ ভগবানের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে তাদের কোন ধারণাই নেই। তিনি হচ্ছেন সর্বলোক মহেশ্বর এবং তিনিই হচ্ছেন একমাত্র পুরুষ, যিনি সমস্ত জীবের সেবা গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু যেহেতু মায়াবাদীদের সেই জ্ঞান নেই, তাই ভগবানের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের জ্ঞান পর্যন্তও মায়াবাদীদের নেই। তারা ভ্রান্তভাবে মনে করে যে, সকলেই ভগবান অথবা সকলেই ভগবানের সমান। তাই, জীবের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে যেহেতু তাদের কোন স্পষ্ট ধারণা নেই, তা হলে পরমার্থের পথে তারা অগ্রসর হবে কিভাবে? যদিও তারা নিজেদের মুক্ত বলে অভিমান করে, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের প্রতি অশ্রদ্ধা-পরায়ণ হওয়ার ফলে, তারা অচিরেই অধঃপতিত হয়। তাকেই বলা হয় *পতন্ত্যধঃ*। এটি গর্ভস্থ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দেবতাদের বন্দনা—সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ।
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ॥

(*শ্রীমদ্ভাগবত* ১০/২/৩২)

যে সমস্ত মানুষ নিজেদের মুক্ত বলে অভিমান করে, কিন্তু ভগবানের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের কথা না জেনে ভগবানের প্রতি ভক্তিপরায়ণ হয় না, তারা অবশ্যই বিপথগামী হয়েছে, এবং তাই ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করার ফলে, তারা অচিরেই অধঃপতিত হয়। ভগবানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের কথা যথাযথভাবে জানতে হবে, তা হলেই কেবল জীবনের পরম উদ্দেশ্য সাধন করা সম্ভব।

শ্লোক ১৪৩

কৃষ্ণের চরণে হয় যদি অনুরাগ।
কৃষ্ণ বিনু অন্যত্র তার নাহি রহে রাগ ॥ ১৪৩ ॥

শ্লোকার্থ

"কেউ যদি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রীতিপরায়ণ হয়ে তাঁর শ্রীপাদপদ্মের প্রতি অনুরক্ত হন, তা হলে ধীরে ধীরে অন্য সব কিছুর প্রতি তাঁর আসক্তি নষ্ট হয়ে যাবে।

তাৎপর্য

ভগবদ্ভক্তির মার্গে উন্নতির এটি একটি লক্ষণ। *ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র স্যাৎ*—ভক্ত যখন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আসক্তি অনুভব করেন, তখন তিনি অন্য সব কিছুর প্রতি আসক্তি রহিত হয়ে বিরক্ত হন। মায়াবাদীরা যদিও মুক্তির পথে অনেক এগিয়ে গেছে বলে মনে করা হয়, কিন্তু আমরা দেখি যে, কিছুদিন পরে আবার তারা রাজনীতি বা জনসেবার কাজ করার জন্য নেমে আসে। বহু বড় বড় সন্ন্যাসী, যাদের মুক্ত বলে ধারণা করা হয়, এই জগৎকে মিথ্যা বলে পরিত্যাগ করার পরেও, আবার তাঁদের জড়-জাগতিক কার্যকলাপে লিপ্ত হবার জন্য নেমে আসতে দেখা গেছে। কিন্তু ভক্ত যখন ভক্তিমার্গে ভগবানের সেবায় লিপ্ত হন, তখন আর তাঁর এই ধরনের জনহিতকর কার্যের প্রতি আসক্তি থাকে না। কেবল ভগবানের সেবাতেই অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি সারা জীবন কেবল ভগবানের সেবাই করে যান। এটিই হচ্ছে বৈষ্ণবের সঙ্গে মায়াবাদীর পার্থক্য। তাই ভগবদ্ভক্তির পন্থা অত্যন্ত ব্যবহারিক, কিন্তু মায়াবাদীর পন্থা মনোধর্ম-প্রসূত জল্পনা-কল্পনা মাত্র।

শ্লোক ১৪৪

পঞ্চম পুরুষার্থ সেই প্রেম-মহাধন।
কৃষ্ণের মাধুর্য-রস করায় আস্বাদন ॥ ১৪৪ ॥

শ্লোকার্থ

"ভগবৎ-প্রেম এমনই এক অমূল্য সম্পদ যে, তাকে মানব-জীবনের পঞ্চম পুরুষার্থ বলে বিবেচনা করা হয়। ভগবৎ-প্রেম বিকশিত করার ফলে মাধুর্য প্রেমের স্তরে উন্নীত হওয়া যায়, এবং এই জন্মেই সেই রস আস্বাদন করা যায়।

তাৎপর্য

মায়াবাদীরা মনে করে যে, জীবনের পরম পূর্ণতা হচ্ছে মুক্তি, যা হচ্ছে চতুর্বর্গের চতুর্থ স্তর। সাধারণত মানুষ ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ—এই চতুর্বর্গ সম্বন্ধেই অবগত। কিন্তু ভগবদ্ভক্তির স্তর মুক্তিরও ঊর্ধ্বে। কেউ যখন যথাযথভাবে মুক্ত হন, তখনই তিনি কৃষ্ণপ্রেমের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন শ্রীরূপ গোস্বামীকে শিক্ষা দিচ্ছিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন, "কোটিমুক্ত-মধ্যে 'দুর্লভ' এক কৃষ্ণভক্ত"—কোটি কোটি মুক্ত পুরুষদের মধ্যে একজন কৃষ্ণভক্ত পাওয়াও দুষ্কর।

সব চাইতে উচ্চস্তরের মায়াবাদী মুক্তির স্তর পর্যন্ত উন্নীত হতে পারেন, কিন্তু কৃষ্ণভক্তি এই মুক্তির স্তরেরও ঊর্ধ্বে। সেই সম্বন্ধে শ্রীল ব্যাসদেব (*শ্রীমদ্ভাগবতে* ১/১/২) বলেছেন—

ধর্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্মৎসরাণাং সতাং ।
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্ ॥

"জড় বাসনাযুক্ত সব রকমের ধর্ম সম্পূর্ণভাবে বর্জন করে এই *ভাগবত পুরাণ* পরম সত্যকে প্রকাশ করেছে, যা কেবল সর্বতোভাবে বিশুদ্ধ ভক্তরাই হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। পরম সত্য হচ্ছে পরম মঙ্গলময় বাস্তব বস্তু। সেই সত্যকে জানতে পারলে ত্রিতাপ দুঃখ সমূলে উৎপাটিত হয়।" *বেদান্ত-সূত্রের* ভাষ্য *শ্রীমদ্ভাগবত*, *পরমো নির্মৎসরাণাং* ভক্তদের জন্য অর্থাৎ যাঁদের হৃদয় সম্পূর্ণরূপে ঈর্ষাবিহীন তাঁদের জন্য। মায়াবাদীরা পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ, তাই *বেদান্ত-সূত্র* তাদের জন্য নয়। তারা অনর্থক *বেদান্ত-সূত্রে* নাক গলাতে চায়, কিন্তু তা বোঝার ক্ষমতা তাদের নেই। *বেদান্ত-সূত্রের* প্রণেতা তাঁর ভাষ্য *শ্রীমদ্ভাগবতে* বর্ণনা করেছেন যে, *বেদান্ত-সূত্র* কেবল তাঁদেরই জন্য যাঁদের হৃদয় নির্মল হয়েছে (*পরমো নির্মৎসরাণাম্*)। কেউ যদি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হন, তা হলে তিনি *বেদান্ত-সূত্র* বা *শ্রীমদ্ভাগবত* বুঝবেন কি করে? মায়াবাদীদের একমাত্র কাজ হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা করা। যেমন *ভগবদ্গীতায়* ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর শরণাগত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন, কিন্তু ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত এবং তথাকথিত দার্শনিক প্রতিবাদ করেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হতে হবে না। এর থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ। যেহেতু সমস্ত মায়াবাদীরাই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ, তাই *বেদান্ত-সূত্রের* অর্থ হৃদয়ঙ্গম করার কোন সম্ভাবনা তাদের নেই। এমন কি তারা যদি মুক্তও হয় যা তারা দাবি করে, তবুও এখানে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কথা পুনরাবৃত্তি করে বলেছেন যে, কৃষ্ণপ্রেম মুক্তিরও অতীত।

শ্লোক ১৪৫

প্রেমা হৈতে কৃষ্ণ হয় নিজ ভক্তবশ ।
প্রেমা হৈতে পায় কৃষ্ণের সেবা-সুখরস ॥ ১৪৫ ॥

শ্লোকার্থ

"মহত্তম থেকে মহত্তর যে পরমেশ্বর ভগবান, তিনি ভক্তির প্রভাবে তাঁর অতি নগণ্য ভক্তেরও অধীন হয়ে পড়েন। এটিই হচ্ছে ভগবদ্ভক্তির অপূর্ব মাধুর্য এবং তার প্রভাবে অসীম যে পরমেশ্বর তিনি অতি নগণ্য জীবের অধীন হয়ে পড়েন। ভগবানের সঙ্গে প্রেমের বিনিময়ের ফলে, ভক্ত কৃষ্ণের সেবাসুখ রস আস্বাদন করেন।

তাৎপর্য

ভক্ত কখনও পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যেতে চান না। *মুক্তি স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলি সেবতেঽস্মান্* (*কৃষ্ণকর্ণামৃত* ১০৭) শ্রীল বিল্বমঙ্গল ঠাকুর তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলেছেন যে, হৃদয়ে যখন ভগবদ্ভক্তির বিকাশ হয় তখন মুক্তি স্বয়ং তাঁর নগণ্য দাসীর মতো তাঁকে সেবা করার জন্য উন্মুখ হন। করজোড়ে ভক্তের সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়ে, মুক্তি তখন ভক্তের সব রকম সেবা করতে প্রস্তুত থাকেন। মায়াবাদীদের মুক্তি ভক্তের কাছে অত্যন্ত নগণ্য, কারণ ভক্তির মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবান পর্যন্ত তাঁর বশীভূত হয়ে পড়েন। তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে, পরমেশ্বর ভগবান অর্জুনের রথের সারথি হয়েছিলেন এবং যখন তাঁকে উভয় পক্ষের সেনাবাহিনীর মধ্যে রথ নিয়ে যেতে বলেন (*সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত*), শ্রীকৃষ্ণ তখন তাঁর সেই আদেশ পালন করেছিলেন। এমনই হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে ভক্তের সম্পর্ক। যদিও ভগবান *মহতো মহীয়ান্*, তবুও তিনি তাঁর ভক্তের অবিমিশ্র ভক্তির প্রভাবে তাঁর সেবা করেন।

শ্লোক ১৪৬

সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন নাম ।
এই তিন অর্থ সর্বসূত্রে পর্যবসান ॥ ১৪৬ ॥

শ্লোকার্থ

"পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে যে সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধ অনুসারে ক্রিয়াকলাপ এবং জীবনের পরম প্রয়োজন (কৃষ্ণপ্রেম)—এই তিনটি বিষয় বেদান্ত-সূত্রের প্রতিটি

সূত্রে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কারণ সমস্ত বেদান্ত-দর্শন এই তিনটি তত্ত্বে পর্যবসিত হয়েছে।"

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে (৫/৫/৫) বলা হয়েছে—

পরাভবস্তাবদবোধজাতো
যাবন্ন জিজ্ঞাসত আত্মতত্ত্বম্ ॥

যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত না হয়, ততক্ষণ তার সমস্ত কার্যকলাপ ব্যর্থ হয়। জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত হওয়া যায় জিজ্ঞাসার মাধ্যমে। তাই *অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা*—এটি সেই ধরনের জিজ্ঞাসা, যা দিয়ে *বেদান্ত-সূত্রের* শুরু। মানুষের জানবার চেষ্টা করা উচিত—সে কে, এই জগৎ কি, ভগবান কে, এবং ভগবানের সঙ্গে তার সম্পর্ক কি রকম? কুকুর-বেড়ালেরা এই সমস্ত প্রশ্ন করতে পারে না। এই সমস্ত প্রশ্নের উদয় হয় যথার্থ মানুষের হৃদয়ে। এই চারটি বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান—যথা, নিজের সম্বন্ধে, জগৎ সম্বন্ধে, ভগবান সম্বন্ধে এবং ভগবানের সঙ্গে জীবের সম্পর্ক সম্বন্ধে—একে বলা হয় *সম্বন্ধ-জ্ঞান*। পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে যখন সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তার পরবর্তী কর্তব্য হচ্ছে সেই সম্বন্ধ অনুসারে কার্য করা। তাকে বলা হয় *অভিধেয়*। অভিধেয় সম্পাদন করার ফলে যখন জীবের পরম উদ্দেশ্য ভগবৎ-প্রেম লাভ হয়, তখন তিনি *প্রয়োজন-সিদ্ধি* লাভ করেন। *ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্ত-সূত্রে* এই সমস্ত বিষয়গুলি অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তাই এই তত্ত্ব অনুসারে যে *বেদান্ত-সূত্র* হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না, সে কেবল তার সময়ের অপচয় করছে। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/২/৮) সেই কথাই বলা হয়েছে—

ধর্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেনকথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্‌যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥

কেউ মস্ত বড় পণ্ডিত হতে পারেন এবং খুব ভালভাবে তাঁর কর্তব্য সম্পাদন করতে পারেন, কিন্তু তিনি যদি পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা শ্রবণে উৎসুক না হন, তা হলে তিনি যা করেছেন তা সবই সময়ের অপচয় মাত্র। মায়াবাদীরা, যারা জড় জগতের সঙ্গে এবং পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের কথা অবগত নয়, তারা কেবল তাদের সময়ের অপচয় করছে এবং তাদের দার্শনিক জল্পনা-কল্পনার কোন মূল্য নেই।

শ্লোক ১৪৭

এইমত সর্বসূত্রের ব্যাখ্যান শুনিয়া।
সকল সন্ন্যাসী কহে বিনয় করিয়া ॥ ১৪৭ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে সমস্ত মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা যখন সম্বন্ধ, অভিধেয় এবং প্রয়োজন সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ব্যাখ্যা শুনলেন, তখন তাঁরা অত্যন্ত বিনীতভাবে বললেন।

তাৎপর্য

কেউ যদি যথার্থই বেদান্ত-দর্শন হৃদয়ঙ্গম করতে চান, তা হলে তাঁকে অবশ্যই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অথবা বৈষ্ণব আচার্যকৃত ভক্তিযোগের মাধ্যমে *বেদান্ত-সূত্রের* ব্যাখ্যা শুনতে হবে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছ থেকে *বেদান্ত-সূত্রের* ব্যাখ্যা শুনে প্রকাশানন্দ সরস্বতী প্রমুখ সমস্ত সন্ন্যাসীরা বিনীতভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে এই কথাগুলি বলেছিলেন।

শ্লোক ১৪৮

বেদময়-মূর্তি তুমি,—সাক্ষাৎ নারায়ণ।
ক্ষম অপরাধ,—পূর্বে যে কৈলুঁ নিন্দন ॥ ১৪৮ ॥

শ্লোকার্থ

"হে প্রভু। তুমি বৈদিক জ্ঞানের মূর্ত বিগ্রহ, তুমি সাক্ষাৎ নারায়ণ। পূর্বে তোমার নিন্দা করে আমরা যে অপরাধ করেছি, আমাদের সেই অপরাধ তুমি ক্ষমা কর।"

তাৎপর্য

ভক্তিলাভের পন্থা সম্পূর্ণভাবে দৈন্য এবং বিনয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় তাঁর *বেদান্ত-সূত্রের* ব্যাখ্যা শ্রবণ করে মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা অত্যন্ত বিনীত এবং তাঁর বাধ্য হয়েছিলেন। *বেদান্ত-সূত্র* অধ্যয়ন না করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যে নৃত্যকীর্তন করেছিলেন, সেই জন্য তাঁকে নিন্দা করার অপরাধের জন্য তাঁরা তাঁর কাছে ক্ষমাভিক্ষা করেছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমরা কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন প্রচার করছি। আমরা *বেদান্ত-সূত্রের* পণ্ডিত না হতে

পারি এবং তার অর্থ না বুঝতে পারি, কিন্তু আমরা অত্যন্ত নিষ্ঠাভরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং পূর্বতন আচার্যদের পদাঙ্ক অনুসরণ করি, এবং এইভাবে আমরা *বেদান্ত-সূত্রের* মর্ম পূর্ণরূপে উপলব্ধি করেছি।

শ্লোক ১৪৯

সেই হৈতে সন্ন্যাসীর ফিরি গেল মন ।
'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' নাম সদা করয়ে গ্রহণ ॥ ১৪৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছ থেকে বেদান্ত-সূত্রের ব্যাখ্যা শ্রবণ করার পর থেকেই মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের মনোবৃত্তি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হল, এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশে তাঁরাও নিরন্তর "কৃষ্ণ। কৃষ্ণ।" নাম গ্রহণ করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

এই সম্পর্কে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সহজিয়ারা কখনও কখনও বলে প্রকাশানন্দ সরস্বতী এবং প্রবোধানন্দ সরস্বতী একই ব্যক্তি। প্রবোধানন্দ সরস্বতী ছিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এক মহান বৈষ্ণব ভক্ত, কিন্তু কাশীর মায়াবাদীদের নেতা শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতী ভিন্ন ব্যক্তি। প্রবোধানন্দ সরস্বতী রামানুজ সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব কিন্তু প্রকাশানন্দ সরস্বতী ছিলেন শঙ্করাচার্যের সম্প্রদায়ভুক্ত। প্রবোধানন্দ সরস্বতী *শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত, শ্রীরাধারসসুধানিধি, সঙ্গীতমাধব, বৃন্দাবন-শতক, নবদ্বীপ-শতক* আদি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেছেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ করছিলেন, তখন তাঁর সঙ্গে প্রবোধানন্দ সরস্বতীর পরিচয় হয়। প্রবোধানন্দ সরস্বতীর দুই ভ্রাতা ব্যেঙ্কট ভট্ট এবং ত্রিমল্ল ভট্ট। এঁরা ছিলেন রামানুজ সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব। গোপাল ভট্ট গোস্বামী হচ্ছেন প্রবোধানন্দ সরস্বতীর ভ্রাতুষ্পুত্র। ঐতিহাসিক তথ্য থেকে দেখা যায় যে, ১৪৩৩ শকাব্দে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ করছিলেন, এবং সেই শকাব্দের চাতুর্মাস্যের সময় তাঁর সঙ্গে প্রবোধানন্দ সরস্বতীর সাক্ষাৎকার হয়। তা হলে তার দুই বছর পরে ১৪৩৫ শকাব্দে শঙ্কর সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীরূপে সেই একই ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয় কি করে? এর থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, প্রবোধানন্দ সরস্বতী এবং প্রকাশানন্দ সরস্বতী এক ব্যক্তি বলে যে সহজিয়া সম্প্রদায়ের ধারণা, সেটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত।

শ্লোক ১৫০

এইমতে তাঁ-সবার ক্ষমি' অপরাধ ।
সবাকারে কৃষ্ণনাম করিলা প্রসাদ ॥ ১৫০ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করলেন এবং অত্যন্ত কৃপাপূর্বক তাঁদের কৃষ্ণনাম দান করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের পরম করুণাময় অবতার। শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন, *মহাবদান্যাবতার* বা সব চাইতে উদার অবতার। শ্রীল রূপ গোস্বামী আরও বলেছেন, *করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ*—তাঁর অপার করুণা বিতরণ করার জন্য তিনি এই কলিযুগে জন্মগ্রহণ করেছেন। এইখানে তা প্রমাণিত হল। মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা শ্রীকৃষ্ণের চরণে অপরাধী বলে, মহাপ্রভু তাদের মুখ দর্শন করতে চাননি, কিন্তু এখানে তিনি তাদের সকলকে ক্ষমা করলেন *(তাঁ-সবার ক্ষমি' অপরাধ)* । প্রচারের এটি একটি আদর্শ দৃষ্টান্ত। *'আপনি আচরি' ভক্তি শিখাইমু সবারে।'* শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আমাদের শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন যে, প্রচার করার সময় যাদের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হবে, তারা সকলেই কৃষ্ণবিদ্বেষী অপরাধী। কিন্তু প্রচারকের কর্তব্য হচ্ছে, তাদেরকে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন সম্বন্ধে যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা প্রত্যয় উৎপাদন করিয়ে, হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনে উদ্বুদ্ধ করা। নানা রকম বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রসার হচ্ছে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে এমন কি আফ্রিকাতেও মানুষেরা এই নাম-সংকীর্তনের পন্থা অবলম্বন করছেন। ভগবৎ-বিদ্বেষীদেরও হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনে উদ্বুদ্ধ করে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের সাফল্যের দৃষ্টান্ত দিয়ে গিয়েছেন। আমাদের কর্তব্য হচ্ছে, গভীর শ্রদ্ধা সহকারে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পদাঙ্ক অনুসরণ করা। তা হলে আমাদের প্রচেষ্টায় আমরা যে সফল হব, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

শ্লোক ১৫১

তবে সব সন্ন্যাসী মহাপ্রভুকে লৈয়া ।
ভিক্ষা করিলেন সভে, মধ্যে বসাইয়া ॥ ১৫১ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর সমস্ত সন্ন্যাসীরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে তাঁদের মাঝখানে বসিয়ে প্রসাদ গ্রহণ করলেন।

তাৎপর্য

পূর্বে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের সঙ্গে মেলামেশা করেননি, এমন কি কথাও বলেননি। এখন তিনি তাঁদের সঙ্গে একসাথে বসে প্রসাদ সেবন করছেন। এর থেকে বোঝা যায় যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন তাঁদের হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন এবং তাঁদের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করেছিলেন, তখন তাঁরা পবিত্র হয়েছিলেন। তাই, তাঁদের সঙ্গে একসাথে বসে আহার করতে তাঁর কোন আপত্তি ছিল না, যদিও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জানতেন যে, সেই আহার্য বস্তুগুলি ভগবানকে নিবেদন করা হয়নি। মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা ভগবানের শ্রীবিগ্রহের আরাধনা করেন না, আর যদিও বা করেন, তাঁরা শিবের পূজা করেন অথবা পঞ্চোপাসনা (বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, গণেশ এবং সূর্যের উপাসনা) করেন। এখানে আমরা কোন দেব-দেবী অথবা বিষ্ণুর উল্লেখ পাই না, কিন্তু তবুও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাসীদের সঙ্গে বসে আহার করেছিলেন, কারণ তাঁরা হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করেছিলেন এবং তিনি তাঁদের অপরাধ ক্ষমা করেছিলেন।

শ্লোক ১৫২

ভিক্ষা করি' মহাপ্রভু আইলা বাসাঘর ।
হেন চিত্র-লীলা করে গৌরাঙ্গ-সুন্দর ॥ ১৫২ ॥

শ্লোকার্থ

মায়াবাদীদের সঙ্গে একত্রে আহার করে, গৌরসুন্দর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর বাসায় ফিরে গেলেন। এইভাবে মহাপ্রভু তাঁর বিচিত্র লীলা প্রকাশ করলেন।

শ্লোক ১৫৩

চন্দ্রশেখর, তপন মিশ্র, আর সনাতন ।
শুনি' দেখি' আনন্দিত সবাকার মন ॥ ১৫৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যে কিভাবে যুক্তির মাধ্যমে মায়াবাদীদের পরাস্ত করেছেন, সেই কথা শুনে চন্দ্রশেখর, তপন মিশ্র এবং সনাতন অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

সন্ন্যাসী যে কিভাবে প্রচার করবে, তার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া হয়েছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন বারাণসীতে যান, তখন তিনি সেখানে একলাই গিয়েছিলেন, দলবল নিয়ে যাননি। কিন্তু সেখানে তিনি চন্দ্রশেখর ও তপন মিশ্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছিলেন, এবং সনাতন গোস্বামীও তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য সেখানে এসেছিলেন। তাই, যদিও সেখানে তাঁর বন্ধুবান্ধব ছিল না, কিন্তু প্রচারের ফলে এবং স্থানীয় মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের তর্কে পরাস্ত করার ফলে, তিনি সেই অঞ্চলে প্রভূত যশ অর্জন করেছিলেন, তা পরবর্তী শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ১৫৪

প্রভুকে দেখিতে আইসে সকল সন্ন্যাসী ।
প্রভুর প্রশংসা করে সব বারাণসী ॥ ১৫৪ ॥

শ্লোকার্থ

এই ঘটনার পর বহু মায়াবাদী সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দেখতে এসেছিলেন, এবং সমস্ত বারাণসী নগরী মহাপ্রভুর প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠেছিল।

শ্লোক ১৫৫

বারাণসীপুরী আইলা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ।
পুরীসহ সর্বলোক হৈল মহাধন্য ॥ ১৫৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বারাণসী নগরীতে এলেন, এবং সেই নগরীর সমস্ত লোক সেই জন্য নিজেদের মহাধন্য বলে মনে করেছিলেন।

শ্লোক ১৫৬

লক্ষ লক্ষ লোক আইসে প্রভুকে দেখিতে ।
মহাভিড় হৈল দ্বারে, নারে প্রবেশিতে ॥ ১৫৬ ॥

শ্লোকার্থ

মহাপ্রভুকে দেখবার জন্য লক্ষ লক্ষ লোক আসতে লাগল। ফলে গৃহের দরজায় ভীষণ ভিড় হল এবং তারা গৃহে প্রবেশ করতে পারল না।

শ্লোক ১৫৭

প্রভু যবে যা'ন বিশ্বেশ্বর-দরশনে ।
লক্ষ লক্ষ লোক আসি' মিলে সেই স্থানে ॥ ১৫৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন বিশ্বেশ্বর মন্দিরে যান, তখন তাঁকে দেখবার জন্য লক্ষ লক্ষ লোক সেখানে সমবেত হয়।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নিয়মিতভাবে বারাণসীতে বিশ্বেশ্বরকে (শিবকে) দর্শন করতে যেতেন। বৈষ্ণবেরা সাধারণত দেবতাদের মন্দিরে যান না, কিন্তু আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নিয়মিতভাবে বিশ্বেশ্বর মন্দিরে যেতেন। সাধারণত মায়াবাদী সন্ন্যাসী এবং শৈব পার্ষদেরা বারাণসীতে থাকে, কিন্তু বৈষ্ণব সন্ন্যাসীরূপী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কেন বিশ্বেশ্বর মন্দিরে গেলেন? তার উত্তর হচ্ছে যে, বৈষ্ণবেরা দেবতাদের অশ্রদ্ধা করেন না। বৈষ্ণব সকলের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, তবে তিনি কখনও দেব-দেবীদের পরমেশ্বর ভগবানের সমকক্ষ বলে স্বীকার করেন না।

ব্রহ্ম-সংহিতায় শিব, ব্রহ্মা, সূর্য, গণেশ, এবং বিষ্ণুর প্রণাম-মন্ত্র উল্লেখ করা হয়েছে। নির্বিশেষবাদীরা *পঞ্চোপাসনায়* এঁদের সকলের পূজা করেন। নির্বিশেষবাদীরা তাঁদের মন্দিরে বিষ্ণু, শিব, সূর্য, দুর্গা, গণেশ এবং কখনও কখনও ব্রহ্মারও মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন, এবং বর্তমান যুগেও হিন্দুধর্মের নামে সেই প্রথা

প্রচলিত রয়েছে। বৈষ্ণবেরাও অন্যান্য সমস্ত দেব-দেবীদের পূজা করতে পারেন, কিন্তু কেবল *ব্রহ্ম-সংহিতার* ভিত্তিতে, যা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অনুসরণীয় বলে নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন। *ব্রহ্ম-সংহিতায়* শিব, ব্রহ্মা, দুর্গা, সূর্য, এবং গণেশের সম্বন্ধে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তা এখানে আলোচনা করছি—

সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়সাধনশক্তিরেকা
ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্তি দুর্গা ।
ইচ্ছানুরূপমপি যস্য চ চেষ্টতে সা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"স্বরূপশক্তি বা চিৎ-শক্তির ছায়াস্বরূপা প্রাপঞ্চিক জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয় সাধনকারী মায়াশক্তিই ভুবন-পূজিতা দুর্গা। তিনি যাঁর ইচ্ছানুসারে ক্রিয়া করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।" (*ব্রহ্ম-সংহিতা* ৫/৪৪)

ক্ষীরং যথা দধি বিকারবিশেষযোগাৎ
সঞ্জায়তে ন হি ততঃ পৃথগস্তি হেতোঃ ।
যঃ শম্ভুতামপি তথা সমুপৈতি কার্যাদ্-
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"দুধ যেমন বিকার-বিশেষের যোগে দই হয়ে যায়, তবুও কারণরূপ দুধ থেকে পৃথক তত্ত্ব হয় না, সেইরূপ যিনি কার্যবশত শম্ভুতা প্রাপ্ত হন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।" (*ব্রহ্ম-সংহিতা* ৫/৪৫)

ভাস্বান্ যথাশ্মশকলেষু নিজেষু তেজঃ
স্বীয়ং কিয়ৎ প্রকটয়ত্যপি যদ্বদত্র ।
ব্রহ্মা য এষ জগদণ্ডবিধানকর্তা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"সূর্য যেমন সূর্যকান্ত আদি মণিসমূহে নিজ তেজ কিছু পরিমাণে প্রকট করেন, তেমনই বিভিন্ন অংশ-স্বরূপ ব্রহ্মা, যাঁর থেকে শক্তি প্রাপ্ত হয়ে ব্রহ্মাণ্ডের বিধান করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।" (*ব্রহ্ম-সংহিতা* ৫/৪৯)

যৎপাদপল্লবযুগং বিনিধায় কুম্ভ-
দ্বন্দ্বে প্রণামসময়ে স গণাধিরাজঃ ।
বিঘ্নান্ বিহন্তুমলমস্য জগত্রয়স্য
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"গণেশ ত্রিজগতের বিঘ্ন বিনাশ করার উদ্দেশ্যে শক্তি লাভের জন্য যাঁর পাদপদ্ম স্বীয় মস্তকের কুম্ভযুগলের উপর নিয়ত ধারণ করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।" *(ব্রহ্ম-সংহিতা ৫/৫০)*

যচ্চক্ষুরেষ সবিতা সকল গ্রহাণাং
রাজা সমস্তসুরমূর্তিরশেষতেজাঃ ।
যস্যাজ্ঞয়া ভ্রমতি সংভৃতকালচক্রো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"সমস্ত গ্রহের রাজা, অশেষ তেজ বিশিষ্ট, সুরমূর্তি সবিতা বা সূর্য এই জগতের চক্ষুস্বরূপ। তিনি যাঁর আজ্ঞায় কালচক্রারূঢ় হয়ে ভ্রমণ করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।" *(ব্রহ্ম-সংহিতা ৫/৫২)*

সমস্ত দেব-দেবীরা হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের দাসদাসী; তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের সমকক্ষ নন। তাই কেউ যদি পূর্বোক্ত *পঞ্চোপাসনার* মন্দিরে যান, তা হলে নির্বিশেষবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গিতে সেখানকার দেব-দেবীদের দর্শন করা উচিত নয়। তাঁরা সকলেই হচ্ছেন সবিশেষ দেব-দেবী, তাঁরা সকলেই পরমেশ্বর ভগবানের আদেশ অনুসারে তাঁর সেবা করেন। যেমন, শঙ্করাচার্য হচ্ছেন শিবের অবতার, সেই কথা *পদ্ম-পুরাণে* বর্ণিত হয়েছে। তিনি পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশ অনুসারে মায়াবাদ দর্শন প্রচার করেছিলেন। সেই বিষয়ে আমরা এই পরিচ্ছেদের ১১৪ শ্লোকে আলোচনা করেছি—

তাঁর দোষ নাহি, তেঁহো আজ্ঞাকারী দাস ।
আর যেই শুনে তার হয় সর্বনাশ ॥

"বেদের প্রকৃত অর্থ আচ্ছাদন করেছেন বলে শঙ্করাচার্যের কোন দোষ হয়নি, ভগবানের নির্দেশেই তিনি তা করেছেন।" যদিও শিব ব্রাহ্মণরূপে (শঙ্করাচার্যরূপে) মায়াবাদরূপ অসৎ শাস্ত্র প্রচার করেছিলেন, তবুও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন যে, যেহেতু তিনি পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশানুসারে তা করেছিলেন, সেই হেতু তাঁর কোন দোষ নেই।

সমস্ত দেব-দেবীদের উপযুক্ত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য। কেউ যদি একটা পিপীলিকাকে পর্যন্ত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে পারে, তা হলে দেব-দেবীদের করবে না কেন? তবে একটা কথা আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে যে, দেব-দেবীরা পরমেশ্বর ভগবানের সমকক্ষ বা ভগবান থেকে বড় নন। *একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য*—"একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, আর

শিব, দুর্গা, ব্রহ্মা, গণেশ ও সমস্ত দেবতারা তাঁর ভৃত্য।" সকলেই পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করছেন, আর আমাদের মতো ক্ষুদ্র ও নগণ্য জীবদের আর কি কথা? আমরা অবশ্যই পরমেশ্বর ভগবানের নিত্য দাস। মায়াবাদ দর্শন অনুসারে দেব-দেবী, জীব এবং পরমেশ্বর ভগবান সবাই সমপর্যায়ভুক্ত। তাই এটি হচ্ছে বৈদিক জ্ঞানের সব চাইতে মূর্খতাপূর্ণ সিদ্ধান্ত।

শ্লোক ১৫৮

স্নান করিতে যবে যা'ন গঙ্গাতীরে ।
তাহাঞি সকল লোক হয় মহাভিড়ে ॥ ১৫৮ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন স্নান করার জন্য গঙ্গাতীরে যেতেন, তখন সেখানে লক্ষ লক্ষ লোকের ভিড় হত।

শ্লোক ১৫৯

বাহু তুলি' প্রভু বলে,—বল হরি হরি ।
হরিধ্বনি করে লোক স্বর্গমর্ত্য ভরি' ॥ ১৫৯ ॥

শ্লোকার্থ

বাহু তুলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন বলতেন, "বল হরি। হরি।" তখন স্বর্গ-মর্ত্য ভরে মানুষ হরিধ্বনি দিতেন।

শ্লোক ১৬০

লোক নিস্তারিয়া প্রভুর চলিতে হৈল মন ।
বৃন্দাবনে পাঠাইলা শ্রীসনাতন ॥ ১৬০ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে অসংখ্য মানুষকে উদ্ধার করে মহাপ্রভুর বারাণসী ছেড়ে যেতে ইচ্ছা হল। তাই সনাতন গোস্বামীকে শিক্ষাদান করে, তিনি তাঁকে বৃন্দাবনে পাঠালেন।

তাৎপর্য

বৃন্দাবন থেকে ফেরার পথে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বারাণসীতে থাকবার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল সনাতন গোস্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা এবং তাঁকে শিক্ষাদান করা। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন মথুরা থেকে বারাণসীতে ফিরে যান, তখন সনাতন গোস্বামীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। সেখানে দুই মাস ধরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁকে বৈষ্ণব-দর্শন এবং বৈষ্ণব-আচরণ সম্বন্ধে শিক্ষাদান করেন। শিক্ষা সম্পাদন হলে, তিনি তাঁকে তাঁর আদেশ পালন করার জন্য বৃন্দাবনে পাঠান। সনাতন গোস্বামী যখন বৃন্দাবনে যান, তখন সেখানে কোন মন্দির ছিল না। সেই নগরীটি তখন একটি ফাঁকা মাঠের মতো অবহেলিত হয়ে পড়ে ছিল। সনাতন গোস্বামী যমুনার তীরে বাস করছিলেন, এবং তার কিছুকাল পরে তিনি ধীরে ধীরে সেখানকার প্রথম মন্দিরটি গড়ে তোলেন; তারপর অন্যান্য মন্দির গড়ে উঠতে থাকে এবং এখন সেই শহরটি প্রায় পাঁচ হাজার মন্দিরে পূর্ণ।

শ্লোক ১৬১

রাত্রি-দিবসে লোকের শুনি' কোলাহল ।
বারাণসী ছাড়ি' প্রভু আইলা নীলাচল ॥ ১৬১ ॥

শ্লোকার্থ

যেহেতু বারাণসী নগরী সর্বদাই অত্যন্ত কোলাহলমুখর, তাই সনাতন গোস্বামীকে বৃন্দাবনে পাঠিয়ে তিনি জগন্নাথপুরীতে ফিরে আসেন।

শ্লোক ১৬২

এই লীলা কহিব আগে বিস্তার করিয়া ।
সংক্ষেপে কহিলাঙ ইহাঁ প্রসঙ্গ পাইয়া ॥ ১৬২ ॥

শ্লোকার্থ

আমি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই লীলা-বিলাসের কথা এইখানে সংক্ষেপে বর্ণনা করলাম, পরে আমি বিস্তারিতভাবে তা বর্ণনা করব।

শ্লোক ১৬৩

এই পঞ্চতত্ত্বরূপে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ।
কৃষ্ণ-নাম-প্রেম দিয়া বিশ্ব কৈলা ধন্য ॥ ১৬৩ ॥

শ্লোকার্থ

এই পঞ্চতত্ত্বরূপে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সমগ্র বিশ্ব জুড়ে কৃষ্ণনাম বিতরণ করে, সমস্ত বিশ্বকে ধন্য করলেন।

তাৎপর্য

এখানে বলা হয়েছে যে, সপার্ষদ সংকীর্তন আন্দোলন প্রচার করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সমগ্র বিশ্বকে ধন্য করেছিলেন। পাঁচশ বছর আগে স্বয়ং আবির্ভূত হয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সমগ্র বিশ্বকে পবিত্র করেছিলেন। কেউ যদি আচার্যের নির্দেশ পালন করে ঐকান্তিকভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সেবা করার চেষ্টা করেন, তা হলে তিনি সমগ্র বিশ্ব জুড়ে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র প্রচার করতে সফল হবেন। কিন্তু মূর্খ লোকেরা বলে যে, ইউরোপীয়ান এবং আমেরিকানরা সন্ন্যাস গ্রহণ করতে পারে না, কিন্তু এখানে আমরা দেখছি যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সমস্ত বিশ্ব জুড়ে এই সংকীর্তন আন্দোলন প্রচার করতে চেয়েছিলেন। প্রচার করার জন্য সন্ন্যাসীদের নিতান্তই প্রয়োজন। যে সমস্ত সমালোচকেরা মনে করে যে, কেবল ভারতবাসীরাই অথবা হিন্দুরাই প্রচারের উদ্দেশ্যে সন্ন্যাস গ্রহণ করতে পারেন, প্রকৃতপক্ষে তাদের কোন জ্ঞানই নেই। সন্ন্যাসী ছাড়া প্রচারকার্য ব্যাহত হবে। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ অনুসারে এবং তাঁর পার্ষদদের আশীর্বাদে এই বিষয়ে কোন ভেদাভেদ জ্ঞান থাকা উচিত নয়। পক্ষান্তরে, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের মানুষদের প্রচার করার শিক্ষাদান করে সন্ন্যাস দিতে হবে, যাতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সংকীর্তন আন্দোলন অন্তহীনভাবে বর্ধিত হতে পারে। আমরা মূর্খের সমালোচনায় কর্ণপাত করি না। আমরা কেবল পঞ্চতত্ত্ব সহ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আশীর্বাদের উপর নির্ভর করে আমাদের কাজ চালিয়ে যাব।

শ্লোক ১৬৪

মথুরাতে পাঠাইল রূপ-সনাতন ।
দুই সেনাপতি কৈল ভক্তি প্রচারণ ॥ ১৬৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর দুই সেনাপতি শ্রীরূপ গোস্বামী এবং শ্রীসনাতন গোস্বামীকে ভগবদ্ভক্তি প্রচার করার জন্য বৃন্দাবনে পাঠালেন।

তাৎপর্য

শ্রীরূপ গোস্বামী এবং শ্রীসনাতন গোস্বামী যখন বৃন্দাবনে যান, তখন সেখানে কোন মন্দির ছিল না, কিন্তু তাঁদের প্রচারের ফলে ধীরে ধীরে তাঁরা বিভিন্ন মন্দির তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। শ্রীসনাতন গোস্বামী শ্রীশ্রীমদনমোহন মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীশ্রীগোবিন্দজীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তেমনই তাঁদের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীশ্রীরাধা-দামোদরের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। শ্রীলোকনাথ গোস্বামী শ্রীশ্রীগোকুলানন্দের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং শ্রীশ্যামানন্দ গোস্বামী শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এইভাবে ধীরে ধীরে বহু মন্দির গড়ে ওঠে। ভগবানের বাণী প্রচারের জন্য মন্দির তৈরি করার প্রয়োজন। গোস্বামীরা কেবল গ্রন্থই রচনা করেননি, তাঁরা মন্দিরও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, কারণ ভগবানের বাণী প্রচারের জন্য দুই-ই প্রয়োজন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু চেয়েছিলেন তাঁর সংকীর্তন আন্দোলন যেন সারা পৃথিবী জুড়ে প্রচারিত হয়। এখন কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইস্‌কন) শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচারের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছে। তাই, এই সংস্থার সদস্যদের কর্তব্য হচ্ছে, পৃথিবীর প্রতিটি নগরে ও গ্রামে কেবল ভগবানের মন্দির প্রতিষ্ঠাই নয়, ভগবৎ-তত্ত্ব সমন্বিত যে সমস্ত গ্রন্থাবলী লেখা হয়েছে, সেগুলি বিতরণ করা। গ্রন্থ বিতরণ এবং মন্দির প্রতিষ্ঠা দুটিরই গুরুত্ব রয়েছে এবং এই দুটি যেন সমান্তরালভাবে চলতে থাকে।

শ্লোক ১৬৫

নিত্যানন্দ-গোসাঞে পাঠাইলা গৌড়দেশে ।
তেঁহো ভক্তি প্রচারিলা অশেষ-বিশেষে ॥ ১৬৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীরূপ গোস্বামী এবং শ্রীসনাতন গোস্বামীকে যেমন তিনি মথুরায় পাঠালেন, তেমনই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে ভগবদ্ভক্তি প্রচার করার জন্য তিনি গৌড়দেশে (বাংলায়) পাঠালেন।

তাৎপর্য

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর নাম বঙ্গদেশে অতি প্রসিদ্ধ। অবশ্য, যে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে জানে, সে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকেও জানে, কিন্তু কিছু তত্ত্বজ্ঞানহীন ভক্ত রয়েছে, যারা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর থেকেও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে বেশি গুরুত্ব দেন। এটি ঠিক নয়। তেমনই আবার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর থেকে বেশি গুরুত্ব দেওয়াও উচিত নয়। *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের* গ্রন্থকার শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী গৃহত্যাগ করেছিলেন, কারণ তাঁর ভাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর গুরুত্ব প্রদর্শন করতে গিয়ে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে হেয় করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বড়, না শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বড়, না শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভু বড়, সেই বিচার না করে পঞ্চতত্ত্বের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত। সমানভাবে তাঁদের সকলকে শ্রদ্ধা করা উচিত—*শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ। শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ।* শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সমস্ত ভক্তরাই পূজনীয়।

শ্লোক ১৬৬

আপনে দক্ষিণ দেশ করিলা গমন ।
গ্রামে গ্রামে কৈলা কৃষ্ণনাম প্রচারণ ॥ ১৬৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নিজেই দক্ষিণ ভারতে গিয়েছিলেন, এবং প্রতিটি নগরে ও গ্রামে কৃষ্ণনাম প্রচার করেছিলেন।

শ্লোক ১৬৭

সেতুবন্ধ পর্যন্ত কৈলা ভক্তির প্রচার ।
কৃষ্ণপ্রেম দিয়া কৈলা সবার নিস্তার ॥ ১৬৭ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভারতের সর্বদক্ষিণ প্রান্তে সেতুবন্ধ (কন্যাকুমারিকা) পর্যন্ত সর্বত্র ভগবদ্ভক্তি এবং কৃষ্ণপ্রেম বিতরণ করেছিলেন এবং এইভাবে তিনি সকলকে উদ্ধার করেছিলেন।

শ্লোক ১৬৮

এই ত' কহিল পঞ্চতত্ত্বের ব্যাখ্যান ।
ইহার শ্রবণে হয় চৈতন্যতত্ত্ব-জ্ঞান ॥ ১৬৮ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে আমি পঞ্চতত্ত্বের ব্যাখ্যা করলাম, তা শ্রবণের ফলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সম্বন্ধে জ্ঞান বৃদ্ধি পায়।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে বুঝতে হলে, পঞ্চতত্ত্বের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সহজিয়ারা পঞ্চতত্ত্বের গুরুত্ব বুঝতে না পেরে, 'ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম । জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম'। অথবা 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ। হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রীরাধে গোবিন্দ'—এই ধরনের মনগড়া ছড়া তৈরি করে। এগুলি ভাল কবিতা হতে পারে, কিন্তু তার দ্বারা ভগবদ্ভক্তির মার্গে উন্নতি সাধন করা যায় না। তাদের এই জপে অনেক তত্ত্বগত ভুলভ্রান্তি রয়েছে, যা এখানে আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। পঞ্চতত্ত্বের নাম কীর্তন করার সময়, পূর্ণ প্রণতি নিবেদন করে অত্যন্ত বিনয়াবনত চিত্তে বলা উচিত—*"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ। শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ।* এই কীর্তনের ফলে নিরপরাধে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের যোগ্যতা লাভের আশীর্বাদ লাভ করা যায়। 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তন করার সময়ও পূর্ণরূপে সেই মন্ত্র উচ্চারণ করা উচিত, যথা—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ।

মূর্খের মতো কোন কল্পনাপ্রসূত ছড়ার কীর্তন করা উচিত নয়। কেউ যদি কীর্তন করার প্রকৃত প্রভাব লাভ করতে চান, তা হলে তাঁকে নিষ্ঠাভরে মহান আচার্যদের অনুসরণ করতে হবে। সেই সম্বন্ধে *মহাভারতে* বলা হয়েছে—*মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ*—"মহাজনেরা এবং আচার্যরা যে পথে গমন করেছেন, পরমার্থ সাধনে সেই পথই অবলম্বন করা উচিত।"

শ্লোক ১৬৯

শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত,—তিন জন ।
শ্রীবাস-গদাধর-আদি যত ভক্তগণ ॥ ১৬৯ ॥

শ্লোকার্থ

পঞ্চতত্ত্ব মহামন্ত্র উচ্চারণ করার সময় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীঅদ্বৈত প্রভু, শ্রীগদাধর এবং শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দের নাম উচ্চারণ করা অবশ্য কর্তব্য। সেটিই হচ্ছে পন্থা।

শ্লোক ১৭০

সবাকার পাদপদ্মে কোটি নমস্কার ।
যৈছে তৈছে কহি কিছু চৈতন্য-বিহার ॥ ১৭০ ॥

শ্লোকার্থ

এইভাবে বার বার পঞ্চতত্ত্বের শ্রীপাদপদ্মে কোটি কোটি দণ্ডবৎ প্রণাম নিবেদন করে, আমি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলাবিলাস কিছুটা বর্ণনা করছি।

শ্লোক ১৭১

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৭১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীল রূপ গোস্বামী এবং শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর শ্রীপাদপদ্মে আমার প্রণতি নিবেদন করে, এবং তাঁদের কৃপা প্রার্থনা করে, তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণপূর্বক আমি কৃষ্ণদাস শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বর্ণনা করছি।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সমস্ত পৃথিবী জুড়ে প্রেম বিতরণ করে সংকীর্তন আন্দোলন প্রচার করতে চেয়েছিলেন, এবং তাই তাঁর প্রকটকালে তিনি সংকীর্তন আন্দোলনকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। এই জন্যই তিনি শ্রীল রূপ গোস্বামীকে বৃন্দাবনে পাঠিয়েছিলেন, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে বঙ্গদেশে পাঠিয়েছিলেন এবং স্বয়ং তিনি দক্ষিণ ভারতে গমন করেছিলেন। এইভাবে তিনি কৃপাপূর্বক বাকি পৃথিবী জুড়ে সেই

প্রচারকার্য সম্পাদন করার দায়িত্ব আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের ওপর অর্পণ করলেন। এই সংস্থার সদস্যদের সর্বদা মনে রাখা উচিত যে, তাঁরা যদি চারটি বিধিবদ্ধ নিয়ম পালন করে আচার্যের নির্দেশ অনুসারে ঐকান্তিকভাবে ভগবানের বাণী প্রচার করেন, তা হলে অবশ্যই তাঁরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আশীর্বাদ লাভ করবেন, এবং সারা পৃথিবী জুড়ে তাঁদের প্রচার সাফল্যমণ্ডিত হবে।

পঞ্চতত্ত্বরূপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর বর্ণনা করে, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের আদিলীলা সপ্তম পরিচ্ছেদের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত।